পুষ্পধনু

পুষ্পধনু

প্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

সুহৃদ্‌বরেষু

প্রবোধকুমার সান্যালের অন্যান্য বই

দেবতাত্মা হিমালয়   তুচ্ছ   আঁকাবাঁকা
হাসুবানু   বনহংসী   মহাপ্রস্থানের পথে
দেশ দেশান্তর   নদ ও নদী   উত্তরকাল
কাদামাটির দুর্গ   অরণ্যপথ   শ্যামলীর স্বপ্ন
ইত্যাদি

১

মিহিজামের জনবিরল মাঠে ও পথের প্রান্তে পাতা ঝরেছে অনেক। ভোরের হাওয়ায় এখনও শীতের কাঁটা থাকে। কিন্তু বেলা যতই বাড়ে, রৌদ্রদগ্ধ নিঃঝুম বসন্তকাল নেমে আসে।

শুকনো মাঠ ধূ ধূ করছে। পশ্চিমদিকে রেলপথ সোজা চ'লে গেছে জামতাড়া পেরিয়ে যশিদির দিকে, এবং তার ওপাশে 'চিত্তরঞ্জনের' নতুন উপনিবেশ গ'ড়ে উঠছে। কিন্তু এপারে পূবদিকের প্রান্তর এখনও অনেকটা বসতিবিরল, এখনও এদিকের নিরিবিলি পথে ও প্রান্তরে যথেষ্ট লোকসমাগম দেখা যায় না।

স্বল্পসংখ্যক চেঞ্জার যারা এসেছিল, তারা সবাই প্রায় চ'লে গেছে। আছে দু'এক ঘর, তারাও যাই-যাই করছে। এদিকে ইলেকট্রিক হয়নি, ইঁদারার জল ছাড়া জলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়, শীতের শব্জী প্রায় সবই উঠে গেছে,—শনি-মঙ্গলের সাঁওতালি হাট ছাড়া আর কোথাও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে এই ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যকর শহরটির আকর্ষণ অনেকটা কমে গেছে।

ষ্টেশনের দিক থেকে একটা কাঁচা-পাকা রাস্তা চ'লে এসেছে পূবদিকে এঁকেবেঁকে মাঠের ধার দিয়ে। দু'এক ঘর শ্রমিক সাঁওতালি বস্তি মাঝখানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পথটা সোজা এসে এক বাগানবাড়ীর পাঁচিলের পাশ দিয়ে উত্তরমুখো নতুন কলোনীর দিকে চ'লে গেছে।

এই বাগানবাড়ীতে আজও রয়েছে একদল ছেলেমেয়ে। ওরা 'গীতালী সঙ্ঘের' সভ্য, কিন্তু ওরা গৃহস্থ নয়। ওরা বছরে দু'তিন বার বেরিয়ে নানা-স্থানে 'তাঁবু' ফেলে—এবার এসেছে মিহিজামে। সঙ্গে আছেন ম্যানেজার রমেনবাবু, এবং পরিচালিকা ঈশানী রায়। ওদের হৈ চৈ লেগে রয়েছে এখানে প্রায় দেড় মাস, এবার ওদের যাবার সময় হয়েছে। ওদের জন্য পথ ও প্রান্তর

নিত্য-মুখরিত। ওরা গান গেয়ে বেড়ায় মাঠে মাঠে, দল বেঁধে চলে যায় মাঠ পেরিয়ে পাহাড়তলীর ওদিকে সাঁওতাল পাড়ায় এবং সপ্তাহে দুবার হাটতলায় গিয়ে যে কোনো আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য যে কোনো মূল্যে লুটপাট ক'রে আনে। ওদের সঙ্গে আছে তিন-চারজন চাকর আর পাচক, বাসন মাজার ঝি, —ওদের ভাবনা কিছু নেই। সকাল থেকে ওদের ঘরে ঘরে গান-বাজনা, দুপুরে লুডো-ক্যারম-তাস-পাশা, বিকেলে মাঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ, এবং সন্ধ্যা থেকে নাচ ও নাটকের রিহার্সেল। ওদের স্বাস্থ্যশ্রীর দিকে তাকালে শরীরে রোমাঞ্চ আসে। রাত্রের ঠাণ্ডাতেও দেখা যায় মেয়েদের এলোচুলের ঝলকের মধ্যে ঘাম জড়ানো, এবং ছেলেদের বোতাম খোলা পাঞ্জাবীও ভিজে সপসপ করছে।

ওদের সব কাজের ফাঁকে আরেকটি কাজ ছিল। নতুন চেঞ্জার কে এলো, অথবা কোন্ কোন্ চেঞ্জার চলে গেল, এর হিসেব রাখা। নতুন যদি কেউ আসতো, ওদের অনেকেই গিয়ে গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'রে বসতো। তাই নিয়ে গল্প, তাই নিয়ে সমালোচনা। কারো কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলে সেইদিকে ওদের অখণ্ড মনোযোগ লেগে থাকতো। এমনি ক'রেই দেড়মাস কেটে গেছে।

ওদের যাবার সময় হয়ে এসেছিল।

ঠিক এমনি সময়টায় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলকাতা থেকে এক্সপ্রেস এসে পৌঁছলো মিহিজামে। পশ্চিমের মাঠের প্রান্তে সূর্য তখন অস্তে নেমে যাচ্ছে। ওরা সবাই আসর বসিয়েছিল বাগানের সামনে মাঠে,—পথের ধারেই। ওরা লক্ষ্য করলো দূরের থেকে ধীরে ধীরে এদিকে আসছে একটি গৃহস্থ, মোটঘাট নিয়ে। সন্দেহ নেই, এই গাড়ীতেই এসে পৌঁছেছে। ওদের পিছনে দুজন কুলী। আবার নতুন ক'রে এলো চেঞ্জার।

অনেকদূর থেকে তা'রা এলো কাছাকাছি। একটি সুশ্রী যুবক, এক মাথা তার ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল,—কাঁধে একটি শিশু। তার পিছনে খালি পায়ে ঘাঘরাপরা একটি ছোট মেয়ে।—কেন, এক জোড়া চটিজুতো কত আর দাম লাগতো? মেয়েটির পিছনে একটি কৃশকায়া রুগ্না বৌ,—গায়ে রাশীকৃত গরম

আচ্ছাদন, কিন্তু তারও পায়ে জুতো নেই। উনিশ শতকী মনোবৃত্তি, সন্দেহ কি! বৌটির কাঁকালেও একটি শিশু। হা ঈশ্বর, রেখেছো বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করোনি। দূরের থেকেও স্পষ্ট চোখে পড়ে, যুবকটি স্বাস্থ্যবান, কিন্তু আর সবাই রুগ্ন, ক্ষয়ক্ষীণ।

আরো এগিয়ে আসছে ওরা। সঙ্গে প্রচুর পোঁটলা পুঁটলী। ময়লা বিছানা দড়িবাঁধা, ভিতর থেকে ছেঁড়াকাঁথা ঝুলছে। রংচটা তোরঙ্গ, বালতি, চটের বস্তা, কাপড়ের মোট। কুলী দু'জন ভারাক্রান্ত। লোকটার এক কাঁধে কম্বল, তার সঙ্গে ঝুলছে চামড়াবাঁধা একটি ক্যামেরা, অন্য কাঁধে শিশু। বগলে ছাতার সঙ্গে লাঠি বাঁধা,—বিদেশ-বিভুঁই, লাঠি একগাছা দরকার বৈকি। ছাতা,—যদি বৃষ্টি আসে। কিন্তু ছাতার বাঁটের সঙ্গে বাঁধা কালিঝুলিপড়া ময়লা হারিকেন। ভদ্রলোকের ডান হাতে আবার একটি সুটকেশ। পকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটি কি যেন! তলতা বাঁশের একটি বাঁশী মনে হচ্ছে। কিন্তু ছাতার বাঁট থেকে যে ঝুলছে ময়লা হারিকেন। সহসা হেনা মিত্তির হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি! হাসিটে বড় ছোঁয়াচে, রবীন সামন্ত আর মঞ্জুশ্রী—দুজনে রুমালে আর আঁচলে নিজেদের মুখ চেপে ধরলো।

সহসা ছোঁয়াচটা লাগলো ঈশানীর মতো গম্ভীরপ্রকৃতি মেয়েকেও। কোন্‌-দিকে মুখ ফেরাবে সে? ওরা কাছে এসে পড়েছে ততক্ষণ। কিন্তু ঈশানী যথাসম্ভব হাসি গোপন ক'রে ওদের ধমক দিল, কি হচ্ছে তোমাদের?

সামন্ত আর মঞ্জু উঠে পালালো বাড়ীর মধ্যে। ঈশানী আনত গাম্ভীর্যের সঙ্গে চুপ ক'রে রইলো। ওরা পাশ দিয়ে চ'লে না গেলে আর মানরক্ষে হয় না বোধ হয়। পরিহাস রসে মধুচক্র চঞ্চল। ওর মধ্যে একজন চাপাকণ্ঠে কবিতায় মন্তব্য করলো, 'কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ! আমি মনে ভাবতেছিলেম এ কোন্‌ মহারাজ।'

এবম্বিধ ব্যাপারটা ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু সভ্য মানুষের আচরণে একটা বাহ্য পালিশ থাকলে অনেক অভব্যতাই নাকি মানিয়ে যায়, একথা হয়ত ও-লোকটাও জানে। যাই হোক, পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময়

লোকটি সহসা একবার থমকে দাঁড়ালো। চেহারাটা সত্যই দাগকাটার মতো! নিজের সম্বন্ধে আশ্চর্য ঔদাসীন্য। ছাতার বাঁটে হারিকেনটি বাঁধা, সে কৌতুকের দিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। না, বয়সটা বেশী নয়, রূপের সঙ্গে মানিয়েছে ওর দীর্ঘাঙ্গ। সুদর্শন তরুণ।

প্রশ্ন করলো, এদিকে 'মাধবীকুঞ্জ' কোন্ বাড়ীটা?

ঈশানী মুখ তুলে তাকালো। একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো, এই যে, পাঁচিলের পাশ দিয়ে চ'লে যান,—তৃতীয় বাড়ীটা। বিপিন সেনের বাড়ী। সামনেই একটা কুলগাছ।

আরেকজন বললে, ভাঙা কাঠের ফটক। গোলাপী রঙের দেওয়াল। চলুন, আমি দেখিয়ে দিয়ে আসি।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো।

রমেনবাবু ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কলকাতা থেকে আসছেন বুঝি? কদ্দিন থাকবেন?

এই কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আর কি।

বেশ বেশ, দরকার হলে বলবেন, আমরা আছি। আরো কিছুদিন আগে এলে ভালো করতেন। এখানকার শীতটা বড় ভালো, হজম-টজম হয় খুব। মশায়ের নাম?

শান্তনু চৌধুরী।

বেশ নামটি। ছেলেপুলে-বৌমার যখন যা লাগে আমাদের খবর দেবেন, আমরা আছি এখনও। ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে দেখছি, দুধের দরকার ত? গিয়ে বসুনগে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আরে, ক্যামেরা দেখছি সঙ্গে, ছবিটবির সখ আছে বুঝি? পকেটে বাঁশী,—বাজানো অভ্যেস আছে নাকি?

শান্তনু শুধু একটু হাসলো, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে অগ্রসর হোলো। কিছুদূর গিয়ে পাঁচিলের পাশে এসে বৌটি শুধু চাপাকণ্ঠে বললে, এমন নেড়িকুকুরের মতন ঘুরতে হবে জানলে তোমার সঙ্গে আসতুম না।—মুখে তার অসীম বিরক্তি এবং অসন্তোষ।

সন্ধ্যার পর গীতালী সঙ্ঘের সভ্যরা সবাই ঘরে উঠেছে, এমন সময় শান্তনু আবার এসে দাঁড়ালো বাগানের ফটকে। তার দুহাতে দুই বালতি। কিন্তু প্রবীণ বয়সের সেই ভদ্রলোক রমেনবাবুকে এবার কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলো। ভিতরের ঘরগুলিতে এক একটি পেট্রোমাক্স জ্বলছে, তাদের অত্যুগ্র আলো বাইরে এসে ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওধারে রান্নাবাড়ীর দিকে কোনো কোনো কলকণ্ঠীর উল্লোল হাসি মাঝে মাঝে ফেনায়িত হয়ে উঠছিল।

শান্তনু ফিরে যাবে কি না ভাবছে,—অথচ জল না পেলে তা'র কোনোমতেই চলবে না, এমন সময় ঈশানী এলো বেরিয়ে। শান্তনু এগিয়ে এসে বললে,—ভারি মুস্কিলে পড়েছি, ওখানে জলটল কিছু নেই। দু'বালতি জল আমি নিয়ে যাবো।

ঈশানী বললে, কেন, ইঁদারা নেই আপনাদের ওখানে ?

ইঁদারাটা হোলো পাশের বাড়ীতে, কিন্তু মালী চাবি দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি নিজেই জল তুলে নেবো।

ঈশানী বললে, অত বড় বালতি, আপনি পারবেন কেন ? ইঁদারার জল অনেক নীচে।

শান্তনু বললে, তা হোক, পারবো।

মুখ ফিরিয়ে ঈশানী ডাকলো, নন্দ ? বাবুর ওখানে দু'বালতি জল দিয়ে আয় ত ?—না না, রাখুন আপনি। আপনার গায়ে অনেক জোর আছে, মেনে নিলুম।

নন্দ এসে বালতি দুটো নিয়ে গেল।

শান্তনু বললে, তাহলে আরেকটা অনুরোধ জানাই। এদিকে কোথায় কেরোসিনের দোকান আছে আমাকে ব'লে দিন। আমাদের সঙ্গে মোমবাতি ছিল, সে আর খুঁজে পাচ্ছিনে।

তা'হলে অন্ধকারে আছেন বলুন ?—ঈশানী ব্যস্ত হয়ে বললে, আচ্ছা দাঁড়ান—আসছি এক্ষুণি।

মিনিট তিনেক পরে এক বোতল কেরোসিন এনে সে শান্তনুর হাতে দিল। বললে, দোকান আছে বটে কিন্তু ষ্টেশন ছাড়িয়ে। আপনি আর সেখানে যাবার চেষ্টা করবেন না।

জলের বালতি নিয়ে নন্দ আগেই চ'লে গেছে। এবার শান্তনু পা বাড়ালো। কিন্তু পা বাড়ালেই হাঁটা যায় না,—নিজের ওই সুশ্রী হাত দুখানা দিয়ে যে অপরিচিত মেয়েটি কেরোসিনের বোতল এনে হাতে দিল, তাকে যে এখনই কষ্ট ক'রে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, এই লজ্জাটুকু শান্তনুকে পেয়ে বসলো। ধন্যবাদ জানাতে যাওয়াটা হাস্যকর, কৃতজ্ঞতা আরো অর্থহীন,—সুতরাং শান্তনু একবার ফিরে তাকালো মাত্র।

ঈশানী বললে, আর কিছু যদি দরকার হয়, বলুন ?

শান্তনু থতিয়ে গেল। তারপর বললে, এর আগে বাচ্চাদের জন্য আপনারা দুধ পাঠিয়েছেন, এখন আবার কেরোসিন নিয়ে যাচ্ছি,—এসব জিনিষের দাম ত' আছে! তাই লজ্জা পাচ্ছি।

ঈশানী একটু হাসলো। বললে, এদেশে কিন্তু অনেক সময় জলও দাম দিয়ে কিনতে হয়। অসময়ের জল—দাম অনেক।

কথাটা ঠিক কি ওজনের বোঝা গেল না। শান্তনু আবার তাকালো। ঈশানী তার নিরুপায় চেহারাটা লক্ষ্য ক'রে যেন একটু কৌতুক বোধ করলো। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই সে বললে, আচ্ছা আসুন, বাচ্চারা সব অন্ধকারে রয়েছে।

ধিক্কার দিল শান্তনু নিজেকে। মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে সে আজও কথা বলতে শিখলো না। অসময়ে উপকার পেয়ে সে নগদ মূল্যে তা'র পরিশোধ দিতে চায়, এই অসৎ শিক্ষা সে সঙ্গে এনেছে।

দিন দুই পরে আবার রমেনবাবুর সঙ্গে ঈশানীকে সে দেখলো। ফলের ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে পিছনে পিছনে চাকর চলেছে। ষ্টেশন থেকে ফিরছে সবাই।

এই যে মশাই,—রমেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বেশ জমিয়ে এবার বসেছেন ত' ?

শান্তনু কাছে এলো। বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

বেশ, তাহলে মাসেক খানেক থেকে যান—এখানে হজম-টজম হয় ভালো।

থামুন আপনি।—ঈশানী তাঁকে ধমক দিল, লোক দেখলেই হজমের কথা তুলবেন না।

রমেনবাবু বললেন, আরে ওইটেই ত' আসল। বদহজমের অসুখ থাকলে তোমার নিজের চেহারায় এই লাবণ্য থাকর্তো কোথায়? তোমার গানে ওই মধু পেতে কোত্থেকে? এই যে ফলের ঝুড়ি সঙ্গে যাচ্ছে, এ কি কোনো কাজে লাগতো? হজম ভালো ব'লেই ত' মিহিজাম এমন মনোহর। তোমরা সব ছেলেমানুষ!—যাক, মশায়ের কি করা হয়?

শান্তনু বললে, বিশেষ কিছু না।

গান-বাজনার বাই আছে? বাঁশীটে ত' সেদিন সঙ্গে দেখলুম। ওটা কি তবে তোলাই থাকবে?

শান্তনু সবিনয়ে একটু শুধু হাসলো।

তা বেশ, তা বেশ। ক্যামেরায় ছবি তোলেন, সেও একটা সখ বৈ কি। একটা কিছু নিয়ে থাকলেই হোলো। কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?

শান্তনু বললে, এই একটু বাজারের দিকে।

ঈশানী বললে, এটা ত' বাজারের রাস্তা নয়। আপনাকে অনেক ঘুরে যেতে হবে।

রমেনবাবু বললেন, আরে, উনি ঘুরতেই ত' বেরিয়েছেন। তা তুমিও ত' তেল-সাবান কিনতে যাবে, যাও না ওঁর সঙ্গে।

আসুন।—ঈশানী শান্তনুর দিকে তাকাল। চাকরকে সঙ্গে নিয়ে রমেনবাবু বাসার দিকে অগ্রসর হলেন, মাঝখানে একটা ব্যবধান রেখে শান্তনু চললো ঈশানীর সঙ্গে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার উল্লাস লেগে র'য়েছে।

মাঠে প্রখর রোদ। কিছুদূর গিয়ে শান্তনু বললে, আপনাকে কষ্টই দিলুম।

হাসিমুখে ঈশানী বললে, না না, কষ্ট কিসের। তবে সেই ছাতাটা সঙ্গে থাকলে এই রোদ্দুরে আমার মাথাটা রাখা যেতো বটে।

এসব কথা বড়ই জটিল, শান্তনু অতটা বোঝে না। একটু পরে সে বললে,

আপনাদের দল ত' অনেক বড়। এখানে অসুবিধে হচ্ছে না? ধরুন, এত জিনিষপত্রের অভাব।

ঈশানী বললে, আমাদের দলের কারোকে দেখলে মনে হবে না যে, এদেশে কারো অসুবিধে হচ্ছে। বরং সকলের চেহারাই ফিরে গেছে। আসুন, এই বাগানটার পাশ দিয়ে যাই।

মাঠের পথটা এক সময় সঙ্কীর্ণ হয়ে বাগানের দিকে ঘুরলো। এখানে গোলাপের চাষ হয়। এখান থেকে ফুল রপ্তানী হয় কলকাতায়।

ফস ক'রে এক সময় ঈশানী বললে, কই আপনি ত' সেদিনকার দেনা শোধ করলেন না?

শান্তনু সহাস্যে বললে, দেনা শোধ? ও, বলুন কি করতে হবে?

পথ মুখরিত হয়ে উঠলো ঈশানীর হাসির আওয়াজে। কৌতুকবোধ ক'রে শান্তনু বললে, আমি ভেবে রেখেছি একটি উপায়ে আপনাদের দেনা শোধ করবো।

ঈশানী মুখ ফিরিয়ে তাকালো।—কি?

আমার ক্যামেরায় আপনাদের ছবি তুলে দেবো।

আপনার কাঁচা হাত আমাদের ওপর দিয়ে পাকিয়ে নিতে চান বুঝি?

কাঁচা হাত!—শান্তনু হেসে ফেললো, অনেক কাগজওয়ালা আমার তোলা ছবি ছাপে, নিতান্ত কাঁচা হাত হ'লে তা'রা নিত না। আমাকে অনুমতি দিন, আপনার ছবি আগে তুলি।

ঈশানী বললে, আমাদের দলে অন্য মেয়েও আছে, তাদের বাদ দিয়ে একলা আমার ছবি তোলা ভালো হবে না। তাছাড়া আমার ছবি আমি তুলতেও দিইনে।

শান্তনু কতক্ষণ চুপ ক'রে হাঁটতে লাগলো।

ঈশানী বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলুম। কিন্তু এসব ছবিটবি তোলার সখ ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের। আমাদের মানায় না।—আসুন—

ঈশানী আগে আগে চললো। শান্তনু পিছন থেকে বললে, কোনো মেয়ের ছবি আমি আজ পর্যন্ত তুলিনি।

নাই বা তুল[illegible] ঈশানী ফিরে তাকালো,—মেয়েছেলের ফটো নিয়ে লোকে ব্যবসা করে, আপনি সে-দলে নাই রইলেন।—ছেলেপুলে নিয়ে বাইরে এসেছেন, তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ফেরাবার চেষ্টা করুন, ওতে বেশী কাজ দেবে।

দক্ষিণের পথটায় ওরা দুজনে এসে পড়লো। এ পথটা গিয়ে মিলেছে ষ্টেশনে। দু'একটি দোকানপত্র আছে এখানে-ওখানে। ওদেরই একটিতে এসে ঈশানী উঠলো। পাশে এসে দাঁড়ালো শান্তনু।

সাবান ইত্যাদি কতকগুলো জিনিষপত্র কিনে ঈশানী বললে, কই, আপনি কি নেবেন নিন?

শান্তনু বললে, আমি তরি-তরকারী কিনে নিয়ে যাবো।

সেসব আজ কোথায় পাবেন? কালকে হাটের বার, হাট ছাড়া কিছুই পাবেন না। তখন বললেন না কেন আমাদের ম্যানেজারকে? তিনি যা হয় ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। বেচারি, আপনি দেখছি বিদেশে এনে বাড়ীর সবাইকে কষ্টই দিচ্ছেন! এখন উপায়? কী নিয়ে বাড়ী ঢুকবেন? তাছাড়া এত বেলা হোলো!

ঈশানী চঞ্চল হয়ে উঠলো।—

শান্তনু নিরুপায় হয়ে বললে, জানি আমার কপালে লাঞ্ছনা আছে ফিরে গিয়ে। কিন্তু এসব আমি কিছু পেরে উঠিনে।

ঈশানী রাগ ক'রে বললে, পেরে ওঠেন না? তার মানে? সংসার কি আপনাকে ক্ষমা করবে এর জন্যে? শুধু ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছবি তুলে বেড়ালে ঘরকন্না চলে?

এবার আমি যাই।—শান্তনু অগ্রসর হ'তে চাইলো।

দাঁড়ান মশাই, বাহাদুরী করবেন না।—দোকানে হিসাব চুকিয়ে ঈশানী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পুনরায় বললে, চলুন।—তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, ওদের দুধ আছে ঘরে?

শান্তনু বললে, আছে।

কিন্তু দুধ থাকলেই ত আর ঘর চলবে না। রান্নার জিনিষপত্র চাই। আসুন

আমার সঙ্গে। আজকের মতন আপনাদের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। আপনি বড় অদ্ভুত লোক দেখছি। তিন-চারদিন হোলো এসেছেন, অথচ ঘরকন্না গুছিয়ে তোলেননি? শীগ্‌গির আসুন।

রৌদ্রে রাঙ্গা হয়ে উঠলো ঈশানীর মুখখানা। মাঠের পথ কঠিন মাটির ডেলায় আকীর্ণ, দ্রুত চলা যায় না। চুলের লহর বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে এলো কপালে। পনেরো মিনিটকাল লাগলো বাগানবাড়ীতে এসে পৌঁছতে। সেদিনের মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল।

শান্তনুর কপাল মন্দ। কোনোমতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের অবকাশ পায় না। যদি বা নির্জন আলাপের সুবিধা সে পেলো,—আগাগোড়া ধমক খেলো, আগাগোড়া হিতোপদেশ। সে অযোগ্য, সে নির্বোধ, সে বেহিসাবী। কিন্তু এ নিয়ে ভাববারও কিছু নেই। ওরা অন্য সমাজের মানুষ, সে ভিন্ন জগতের লোক।

প্রায় সপ্তাহখানেক যেতে বসলো। ওই বাগানবাড়ীর পাঁচিলের গা দিয়েই শান্তনুকে দিনে অন্ততঃ পাঁচ-সাতবার আনাগোনা করতে হয়। ছোট ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে ওই একই পথে তা'র আনাগোনা। দুধ আনে ভোরবেলা, তারপর যায় একবার ষ্টেশনের দিকে খাবার কিনতে, হাটের দিন হ'লে ছেলে কাঁধে নিয়ে মোট ব'য়েও আনে। কখনো আনলো এক মোট কয়লা, কখনও বা তেল-নুণ। ছেলেটা কিন্তু কাঁধে,—আশ্চর্য, একটু ক্লান্তি বা বিরক্তি নেই। ভারবাহী জীব, সন্দেহ কি!

একদিন আবার ধরলো ঈশানী। হাসিমুখে বললে, ছেলে বুঝি বড্ড আদুরে?

ছেলে মাত্রেই তাই!—শান্তনু জবাব দিল।

কিন্তু ওকে হাঁটতে-ছুটতে দিন্? পা খোঁড়া ক'রে রাখছেন কেন?

হাঁটলে ওর কষ্ট হবে। জ্বরে পড়তেও পারে।

ঈশানী চুপ ক'রে তাকালো। তারপর বললে, আপনার স্নেহের অনাচারে ওর ইহকাল-পরকাল কিন্তু ঝরঝরে হয়ে যাবে। নিজের পায়ে হাঁটলে তবেই শিশু বড় হয়।

শান্তনু হেসেই অস্থির।—ওসব বইপড়া বিদ্যে চিরকালই ত' শুনে এলুম।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্য সহকারে শান্তনু ছেলেটাকে নিয়ে চ'লে গেল। আজ সে যেন নিজের কথায় দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে। বাৎসল্যটা অন্ধ নয়, ওটাই হোলো শক্তি,—ওটাই শান্তনুকে সবল রেখেছে, ওটাতেই জোর পেয়েছে। আজ যেন ঈশানী আঘাত খেয়ে চুপ ক'রে রইলো। একটি কথায় সমস্ত তিরস্কার শান্তনু ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

তরুণ-তরুণীদের হৈ চৈ আর শোনা যাচ্ছে না তেমন। হাটতলায় কোলাহল নেই, মাঠে মাঠে ওরা আর ছুটোছুটি করে না, বাড়ীর মধ্যে গান-বাজনা বন্ধ, নাচ আর নাটকের মহড়া থেমে গেছে।—দুদিন ধ'রে সন্দেহ করছিল শান্তনু। সেদিন সকালে নন্দকে ধরলো সে।

তোমাদের বাড়ী যে এত ঠাণ্ডা, নন্দ? তা'রা সব গেল কোথায়?

নন্দ বললে, তা'রা সবাই চ'লে গেছে আজ তিন দিন হোলো।

শান্তনু বললে, চ'লে গেছে? কই জানতে পারিনি ত'?

ভোরের গাড়ীতে গেছে রাত থাকতে উঠে।

ও।—শান্তনু একবার ভুরু কুঁচ্‌কে দাঁড়ালো। যাক্, সে ওদের কাছে ঋণী রইলো। অসময়ে সে বার বার ওদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। মনে থাকবে। যদি আবার কোনোদিন কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখা হয়, সে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবে।

শান্তনু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে চ'লে যাচ্ছিল।

নন্দ বললে, আমার দিদিমণি যাননি কিন্তু। তিনি হৈ চৈ ভালোবাসেন না। তা ছাড়া তিনি ওদের দলেরও নন্।

কোথায় তিনি?—শান্তনু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো।

আছেন ভেতরে—আসুন না?

শান্তনু বললে, না, এখন থাক্—আমি একবার ডাক্তারের ওখানে যাচ্ছি, ছেলেটার একটু জ্বর হয়েছে কাল থেকে। অন্য সময় দেখা হবে।

শান্তনু তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

নন্দ বোধ হয় ভিতরে গিয়ে ব'লে থাকবে, ঈশানী দ্রুতপদে বেরিয়ে এলো। ছেলেটার নাম ক'রেই শান্তনুকে সে খোঁচা দিয়েছিল, সুতরাং ছেলেটার অসুখ শুনে সে একটু ব্যস্তই হোলো। ওদের বাড়ীতে সে যায়নি একবারও, কারণ তা'র যাওয়াটা পছন্দসই নাও হ'তে পারে। তা ছাড়া শান্তনুও তাকে একটিবার আমন্ত্রণ করেনি। কিন্তু আজ ছেলেটার অসুখের সংবাদ শুনেও চুপ ক'রে থাকাটা তা'র সৌজন্যে বাধলো। অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য গিয়ে না দেখে এলে অশোভন হয়।

ঈশানী বেরিয়ে এসে পাঁচিলের পাশ দিয়ে গিয়ে সোজা 'মাধবীকুঞ্জে' উঠলো।

একতলা বাড়ী যেমন হয়। ঘর-দরজা তেমন ভালো নয়। ওরই মধ্যে যৎসামান্য ঘরকন্না অগোছালো হয়ে রয়েছে। সেই কৃশকায়া বৌটি এসে হাসিমুখে বললে, আসুন, আসুন,—ভারি খুশী হলুম। কি ভাগ্যি আমাদের!

ঈশানী বললে, কতদিন মনে করেছি এসে আলাপ ক'রে যাবো, তারপর একদিন নেমন্তন্ন করবো,—নানা গোলমালে হয়ে ওঠেনি। শুনলুম নাকি আপনার ছেলেটির অসুখ?

বৌটি বললে, হ্যাঁ, তবে সামান্যই—একটু গা গরম হয়েছে। আর কিছু নয়। বিদেশ-বিভূঁই কিনা, ভয় করে। এখানে এসে পর্যন্ত আপনাদের সাহায্য পাচ্ছি, আপনাদের কাছে আমাদের অনেক ঋণ জমা হয়েছে।

হাসিমুখে ঈশানী বললে, বেশ ত', ঋণ বেড়ে চলুক, একদিন শোধ করবেন।

ঈশানীর মাথায় সিঁদূরের চিহ্ন নেই, সুতরাং পরিচয়টা আর ব'লে দিতে হয় না। তবে একটু অস্বাভাবিক লাগে বৈ কি। বয়স হয়ত পঁচিশ ছাড়িয়ে গেছে। গলাটা খালি, ডান হাতে একগাছি ফিনফিনে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতে একটি রিষ্টওয়াচ। কিন্তু আশ্চর্য, রূপে ও স্বাস্থ্যশ্রীতে সমস্ত চেহারাটা জমজম করছে। আঙুলের ডগায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যের আভা।

বৌটি বললে, দাঁড়ান, আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। হ্যাঁগো, শুনছো, একবার এঘরে এসো ত? দেখে যাও সোনার সরস্বতী কা'কে বলে!

স্ত্রীর ডাক শুনে একটি ভদ্রলোক হাসিমুখে এঘরে এলেন। কিছু ভাববার আগে, কিছু বলবার আগে,—একেবারে এসে সহাস্যমুখে তিনি ঈশানীর সামনে দাঁড়ালেন। শান্তনু নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক। অবাক-বিস্ময়ে ঈশানী একবার মুখ তুলে তাকালো, এবং আড়ষ্ট হাত তুলে নমস্কার জানালো। শান্তনু নয়,—অন্য ব্যক্তি।

ভদ্রলোক বললেন, আমার খুড়তুতো ভাইটির সঙ্গে এঁদের পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু সে একেবারে অপদার্থ, কোনো কাজের যোগ্য নয়। হতভাগা সময়মতো বাজার-হাট করেনি, ঘরকন্নার এতটুকু খোঁজখবর নেয়নি। ওর ওপর ছেড়ে মস্ত ভুল করেছি। বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে তবে আমার রাগ যায়। শুনলুম আপনারা নাকি অনেক সাহায্য করেছেন!

বৌটি রুষ্টকণ্ঠে বললে, কপাল মন্দ, তাই অমন অলুক্ষুণে দেওরের হাতে এই দুর্ভোগ হোলো!

ঈশানী এরই মধ্যে একটুখানি সামলিয়ে নিল। বললে, উনি তাহলে করেন কি সারাদিন?

বৌটি বললে, দেখুন না গিয়ে, হয়ত মাঠের ধারে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে, নয়ত পদ্য লিখছে,—আর নয়ত সব অকাজের কাজ! ছবি আঁকা চলছে!

আপনার খুড়তুতো দেওর উনি?

হ্যাঁ, আমার মরণ। আমি বলি কাজকর্ম যদি কিছু করে ত করুক, নৈলে দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। জ্ঞাতিগুষ্টির ছেলেকে আমরাই বা বসিয়ে বসিয়ে কদ্দিন পুষবো, আপনিই বলুন না!

ঈশানী বললে, সে ত নিশ্চয়ই। তবে বিয়ে থা দিয়ে দেখুন না, যদি ভালো হয়ে যান্?

বিয়ে থা?—ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন, অমন ছেলেকে মেয়ে দিচ্ছে কে? চাল নেই, চুলো নেই, খাওয়া-পরা দেবার ক্ষমতা নেই,—ওর গলায় মালা দিয়ে কি সে-মেয়ে নিজের গলায় দড়ি দেবে?

বৌটি বললে, হোক না বাঙ্গলা দেশ, তবু মেয়ে অত সস্তা নয়!

অজস্র গালিবর্ষণ চললো অনেকক্ষণ। এক সময় ঈশানী উঠে দাঁড়ালো। বললে, বড় আনন্দ হোলো আলাপ ক'রে। এবার আমি যাই। আপনার ছেলেটিকে দেখতে এসেছিলুম সব কাজ ফেলে। ভয়ের কারণ নেই শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

ভদ্রলোক বললেন, মাঝে মাঝে এলে ভারি খুশী হবো।—

পালাতে পারলে তখন ঈশানী বাঁচে, দম আট্‌কে এসেছে। কোনোমতে নমস্কার জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে।

বাড়ীতে ঢোকবার আগে মাঠের সামনে সে একবার থমকে দাঁড়ালো। একটা অত্যন্ত কৌতুকজনক প্রতারণার মধ্যে সে এতদিন জড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শান্তনুও কোনোদিন এ আলোচনা তোলেনি, সে নিজেও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল একটা অনুমান এবং ধারণার ওপর।

ঈশানী কেমন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো!

পাচক রামতীরথ ভিতর থেকে বেরিয়ে হাটের দিকে যাবার আয়োজন করছিল, ঈশানীকে দেখে বললে, মা, ও-বাড়ীর বাবু আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ও-বাড়ীর বাবু? ওঃ, কোথায় তিনি?

বাইরের ঘরে বসিয়েছি।

ঈশানী তাড়াতাড়ি ভিতরে এলো। শান্তনু কুণ্ঠিত হ'য়ে একখানা চৌকির প্রান্তে চুপ ক'রে বসেছিল। ঈশানীকে দেখে মুখ তুললো। বললে, ক্ষমা চাইছি, আপনার এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছি।

অন্যায় যখন ক'রেই ফেলেছেন তখন একটু বসুন।—পুরুষ মানুষ অদ্ভুত জীব! জ্ঞানে-অজ্ঞানে প্রতারণা না ক'রে আপনারা থাকতে পারেন না।

শান্তনু আরো কুণ্ঠিত হয়ে উঠলো। বললে, কই, আমি ত আপনাকে কোনো সময় প্রতারণা করিনি!

ঈশানী বললে, করেছেন, তবে টের পাননি।—যাক গে, ওরে নন্দ, এখানে

চা দিয়ে যা। আজ একটু গরম পড়েছে, কি বলুন? হঠাৎ যে আপনি? ব্যাপার কি?

শান্তনু বললে, নন্দর কাছে শুনলুম আপনি আমাদের ওখানে। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে ভাই আর ভাজের গালমন্দ নাই শুনলুম,—তাই আপনার এখানেই ব'সে অপেক্ষা করছিলুম।

আপনার ধারণা ভুল। তাঁরা আপনার কাব্যরচনার সুখ্যাতি করছিলেন।

মিথ্যে কথা! বিশ্বাস করিনে।

সত্যিই বলছি—ঈশানী হাসিমুখে বললে, রামায়ণের লক্ষ্মণের পরে আপনিই হলেন আদর্শ ভাই আর দেওর,—একথাও তাঁরা জানিয়ে দিলেন! কই দেখি, পকেট থেকে কবিতা-টবিতা কি আছে বা'র করুন,—শুনি।—কিছু না থাকে, হাতে আঁকা ছবিই একখানা দেখান না? সময় কাটুক।

শান্তনু বললে, আপনার কি এখানে সময় কাটাবার মতন কিছু নেই?

না, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু ছিলও না। ঈশানী চৌকির কোণে একসময় ব'সে পড়লো।

নন্দ এবার এসে দুজনের চা দিয়ে গেল। শান্ত কণ্ঠে ঈশানী বললে, ওঁদের ছোট ছেলেটিকে কি আপনি সত্যিই ভালোবাসেন?

শান্তনু চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললে, ওরা চায় না যে, ছেলেটা আমার কাছে থাকে। তাই দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে যায়,—আর ছেলেটাকে মারে। ওকে নিয়ে আসি লুকিয়ে, ওরা জানতে পারে না। যদি কখনও খাবার কিনে দিই, ওরা দেখতে পেলে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। আদর করলে ভাবে, আমি বুঝি ছেলেকে ভাগিয়ে নিচ্ছি।

আপনার ভালোবাসা পদে পদে অপমানিত হয়, এতে আপনার আঘাত লাগে না? ধরুন, ওরা যদি পছন্দ না করে, তাহলে ত আপনাকে স'রে যেতেই হবে একদিন।

যাবো।

গেলে সইতে পারবেন?

শান্তনু বললে, সয়ে যাবে একদিন।

ঈশানী এবার পেয়ালাটা তুলে নিল। প্রশ্ন করলো, আপনার মা-বাবা নেই? ভাই-বোন?

এবারে শান্তনু একটু সজাগ হয়ে উঠলো। বললে, এসব বড্ড ব্যক্তিগত কথা। কেউ নেই বললে আপনি সান্ত্বনা দেবেন, আমি কিন্তু তা'র জন্যে আসিনি।

ঈশানী বললে, সে আমি জানতে পেরেছি। এক মুঠো ভিক্ষেয় আপনার মন উঠবে না। তবে আপনার ব্যক্তিত্ব যদি এতই প্রবল, ওদের উচ্ছিষ্টের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

শান্তনু চুপ ক'রে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো। এক সময় বললে, দেখুন, মনের জটিলতা নিজেও অনেক সময় বুঝিনে। তা ছাড়া কা'র জীবনে কোথায় কি কথা লুকিয়ে থাকে, বলাও বড় কঠিন।

পেয়ালাটা রেখে শান্তনু এক সময় উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি যাই—

না, দাঁড়ান্।—ঈশানী বললে, আমার কাছে নাকি আপনার অনেক ঋণ, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন?

আপনাকে সাহায্য!—শান্তনু হো হো ক'রে হেসে উঠলো,—আমাকে পরীক্ষা করছেন বুঝি? আপনার চারদিকে এত লোক, এত আড়ম্বর, যা চোখে দেখলুম এতদিন ধ'রে,—আর আপনি চাচ্ছেন আমার সাহায্য?

ঈশানী বললে, আপনার সাহায্য পেলে আমার বড় উপকার হোতো!

শান্তনুর পক্ষে এ পরিস্থিতি বিশ্বাস করা কঠিন। এ যেন একটা অলস কবিকল্পনার মতো। রাজকন্যা সাহায্য চাইছে এক রাখালের কাছে,—যে ব্যক্তি জীবনে নিঃস্ব! এটা কেবল এই হ'তে পারে যে, হাতের মুঠোর মধ্যে তাকে পেয়ে বোকা বানানো হচ্ছে। এরপর দু' এক কথায় বেশী অগ্রসর হ'লে বাড়ীতে চাকর-বাকর আছে! অর্থাৎ—

শান্তনু দরজার দিকে তাকালো।

ঈশানী বললে, দেখুন, অন্য কিছু ভাববেন না। একটা কথা সত্যি ক'রে বলি, ওরা চ'লে গিয়ে আমি বেঁচেছি। আমি ওদেরই দলের, সন্দেহ নেই। পাঁচ বছর কাটলো ওদেরই নিয়ে। তবু একটা কথা আমার থেকে যাচ্ছে, এ আমি চাচ্ছিনে!

কি চাচ্ছেন?—সোজা প্রশ্ন করলো শান্তনু।

একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পৌঁছতে চাচ্ছি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে সাহায্য করে।

শান্তনু আবার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলো,—আপনি কি আজও সংসার করেননি?

সংসার!—

হঠাৎ ঈশানী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। পুনরায় বললে, আপনি না কবি, শিল্পী? এ কি আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন?

ক্ষমা করবেন, মেয়েছেলের কল্পনার দৌড় বিয়ে পর্যন্ত।—শান্তনু বললে, তা'র বাইরে আর কিছু নিয়ে তা'রা মাথা ঘামায় না।

সর্বনাশ!—ঈশানী বললে, দেখছি আগাগোড়াই আমার ভুল। যতটা আড়ষ্ট আপনাকে মনে করেছিলুম, আপনি তা' মোটেই নন। এসব কী বলছেন আপনি?

ঈশানীর নির্মল হাস্যমুখ দেখে শান্তনুর কণ্ঠে অসমসাহসিকতা দেখা গেল। সে বললে, বেশ ত' আমার জানা রইলো। বন্ধু সমাজে ব'লেও রাখবো। আমার দ্বারা কোনো সাহায্য হয়, আনন্দই পাবো। তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন না? আজকাল অনেক বয়স্থা কুমারী আর ইচ্ছাবতী বিধবারা গোপনে খবরের কাগজে পাত্র পাবার জন্য বিজ্ঞাপন পাঠায়! আপনি সেদিকে একটু মন দিতে পারেন! আপনার কল্যাণ কামনা ক'রেই বলছি।

হাসি চাপতে গিয়ে ঈশানীর দম আটকে আসছিল। মুখে হাত চেপে সে বললে, শিশু আপনার কেন প্রিয়, এখন বুঝতে পাচ্ছি। শিশুর মতো অজ্ঞান না হ'লে শিশুর সঙ্গে মেলে না।

শান্তনু সহাস্যে বললে, কিন্তু আপনার এই সাহায্য চাওয়াটা যে ভয়ের কথা, এ মানেন ত ?

ঈশানী বললে, ভয়ের কথা কেন ?

শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। বললে, ক্ষমা করবেন, এসব আলোচনা মিথ্যে। এইটুকুই আমার সীমা, এর বাইরে পা বাড়াতে চাইনে !

ঈশানী বললে, আবার কখন আসছেন ?

শান্তনু বললে, আসতে পারি, তবে ওই সাহায্যের কথাটাই যে মনে দুর্ভাবনা আনে।

খুব হেসে উঠলো দুজনে।

বাগানের ফটক পর্যন্ত ঈশানী এগিয়ে এলো। তারপর বললে, যার মনে কোনো দুরভিসন্ধি নেই, তাকে কিন্তু ভয়ানক খোঁচা দিয়ে যাচ্ছেন। এবার এসে ক্ষমা চাইবেন।

নমস্কার জানিয়ে শান্তনু হাসিমুখে হন হন ক'রে চ'লে গেল।—

২

তিন চার দিন পর্যন্ত ওদিক থেকে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঈষৎ উদ্বেগ আছে ঈশানীর মনে, একটু বা অস্বস্তি, শান্তনুর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে। রমেনবাবু লিখছেন, তুমি না এলে রিহার্সেল আর জমছে না। ওদের কলেজের পরীক্ষা আসন্ন, পরীক্ষার পর থেকে ওদেরকে নিয়মিত রিহার্সেলে আনা দরকার। তুমি এসে বসলে ওরা এদিকে মন দেবে।

দুটো হাটের দিন চ'লে গেল। ঈশানী নিজেই গিয়ে এদিক ওদিক খুঁজেছিল,—শান্তনু হাটেও আসে না। ও-বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ আনবে সে কোন্ সুবাদে? নন্দকে পাঠালেও অর্থটা খারাপ দাঁড়াতে পারে। ঈশানী চুপ ক'রে অপেক্ষা করছিল।

মাঠ পেরিয়ে রামতীরথ গিয়েছিল ওপারের পাহাড়তলীর দিকে, যেদিকে সাঁওতালপাড়া। কথায় কথায় রামতীরথ সেদিন বললে, শান্তনুবাবুকে সে ওদিকে ঘুরতে দেখে এসেছে।

কিছু বললেন তোমাকে?

না, মা, তিনি আমাকে দেখতে পাননি। আমিও তাঁকে বিরক্ত করিনি। বই-কাগজ নিয়ে পাহাড়ের ধারে নিজের মনে কাজ করছিলেন।

নন্দকে সঙ্গে নিয়ে ঈশানী বিকালের দিকে গেল সেইদিকে। কিন্তু যে-ভয়ে পালাও তুমি, সেই দেবী আমি! হঠাৎ পাহাড়ের বাঁকে দেখা হয়ে গেল দাদা আর বৌদিদির সঙ্গে। তিনটি রোগা ছেলেমেয়ে আশে-পাশে ট্যাংট্যাং করছে। ওরা বেরিয়েছে সান্ধ্যভ্রমণে। থমকে হাসিমুখে দাঁড়ালো ঈশানী। দিনান্তের রাঙ্গা আলোয় পাহাড়ের পাশে তাকে মানিয়েছিল বনলক্ষ্মীর মতো। বসন্ত-মঞ্জরীর গুচ্ছ গোঁজা ছিল তা'র এলো খোঁপার প্রান্তে।

বৌদিদি এগিয়ে এলেন, সহাস্যে বললেন, সাঁওতালি মেয়েদের স্বাস্থ্যের দেমাক দেখে চোখ ক্ষয়ে গেল, আপনাকে দেখিয়ে ওদের অহঙ্কার ঘোচাতে চাই। চ'লে যাবেন ব'লে সেদিন আমাদের নোটিশ দিয়ে এলেন, কিন্তু আপনি গেলে মিহিজাম যে অন্ধকার হয়ে যাবে ?

ঈশানী বললে, আর দিন দুই আছি। এবার সত্যি সত্যিই নোটিশ এসে গেছে। আমাকে এবার যেতেই হবে।

দাদা ছিলেন দূরে, তিনি কাছে এলেন। বললেন, কলকাতায় ফিরে কোথায় আপনার দর্শন পাওয়া যাবে ?

ঈশানী বললে, মুস্কিল, আমার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। বরং আপনাদের ঠিকানাই আমাকে দিন্, আমিই চেষ্টা করবো দেখা করতে।

দাদা কাগজ-পেন্সিল বা'র ক'রে একটি ঠিকানা দিলেন পাইকপাড়ার ওদিকে। ঈশানী সেটা রেখে দিল ভ্যানিটি ব্যাগে। ছোট ছেলেটি পাশে এসে দাঁড়ালো যেটি শান্তনুর প্রিয়। ঈশানী চিবুক নেড়ে তা'কে আদর জানালো। তারপর বললে, আপনার লক্ষ্মণ-দেওরটি এবার ঘরকন্নায় মন দিয়েছেন ?

স্বামি-স্ত্রী দুজনের চেহারাই দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠলো। বললেন, মন থাকলে ত' দেবে ? আপনি পর মানুষ, আপনাকে আর কি বলবো ! অত বড় ছেলে, রুজি-রোজগারের দিকে মন নেই। আর করবেই বা কেন ? জ্ঞাতগুষ্টির ছেলে, ঘরের শত্তুর ! এক পয়সার সাহায্য নেই, কেবল বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াও।

দাদা বললেন, আমারও প্রতিজ্ঞা, সামনের মাস থেকে যদি মাসিক খরচ না দেয়, তবে যেখানে খুশি চ'লে যাক্—আমাদের ওখানে আর জায়গা হবে না।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, উনি পড়াশুনা করেছেন কদ্দুর ?

দাদা বললেন, সেইটিই ত' দুঃখ ! বি-এ পাস করেছিল বেশ মন দিয়ে। কিন্তু পেট চলবে কেমন ক'রে একথা ভাবলো না কোনোদিন। আর কিছু না হোক, ইচ্ছে করলেই একটা যাহোক মাষ্টারিও পায় ;—কিন্তু ওই, কোনো কাজ করবে না। এরা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, ঘরের শত্রু !

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি। কিন্তু ঈশানী মুখ বুজে যদি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি অশ্রান্ত গালিবর্ষণই চলতে থাকবে। এটা যেন কেমন রুচিতে বাধে। কটূক্তির পিছনে প্রীতি নেই, আক্রোশটাই প্রধান,—সুতরাং এখানে আর দাঁড়ানো চলে না। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে এবার বিদায় নিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এর পর পাহাড়ের আশে-পাশে মাঠে-ময়দানে সে-লোকটাকে খুঁজে বেড়ানো মিথ্যে। ঈশানী চললো সোজা ষ্টেশনের দিকে। এই পথটা ধ'রেই শ্রমিক সাঁওতালি মেয়ে-পুরুষ মোটর-ট্রাকে চ'ড়ে যায় 'চিত্তরঞ্জনের' দিকে। নন্দ চললো পিছনে-পিছনে।

শান্তনুকে যতখানি মলিন ক'রে তা'র সামনে তুলে ধরা হোলো, সে ততখানি মলিন কিনা সন্দেহ আছে। লোকসমাজে যে-ব্যক্তি নিন্দিত, মেয়েমহলে তার প্রতি বিচার ভিন্ন রকমের। অযোগ্য ব'লেই সে অনাদৃত হবে, একথা সত্য নয়। তবু গুণী ব্যক্তির পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা বেমানান বৈ কি। দেশের কর্ম-জীবনে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, আলস্য-বিলাস নিয়ে এর থেকে যে-ব্যক্তি দূরে স'রে থাকবে, তা'র ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়,—এতে আর সন্দেহ কি। শান্তনুর সঙ্গে দেখা হ'লে একথা সে অবশ্যই তাকে বোঝাবার চেষ্টা পেতো।

ঈশানী নানা পথ ঘুরে অবশেষে বাড়ী ফিরে এলো।

রাত্রের দিকে চিঠি লিখতে ব'সে গেল সে রমেনবাবুকে। সে শীঘ্রই যাচ্ছে, তবে এখনও দিনস্থির করেনি। 'গীতালী সঙ্ঘের' উন্নতি হোক, এই তা'র কামনা। সে অনেক পেয়েছে ওদের কাছে,—স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং উপকার। ওদের অজস্র স্নেহে তা'র জীবন পরিপূর্ণ। তবে এবার কিছু-দিনের জন্য সে ছুটি চায়, ছুটি তা'র বড় দরকার। তাকে হয়ত নানা জায়গায় যেতে হবে, এবং নানান্ কারণে কিছুকাল তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হবে। এর জন্য আগে থেকেই সে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

চিঠিখানা বন্ধ ক'রে নন্দর হাতে দিয়ে সে বললে, কাল ভোরের ডাকেই যেন চ'লে যায়।

অসংখ্য কাজ তা'র প'ড়ে রয়েছে, কোনোটাই শেষ হয়নি। গত দু'মাসের হিসাবপত্র, কাগজের তাড়া গোছানো। ব্যাঙ্কের চিঠি এসেছে দুখানা, জবাব দেওয়া হয়নি। বন্ধুদের অসংখ্য চিঠি, অনেকগুলো খোলাও হয়ে ওঠেনি। বইগুলো এলোমেলো ছড়ানো, গোছাবার লোক নেই। প্রসাধনের অসংখ্য মূল্যবান উপকরণ, কিন্তু ওগুলো নাড়াচাড়া করতে আর ত'ার মন চায় না।

ঈশানী একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরুপায়ভাবে একখানা মোটা বই নিয়ে তা'র খাটের উপর গা এলিয়ে দিল।

বহু রাত অবধি সে বই নিয়ে জেগে রইলো।

ভোরের দিকে আকাশ সবেমাত্র স্বচ্ছ হচ্ছে, এমন সময় বড় একটা ঘটি হাতে নিয়ে নন্দ বাইরে বেরিয়ে এলো। এমনি সময়ে সে রোজই বেরোয় গয়লাবাড়ীর দিকে। কিন্তু বাগান পেরিয়ে মাঠে এসে পড়তেই দেখলো, অত ভোরে শান্তনু একটি সুটকেশ হাতে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে।

নন্দ বললে, কলকাতা যাচ্ছেন বাবু?

হ্যাঁ,—তোমার দিদিমণি উঠেছেন, নন্দ? একবার দেখা ক'রে যেতুম।

নন্দ বললে, তিনি ঘুমোচ্ছেন, অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশুনা করেছেন কিনা। উনি শরীরের ওপর বড্ড অযত্ন করেন। ডেকে দেবো তাঁকে?

শান্তনু বললে, ডাকলে বিরক্ত হবেন না ত?

না না, আপনি এসেছেন শুনলেই তিনি ছুটে আসবেন। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

নন্দ তাড়াতাড়ি ভিতরে যাচ্ছিল, সহসা পিছন থেকে শান্তনু আবার ডাকলো,—শোনো নন্দ—?

নন্দ ফিরে এলো,—কেন, বাবু?

থাক্ গে, আমি এখন যাই। ওঁর ঘুম ভাঙ্গাবার দরকার নেই।—শান্তনু বললে, কলকাতায় ফিরে গেলে আবার দেখা হবে। আমি তাড়াতাড়ি যাই, টিকিট কেনা বাকি।

শান্তনু দ্রুতপদে চলতে লাগলো।

ওই একই পথে খানিকদূর গেলে গয়লাবাড়ী। সুতরাং নন্দ চললো শান্তনুর সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার ঠিকানাটা গছিয়ে দিতে নন্দ ভুল করলো না। একথা জানালো, তাদের বাড়ীতে লোকজন আছে বটে, তবে দিদিমণি একলা।

শান্তনু চলতে চলতে প্রশ্ন করলো, একলা কেন ?

উনি ত' বরাবরই একলা বাবু! দিদিমণি বলেন, কলকাতায় উনি একলাই এসেছিলেন, কেউ ওঁকে সাহায্য করেনি।

তারপর ? তোমাদের মাইনে-পত্র দেয় কে, নন্দ ?

কেন, উনিই দেন্।

উনি টাকাকড়ি পান্ কোত্থেকে ?—শান্তনু জানতে চাইলো।

নন্দ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে একবার তাকালো। কি বলছেন, বাবু! আপনি বুঝি শোনেননি কিছু ? ওঁর দুই পায়ের কাছে এসে টাকা জড়ো হয়। সে টাকা খায় কে ?

শান্তনু প্রশ্ন করলো, এত টাকা কেমন ক'রে পান্ উনি ?

নন্দ বললে, হা আমার কপাল! আপনি তাহলে আগাগোড়া কিছুই জানেন না বলুন ?

জানবার চেষ্টাটা খুব ভালো নয়, নন্দ। তাছাড়া বুঝতেই পাচ্ছ আমরা সামান্য সাধারণ লোক। টাকাকড়িওলা লোকের সঙ্গে ভাব-আলাপ থাকলে নানা লোক নানা সন্দেহ করে। বুঝতে পারো ত' ?

গয়লাবাড়ী এসে গেছে। নন্দ একটু আহতকণ্ঠে বললে, বাবু, দিদিমণিকে তেমন মানুষ ঠাওরাবেন না, উনি সাক্ষাৎ দেবী। ওঁর দান-খয়রাৎ দেখলে নাস্তিকেরও মন ফিরে যায়।

শান্তনু হাসিমুখে বললে, তাহলে তোমার দিদিমণিকে বলো, আমিও গিয়ে একদিন সেলাম ঠুকে হাত পেতে দাঁড়াবো। আচ্ছা, আজ চলি।

শান্তনু হনহন ক'রে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। নন্দ একবার থমকে দাঁড়ালো। আশ্চর্য হয়েছে সে। এতদিন ধ'রে এত আলাপের পরেও একজন আরেকজনের সঠিক পরিচয় জানে না, এ তা'র কাছে সত্যই দুর্বোধ্য।

দুধের ঘটি নিয়ে নন্দ ফিরে এসে দেখলো, কাগজপত্র নিয়ে এরই মধ্যে দিদিমণি বারান্দায় ব'সে গেছেন। রামতীরথ চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোধ করি কোনো হুকুমের অপেক্ষায়।

মুখ তুলে ঈশানী বললে, নন্দ, ওবাড়ীতে একবার যা ত? গিয়ে বল্ কাল আমরা চ'লে যাবো সকালের গাড়ীতে। কলকাতায় ওঁদের কোনো কাজ থাকলে আমরা ক'রে দিতে পারবো।

ঘটিটা রামতীরথের কাছে গছিয়ে নন্দ চ'লে যাচ্ছিল, ঈশানী আবার বললে, যদি পারিস অমনি ওবাড়ীর ছোটবাবুকে একবার এখানে ডেকে দিস।

নন্দ বললে, ছোটবাবু! তিনি যে একটু আগে কলকাতা চ'লে গেলেন এই গাড়ীতে।

কার কথা বলছিস?—ঈশানী মুখ তুলে তাকালো।

শান্তনুবাবুর কথা বলছেন ত? তিনি যাবার আগে ভোরবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আপনি তখন ঘুমিয়ে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ঈশানী বললে, আমাকে তক্ষুণি ডাকলিনে কেন?

ডাকতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তিনিই বারণ করলেন।

বারণ করলেন? ও—ঈশানী একেবারে জুড়িয়ে গেল।—তাহ'লে থাক্, তোকে আর যেতে হবে না। গায়ে প'ড়ে অত উপকার করার আর দরকার নেই। নিজের কাজে যা।

কাগজপত্র ফেলে রেখে ঈশানী নিজেই উঠে চ'লে গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার। একটা লোক বিনা অপরাধে দিনরাত লাঞ্ছনা সইছে, এবং অপমানের ভাত মুখে দিচ্ছে,—এর থেকে শান্তনু নিষ্কৃতি নিল। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এ-অপমান বরদাস্ত করা কেমন ক'রে সম্ভব, ঈশানীর জানা নেই। কোথাও কোনো একটা কৈফিয়ৎ এর আছে, সেটা অজ্ঞাত। মনে পড়ছে, গত তিন দিন থেকে মাঝে মাঝে ঈশানী ওবাড়ী থেকে দাদা ও বৌদিদির তীব্র চাপা তিরস্কারের কণ্ঠ শুনেছে। বিস্ময়ের কথা, শান্তনু নীরব। হয় তার কোনো একটা গভীরতর

অপরাধ ওদের কাছে জমা আছে, আর নয়ত সে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ওদেরকে ক্ষমা করতে জানে।

রামতীরথ হাটে যাবার আগে ঈশানীর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, আজ মঙ্গলের হাট, মা।

ঈশানী বললে, শোনো রামতীরথ, আজকের মতন সামান্য জিনিস আনো, কাল ভোরে আমরা যাবো। তুমি তাড়াতাড়ি রান্না সেরে মালপত্র গোছাও, পাওনাদারদেরও মিটমাট ক'রে দাও। কাল সকালের এক্‌স্‌প্রেসেই যাবো। ধোপার বাড়ী থেকে কাপড় আনিয়ে নিয়ো।

যে আজ্ঞে।

ঈশানী তাড়াতাড়ি স্নান করতে চ'লে গেল।

* * *

ট্রেন এসে থামলো হাবড়া ষ্টেশনে। মধ্যাহ্নের রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেছে। যে-শ্রেণীর লোক নব বসন্তকে সম্বর্ধনা জানায়, তা'রা ফাল্গুনের চড়া রোদে নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতার পথে কখনও হাঁটেনি। দুরাশার সঙ্গে নৈরাশ্য, ক্ষুধার সঙ্গে চিত্তগ্লানি—এরা পথে পথে ছড়ানো।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পুল পার হয়ে শান্তনু চললো বাড়ীর দিকে। হেঁটেই যেতে হবে, সন্দেহ নেই। দাদা ও বৌদিদির কল্যাণে গাড়ীভাড়া জুটেছিল বটে, কিন্তু একেবারে গোণাগুণতি—বেকারের পক্ষে ট্রামবাসে চ'ড়ে বাড়ী ফেরাটা বিলাস, দাদা একথা বিশ্বাস করেন। স্যুটকেশটা ভারী লাগছে বৈ কি। হাত ব্যথা করলে কাঁধে তুলে নিতে হবে। পাইকপাড়ায় পৌছবে সে অপরাহ্ণে। বেশ ত, কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে চলো, মন্দ কি? যদি ঘর্মাক্ত হও, জামার হাতায় কপালের ঘাম মোছ। 'ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে। নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।'

কবিতাটা মনে পড়ে গিয়ে শান্তনু তা'র নিজের হাঁটু দুটোয় বেশ জোর পেয়ে গেল। নাঃ, কিছু রোজগার না করলে আর কিছুতেই চলছে না। কবিতা লিখে টাকা পাবার মতো খ্যাতি তা'র এখনও হয়নি। ফটোগ্রাফী ছাড়া গতি

নেই। কিছুদিন আগে দুটি শুঁড়ির ছেলেকে বাড়ীতে পড়াবার একটা কাজ তার জুটেছিল। দুবেলা খাওয়া, তাদের বাড়ীতে থাকা, সামান্য কিছু হাতখরচ। বড় জোর দশ টাকা। এর চেয়ে চাকর ভালো। ছেলে পড়াবার বিরক্তিকর দায়িত্ব নেই,—ফাই-ফরমাস খাটো,—মাসে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। মনিবের গৃহিণী যদি অম্লশূলে কি বাতব্যাধিতে ভোগেন, তবে পঁয়ত্রিশ টাকাও পাওয়া যায়।

তামাসা থাক্। স্যুটকেশটা আর সে বইতে পারছে না। এটা মিহিজামের পথ হ'লে ভালো হোতো, ঈশানীর ওই চাকরটাকে পাওয়া যেতো। যাক্, বেঁচে গেছে সে। আর একটু হ'লেই তা'র পদস্খলন হোতো ঈশানীর ফাঁদে পা দিয়ে। কিন্তু মেয়েটাকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না। অবশ্য ওরা বড়লোক, খেয়াল-খুশি নিয়ে ওরা ঘর করে। ওরা চড়ুইভাতিতে খরচ করে পাঁচশো টাকা, পুতুলের বিয়ে দেয় বাজনা বাজিয়ে, কুকুর কিনতে বিলেতে ছোটে, কিন্তু ভিখারী ভিক্ষা চাইলে ওরা গভর্ণমেণ্টকে গালি দিয়ে বলে, দেশ থেকে ভিখারী তাড়াও। 'এ আমার এ তোমার পাপ, বিধাতার বক্ষে এই তাপ বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়। ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের…'

আবার কবিতা আসে মাথায়। শান্তনু হন হন ক'রে চলতে লাগলো। মোট কথা, কিছু উপার্জন করা দরকার। উপার্জন করলেই সব ঠাণ্ডা! দাদার কণ্ঠে মধু ঝরতে থাকবে, বৌদিদির বিগলিত স্নেহধারা,—এমন কি ওই যে সেদিনের শ্রীমতী ঈশানী রায়,—তিনি পর্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটিকে বুঝতে পারা গেল না কোনোমতেই। সত্যি, মিহিজাম অবিনশ্বর হয়ে রইলো তা'র অন্তরে। এমন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা,—যেটা চিরকাল আপন পরমার্থকে বহন ক'রে চলবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পিছনে ঈশানীর কী ভীরু চাহনি, কণ্ঠে প্রসন্ন স্নেহের কী আশ্চর্য মাধুর্য। যেমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক থাকে অন্ধকার আকাশে মানুষের নাগালের বাইরে, মিহিজাম তেমনি রইলো তা'র জীবনে। ঈশানীর সঙ্গে ওই দিগন্তজোড়া প্রান্তর, ওই বাসন্তী রাত্রির মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্না, বন-বাগানের ওই জনবিরল একান্ত নিভৃত পরিবেশ,—এরা রয়ে গেল জীবনে চিরকাল নিগূঢ় ক্ষুধার মতো।

শান্তনু বাড়ী এসে পৌঁছলো অপরাহ্ণকালে। কপাল থেকে ঝরছে তা'র ঘাম, প্রিয়দর্শন চেহারাটা আগাগোড়া ক্লান্তি আর অবসাদে ভরা ; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চোখ দুটো ব'সে গেছে।

সরু পথ পেরিয়ে ভিতর দিকে তাদের সেকালের ভদ্রাসন। সামনে কাঁচা মস্ত উঠোন, আশে পাশে চূণ-বালিধ্বসা ঘরের দেওয়াল—অত্যন্ত জরাজীর্ণ আবহাওয়া। এ-বাড়ীতে তারা পুরুষানুক্রমিক বাসিন্দা। একটিমাত্র ভগ্নী ছিল, তা'র বিয়ে হয়ে কোন্ গ্রামের শ্বশুরবাড়ীতে চ'লে গেছে, দশ-বারো বছর হোলো তা'র কোনো খোঁজ-খবর নেই। বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছে, এ-বাড়ীর একাংশের সে নাকি মালিক।—কিন্তু এও শুনছে আজ বিশ বছর ধ'রে যে, মামলা-মোকদ্দমায় আর ট্যাক্স-খাজনার দেনায় এ-বাড়ীর মাথা নাকি ছাপানো। সুতরাং এ সম্পত্তির অংশ পাবার আশা-ভরসা তা'র বড়ই কম।

শান্তনু ফিরে এসেছে মিহিজাম থেকে, এ সংবাদ অবশ্য ভিতরে তখনই পৌঁছলো। কিন্তু হঠাৎ একটা চাপা কোলাহল তা'র কানে এলো। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, এখন আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করার মতো তা'র মন নেই। জামাটা ছেড়ে সে তক্তার উপর গা ছড়িয়ে দিল। প্রায় তিন সপ্তাহ সে বাইরে ছিল,—ঘরে কেউ ঢোকেওনি, ঝাঁটও দেয়নি। স্যাঁতসেঁতে গন্ধটা তা'র নাকে আসছে। কিন্তু চুপ ক'রে সে প'ড়ে রইলো অনেকক্ষণ। বোঝা ব'য়ে হাতখানা এখনও কনকন করছে।

সমস্ত বাড়ীটা তা'র বিরুদ্ধে। জেঠাইমা, মামা এবং অন্যান্য জেঠতুতো ভাইবোন, এ বাড়ীর আশ্রিত এক জ্ঞাতি ভগ্নীপতি, একপাল নাবালক,—সব মিলিয়ে মস্ত পরিবার। শান্তনুর অংশে শান্তনু একা। একা ব'লেই তা'র অস্তিত্বটা বাড়ীর সকলের পক্ষে অসুবিধাজনক।

ঘরের বাইরে কে-কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা কণ্ঠ ও হাসাহাসি আশেপাশে। সহসা ওদেরই ভিতর থেকে তা'র জেঠতুতো বিবাহিতা বোন মিনু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে হাসলো,—ছোড়দা, তুমি বিয়ে করলে কবে ?

শান্তনু শুয়েছিল, উঠে বসলো।—বিয়ে ? মানে ?

মিন্নু বললে, তা নয়ত কি? একটা বৌ আছে তোমার, কেউ কিচ্ছু জানতে পারেনি এতদিন। তুমিও চেপে আছো।

শান্তনু ধমকে উঠলো, কি বকছিস?

হঠাৎ জেঠাইমা ঘরে ঢুকলেন। চেঁচিয়ে বললেন, ধমক অমনি দিলেই হোলো? সিঁদুর পরা বৌ তোমার খোঁজে আসছে দিনে তিনবার, বিয়ে করোনি আবার কি?

মিন্নু বললে, ডুবে-ডুবে বুঝি এতদিন জল খাওয়া হচ্ছিল?

শান্তনুর প্রিয়দর্শন সৌম্য চেহারাটা দেখতে দেখতে কঠোর হ'য়ে উঠলো। বললে, এ সব তোমাদের মিথ্যে কথা, ধাপ্পাবাজি!

জেঠাইমাও আগুন হয়ে উঠলেন।—ধাপ্পাবাজি? কুড়ি দিনে কুড়িবার এসে তোমার খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় জানাজানি, চারিদিকে হাসাহাসি,—সবার মাঝখান দিয়ে বৌ এসে বাড়ীতে ঢুকে কান্নাকাটি ক'রে যাচ্ছে,—একে ধাপ্পাবাজি কে বলে?

শান্তনু বললে, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে, জেঠাইমা।

আমিও চাইনে, শান্তনু। কিন্তু এ-বাড়ীতে কোনো ইত্যিজাতের মেয়ে নিয়ে এসে উঠবে, এও আমি চাইনে ব'লে রাখলুম।

জেঠাইমা হন্ হন্ ক'রে ভিতরে চ'লে গেলেন। মিন্নু গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। কে একজন যাবার সময় ব'লে গেল, বেশ ত, বেলা গড়িয়ে এলো, বৌ এখনি আসবে—তখন হাতে-নাতে প্রমাণ।

শান্তনু কোনো কিছু গ্রাহ্য করলো না। তক্তার উপরে পুনরায় কিছুক্ষণ সে প'ড়ে রইলো, তারপর আবার উঠলো। স্নানের আয়োজন ক'রে এক সময় সে গিয়ে স্নান ক'রে এলো। সমস্ত সময়টা আড়াল থেকে সবাই যে তা'র গতিবিধি লক্ষ্য করছে, এটা সে বুঝতে পারছিল বৈ কি। চাপা হাসি আর টুক্‌রো মন্তব্য এধার-ওধার থেকে তা'র কানে আসছিল।

কিছুক্ষণ পরে ওই মিন্নুই এলো ভাতের থালা হাতে নিয়ে। থালা নামিয়ে আসন পেতে দিয়ে সে বললে, রাগ ক'রো না ছোড়দা, আগে দুটি খেয়ে নাও

জলজ্যান্ত একটা মেয়ে তোমার বৌ ব'লে পরিচয় দিয়ে বাড়ীতে এসে দাঁড়াচ্ছে, এত বড় একটা ঘটনার সবটাই মিথ্যে তুমি বলতে চাও?

শান্তনু আসনের উপর ব'সে ভাতের থালায় হাত বাড়ালো। তারপর বললে, জলজ্যান্ত মেয়েটা হয়ত সত্য। কিন্তু বৌ আর বিয়ে কোনোটাই সত্য নয়!

তুমি বিয়ে করোনি? সুষমা তোমার বউ নয় বলতে চাও?

না।

তাহলে কী কাণ্ড বাধিয়েছ, শুনি? কে ওই মেয়েটা?

কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে এবার শান্তনু বললে, এ রকম ক'রে আমাকে আক্রমণ করা তোমাদের উচিত হয়নি। জেঠাইমা শান্তভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন।

মিনু বললে, কেমন ক'রে তিনি শান্ত হবেন? চারদিকে যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে। তুমি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, পাড়ায়-পাড়ায় এ-বাড়ীর নাম-ডাক, গিজগিজ করছে আত্মীয়-কুটুম্ব,—মায়ের মেজাজ কেমন ক'রে ঠিক থাকবে? এবার বলো দিকি ব্যাপারটা আগাগোড়া?

বিয়ে আমি করিনি, মিনি।

বেশ। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, একটা মেয়ে হঠাৎ মাথায় সিঁদুর দিয়ে এসে বলবে, সে তোমার বৌ? তুমি ত' লেখাপড়া জানা ছেলে! এটার মধ্যে কি কোনো কথাই নেই, তুমি বলতে চাও?

মিনু বেশ গুছিয়ে বসলো। শান্তনু বললে, তুই বুঝি ভাতের থালা সামনে দিয়ে মন ভুলিয়ে কথা বা'র করতে চাস?

মিনু বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার বোকামি। যেমন তুমি বোকা চিরকাল! চাপা রইলো কিছু? হাঁড়িটা যে হাটের মাঝখানেই ভাঙ্গলো, ছোড়দা? লুকোতে পারলে? গেল কালও সে-মেয়েটা তোমার খোঁজ নিতে এসেছিল, তা জানো?

শান্তনু বললে, তোরা কি সবাই মিলে শুনতে চাস যে, আমি বিয়ে করেছি? তাহ'লে শোন্, বিয়ে আমি করিনি।

তা'র কপালে তাহ'লে সিঁদূর উঠলো কেমন ক'রে ?

শান্তনু বললে, এক পয়সা দামের সিঁদূর যে-কোনো মসলার দোকানে পাওয়া যায়। যে-কোনো মেয়ে সেটি কিনে কপালে মাখতে পারে। ওটার নাম নারী-স্বাধীনতা।

শান্তনু উঠে হাত ধুতে চ'লে গেল। মিনু চুপ ক'রে ব'সে রইলো। মিনিট দুই পরে ফিরে এসে শান্তনু জামাটা গায়ে দিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করলো।

মিনু বললে, তুমি চ'লে যাচ্ছ, কিন্তু সে-মেয়েটা এলে এবার আমরা কি বলবো ?

থমকে দাঁড়ালো শান্তনু। বললে, এই কথা বলো যে, এ-বাড়ীতে আর যেই থাক্, তোমার স্বামী থাকে না।

একথা সে শুনবে ?

শান্তনু বললে, তা'হলে আরেকটু কড়া ক'রেই কথাটা শুনিয়ে দিয়ো ? বলো, তুমি পৃথিবীর যে-কোনো ব্যক্তিকে স্বামী মনে করতে পারো, কিন্তু পৃথিবী কোনো এক ব্যক্তি তোমাকে স্ত্রী ব'লে মনে করে না।

দ্রুতপদে শান্তনু বেরিয়ে চ'লে গেল।

একখানা কাগজের আফিসে কতকগুলি ফটোর জন্য কিছু টাকা শান্তনুর পাওনা ছিল। সেই টাকাগুলি আদায় করতে লাগলো ঘণ্টা দুই। তারপর আর তা'কে রোখে কে! মাঝে মাঝে হঠাৎ সে ধনবান হয়ে ওঠে। যেমন আজকে। কিছুদিন আগে এক শিক্ষকের বেনামীতে নোট বই লিখে দিয়ে বেশ কিছু টাকা সে পেয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে সেদিন সে মস্ত ভোজ দিয়েছিল।

কিন্তু আজকে তা'র বাড়ীর অপ্রীতিকর ঘটনায় সর্বশরীর তা'র মাঝে মাঝে ঘুলিয়ে উঠছিল। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈশানী সেদিন তা'কে কথায় কথায় ব'লেছিল, ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা না থাকলে মানুষ হয়ে ওঠে ঘটনার ক্রীড়নক। নিজের অজ্ঞাতেই নিজের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করে—যেটার পরিণাম তা'র উপলব্ধির বাইরে। তা'র অনিচ্ছায় তাকে নিয়েই তা'র জীবনের ইতিহাস রচিত হচ্ছে, যেটার ওপর তা'র কোনো হাত নেই।

কালীঘাটের আশে-পাশে নানা পথ চ'লে গেছে নানাদিকে, তারই কোনো একটা গলিতে ঢুকে শান্তনু সোজা এসে পৌঁছলো এক বাড়ীতে। সামনে উঁচু রোয়াক, তারই এক প্রান্তে দরজা। ভিতরের উঠোনের চারপাশে কয়েকটি গৃহস্থ-ভাড়াটের বাসাড়ে ঘরকন্না। উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভিতরের ঘরগুলো অন্ধকার মনে হয়।

শান্তনুকে দেখে একটি বয়স্কা বিধবা মহিলা মাথায় একটু ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন। শান্তনুর সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ চেহারার নিজস্ব একটা আকর্ষণ ছিল। সেজন্য আশেপাশে দু'একটি গৃহস্থের মেয়েছেলে একবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখে গেল। শান্তনুকে সবাই চেনে।

শান্তনু বারান্দার শানের উপরে উঠে এসে কথা পাড়লো। একটু উত্তেজিত-ভাবে বললে, আপনার মেয়ে নাকি আমার বাড়ীতে প্রায় রোজই আনাগোনা করছিল? ব্যাপার কি?

বিধবা মহিলা বললেন, ঘরে এসে বসো, বাবা। বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার খোঁজখবর না পেয়ে সুষমা বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছিল।

কেন বলুন ত?—সোজা তাকালো শান্তনু। তা'র মনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছিল, সেটার উত্তেজনা তা'র মুখের ওপর সুস্পষ্ট।

আমি সুষমাকে ডেকে দিই, বাবা।—মহিলা দ্রুতপদে পাশের ঘরে গেলেন।

মিনিট তিনেক, তারপরেই একটি তরুণী মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সহাস্যমুখে। শ্যামবর্ণ চেহারা, বছর কুড়ি-বাইশ বয়স, মুখখানায় লাবণ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কপালে সিঁদুরের চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু শান্তনুর মুখে গাম্ভীর্যের কঠিন ছাপ দেখে সুষমা নিজেকে সম্বরণ করলো বললে, ভেতরে এসো। মায়ের মুখের ওপর কিছু বলোনি ত?

শান্তনু বললে, কিছু বলিনি, কিন্তু এবার বলতে বাধ্য হবো। কী কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ বলো ত?

আঃ, আস্তে কথা বলো। তুমি ব'লে গিয়েছিলে তিন দিন বাদে ফিরবে। কুড়ি-বাইশ দিন করলে কেন?

তা'তে হয়েছে কি ? আমার জন্যে কোনো মেয়ে অস্থির হবে, এটা শুনতে আমার নিজের ভালো লাগে না।—শান্তনু বললে, তাছাড়া তুমি নাকি মাথায় সিঁদুর দিয়ে ও-বাড়ীতে ব'লে এসেছ, আমি তোমার স্বামী ? এর মানে কি ? তোমার মা এ-বিষয়ে কি বলেন ? তুমি আমার স্ত্রী—একথা কবে প্রমাণিত হোলো ?

চাপাকণ্ঠে শান্তনু কথা বলছিল। তবু একটু ভয় পেয়ে সুষমা বললে, চেঁচিয়ো না বলছি ! আমাকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করে তখন আমি কি জবাব দিই ? যাবার সময় তুমি আমার মাকে ব'লে গিয়েছিলে যে, সুষমার জন্যে আপনার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, ওর কোনো একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে ! তোমার কথায় তিনি যা ভেবে নেবার, তাই নিয়েছেন !

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তা'তে কি এই বোঝায় তুমি আমার কাঁধে চ'ড়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে ? আমার বাড়ীতে যেতে তোমাকে কে বলেছিল ? সিঁদুর মাথায় দিলে কেন তুমি ? আমাকে স্বামী ব'লেই বা সেখানে জাহির ক'রে এলে কেন ? মতলব কি তোমাদের ?

সুষমা একটু ভীত হয়ে তাকালো বাইরের দিকে। তারপর বললে, থাক গে, এসব কথা এখানে দরকার নেই। বাইরে চলো, তারপর আগাগোড়া ব্যাপারটা আমি সব বলবো। চা খাবে ?

শান্তনু বললে, না।

তবে দাঁড়াও, আমি আসছি।—এই ব'লে সুষমা পাশের ঘরে গেল। সে-ঘরে সুষমার মা ছিলেন,—দুজনের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা হোলো। তারপর মিনিট পাঁচেক পরে সুষমা আবার এ-ঘরে এসে দাঁড়ালো। কুমারী মেয়ে যেমন বেরোবার সাজসজ্জা করে, ঠিক তেমনি। বললে, চলো।

পথে বেরিয়ে গলির মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে সুষমা এক সময় বললে, তোমাকে আমি জব্দ করবো, একথা তুমি ভেবে নিয়েছ কেন ?

শান্তনু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, বাড়ীতে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই, সে-খবর রাখো ?

তোমার বাড়ী না গিয়ে আমি আর কি করতে পারতুম ?

তাই ব'লে সিঁদূর প'রে গেলে ? স্ত্রী ব'লে জানিয়ে এলে ?

সুষমা বললে, তাছাড়া কোন্ সুবাদে গিয়ে দাঁড়াবো তোমার বাড়ীতে ? আমার এখানে ত' আর সিঁদূর পরিনি ! ঘোমটাও দিইনি। মা জানে, তুমি আমাকে বিয়ে করবে। যদি না করো, নাই করলে !

কিন্তু আমার বাড়ীর লোক কি বলবে ?

সুষমা এবার একটু হাসলো। বললে, তোমার একটু নিন্দে হয়েছে, এই ত। তুমি কবি, শিল্পী, একটু-আধটু অখ্যাতি না থাকলে তোমাকে লোকে যে গ্রাহ্য করবে না। চলো, বাগানে ঢুকি। আমাদের চেনা বেঞ্চিতে গিয়ে বসি।

ওরা দুজনে বাগানে এসে ঢুকলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আলো ছ চারদিকে। গাছের আড়ালে একখানা বিশেষ বেঞ্চে ওরা এসে বসলো। পরিহাস শুনেও শান্তনু চুপ ক'রে রইলো। সুষমা বললে, আমার খুড়তুতো ভাই যোগেনদাকে তুমি জানো। ও আমাদের সব খরচ চালায়। এখানে থাকাও আর আমাদের চলছে না। ছোট ভাইকে মা স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে। দাদা আর দিল্লী থেকে খরচ পাঠায় না। সেখানে নাকি বৌদির খুব অসুখ। আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে মা নিশ্চিন্ত হয়ে চ'লে যেতে পারতো।

শান্তনু বললে, তোমার কি ব্যবস্থা ?

যা হোক একটা কিছু। তোমাকে ত কতবার বলেছি, আমাকে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে দিলে অন্ততঃ নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুবিধে পাই !

দক্ষিণের হাওয়া আসছে মৃদু মৃদু। মিহিজামের আকাশ থেকে সেই চাঁদ এসেছে শান্তনুর সঙ্গে। কিন্তু সেইদিকে কা'রো ভ্রূক্ষেপ নেই।

শান্তনু বললে, তোমাদের সব রকমের সমস্যা আছে। কিন্তু আমাকে সেই জালে জড়াচ্ছ কেন ? নিজেই ভাব করলে আমার সঙ্গে, আমাকে টানতে-টানতে ঘোরালে নানা জায়গায়, যখনই চ'লে যেতে চেয়েছি তখনই পিছু পিছু ধাওয়া করেছ,—এখন আবার সিঁদূর মেখে বাড়ীতে গিয়ে ব'লে এলে, আমি তোমার স্বামী ! এর নাম বুঝি তোমাদের ভালোবাসা ?

সুষমা বললে, আমাকে কি তোমার একটুও ভালো লাগে না ?

শান্তনু বললে, ভালো লাগলেই বা কি ? এমন কি কোনো কারণ ঘটেছে, যার জন্যে তুমি আমাকে স্বামী ব'লে মনে করতে পারো ?

সুষমা বললে, তুমি আমার ভালোবাসাকে পায়ে থেঁৎলেছ এতদিন, তা জানো ?

সেজন্যে নিজেকেই তুমি ধিক্কার দাও, আমাকে নয়। তোমার ভালো হোক, এই আমি চেয়েছি। তুমি আমাকে ভালোবেসে পাগল হও, এ আমি চাইনি। —শান্তনু বললে, পাছে তোমার মনে কোনোদিন বিকার বা বিভ্রম আসে, এজন্যে তোমার একটি আঙুলও আমি ছুঁইনি।

সুষমা বললে, তুমি আমাকে ঘেন্না করো, সে আমি জানি। মাকে আমি সব কথাই এবার বুঝিয়ে বলবো। এও বলবো যে, মা, তুমি শান্তনুর দুরাশা ত্যাগ করো।

শান্তনু বললে, সে-দুরাশা তুমিই জাগিয়েছ তাঁর মনে।

হ্যাঁ, আমারই ভুল। চোরাবালির ওপর ঘর বাঁধতে গিয়েছিলুম। প্রথম দিন কেন তুমি হাসিমুখে তাকিয়েছিলে ? আমি যখন নেমন্তন্ন করলুম, তুমি মুখ ফিরিয়ে কেন চ'লে যাওনি ?

অনুশোচনায় সুষমার চোখে কান্না এলো।

শান্তনু বললে, আমার ভদ্রতাকে ভালোবাসা ব'লে ভুল করেছ তুমি, সে কি আমার দোষ ? একেই বুঝি তোমরা প্রেম বলো ? দু'দিন একটু মিষ্টি ক'রে আলাপ করলেই অমনি তোমরা ভাবো, প্রেমে প'ড়ে গেলুম ? ছেলেরা ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে, দুঃখ সয়, উপবাস করে, জগদ্দল পাথরের বোঝা ব'য়ে বেড়ায়, ঘাম গড়ায়, রক্ত ঝরায়, বুক-ফাটা চোখের জলে দেনা শোধ করে,—সেদিকে তোমাদের চোখ পড়ে না ?

আঁচলে চোখ মুছে সুষমা বললে, তোমাদের জন্যেই ত' আমাদের দুঃখ !

না।—শান্তনু বললে, তোমাদের আরামের লোভ, ঘরকন্নার লোভ, তাই দুঃখ পাও। কোনোমতে একটা স্বামী পেয়ে গেলেই ঘরে উঠবো,—এই

অভিসন্ধি নিয়ে তোমরা মানুষ হও। পুরুষ পছন্দ করবে, তাই লেখাপড়া শেখো। গান শেখো পুরুষের মন পাবার জন্যে। নাচলে পুরুষ আনন্দ পায়, এ তোমরা জানো। সোনার গয়না গায়ে চড়ালে আজকাল ছেলেরা তামাসা করে, তাই তোমরা গয়না খুলে ফেলছো। এই পরের মুখ চাওয়াটা ত্যাগ করো, নৈলে তোমাদের উন্নতি নেই।

সুষমা বললে, তুমি ত' মিহিজাম থেকে একখানা চিঠিও লিখতে পারতে!

কেন লিখবো?

মাঝে মাঝে চিঠি পেলে কি আর তোমার বাড়ীতে যেতুম?

তোমার যাওয়ার ফলে এই হোলো যে, ও-বাড়ী ছেড়ে আমাকে চ'লে যেতে হবে শীঘ্র।

উদ্বিগ্ন হয়ে সুষমা বললে, কোথায় যাবে?

শান্তনু বললে, যাবো যেখানে খুশি। তুমি তা'র কৈফিয়ৎ নাই নিলে!

তুমি কি সত্যিই চাও না, আমি তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি?—সুষমা মুখ তুলে তাকালো।

শান্তনু পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিল, অন্ধ আকর্ষণ বাদ দাও, তোমার পারিবারিক সমস্যায় আমাকে জড়িয়ো না, কথায় কথায় ভালোবাসার কথা তুলো না। তা হ'লেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে।

সুষমা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর এক সময় নিজের মনেই বললে, আমার আর কোনো উপায় নেই। যোগেনদা তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচে। কাকার ভরসা একেবারেই নেই। দাদা হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ছোট ভাইটা মানুষ হবে না। আমার নিজের একটা ব্যবস্থা হ'লেও অনেকটা সুবিধে হোতো। কিন্তু সব দিক অন্ধকার।

আবার দুজনে চুপ। চাঁদ এসেছে প্রায় মাথার ওপর। মস্ত বাগানটা ধীরে ধীরে জনবিরল হয়ে আসছে। দুজনের জীবনে আশা-আশ্বাস বিশেষ কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু এক সময় গা ঝাড়া দিল। বললে, এবার আমি উঠি।

উঠে দাঁড়াবার আগ্রহ সুষমার বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু বললে, কাল আবার আসছো ত ?

রোজ রোজ আসার কিছু দরকার দেখিনে।

তুমি কি না এসে আমাকে ব্যস্ত করতে চাও ?

শান্তনু বললে, তুমি নিজের ওপরে জোর পাও, এই আমি চাই। আমি এলে তোমার কাজ হবে না। তুমি একা ভাবো তোমার ভবিষ্যৎ, আমাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি,—আমার ভরসা রেখো না। যদি কখনও তোমার উপযুক্ত কাজকর্মের সন্ধান পাই, আমি নিজেই এসে জানাবো।

অনুযোগ ক'রে সুষমা বললে, একলা আমি কেমন ক'রে আমার উপায় স্থির করবো, তা কই বললে না ?

ঘা খাবে, হোঁচট খাবে, দুঃখ-দুর্দশা সইবে—দেখবে তাদেরই ভেতর থেকে নিজের উপায় খুঁজে পাচ্ছ।—শান্তনু একটু অধীর হয়ে বলতে লাগলো, কিন্তু আর যাই করো, দয়া ক'রে কপালে সিঁদূর লেপে আমার বাড়ী আক্রমণ করো না।

এবার সুষমা উঠে দাঁড়ালো। দু'পা এগিয়ে যেতে যেতে বললে, শিক্ষা আমার খুবই হোলো। যদি আমার কোনো উপায় থাকতো তোমাকে ঠিকই ছেড়ে দিতুম।

শান্তনুও অগ্রসর হোলো। বললে, ছাড়তে তোমাকে বলিনি। আমিও তোমার মুখ দেখবো না, এমন প্রতিজ্ঞাও করিনি। দুজনেই থাকি, হোক না দেখাশুনো মধ্যে মাঝে! কিন্তু তোমার ওই প্রেম আর প্রণয়ের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এর শৃঙ্খল আমার সইবে না। তবে আবার আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার কোনো একটা কাজ-কর্মের জন্য আমি সত্যি সত্যিই মন দিয়ে চেষ্টা করবো।

কম্পিতকণ্ঠে সুষমা বললে, কোনোদিন তোমাকে যদি দেখবার ইচ্ছে হয় ?

আমি নিজেই আসবো, তুমি যেয়ো না। তুমি গেলেই লোকলজ্জা, আমার

মন আরো বিরূপ হয়ে উঠবে। মেয়ে আর ছেলে—এক সঙ্গে দেখা হ'লেই ঝঞ্ঝাট আর গণ্ডগোল। এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও।—শান্তনু পুনরায় বললে, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দুজনে বাগান থেকে বেরিয়ে এলো।

ট্রাম লাইনটা পেরিয়ে এপারের ফুটপাথে উঠে শান্তনু বললে, ভালোবাসা সহজ—যেখানে বাস্তব সমস্যা প্রবল নয়। অনেক কবি আর শিল্পী আছে যারা মনের মতন চাকরি পেলে আর কাব্য শিল্প নিয়ে মাথা ঘামায় না। অনেক প্রেমিকা আছে যারা দুটি একটি সন্তানের জননী হলে প্রেমের কথা ভুলে যায়। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যে যদি কোনো মেয়ে প্রণয়ের নামে পুরুষ মানুষের অবলম্বন খোঁজে, তাকে কি সহজ ভালোবাসা বলবে তুমি? একথা আমি বিশ্বাস করি, সুষমা, তুমি যেদিন উপার্জন ক'রে তোমার সংসারের অভাব ঘোচাতে পারবে, সেইদিনই তোমার এই সব প্রাণ-সমস্যার প্রতিকার হবে।

সুষমা আর কোনো সম্ভাষণ জানালো না। গলির মুখের কাছে এসে শান্তনু বললে, এবার আমি যাই। আমি নিজেই ঠিক সময়ে তোমার খবর নেবো।

একটি কথাও সুষমা বললে না এবং একটি বারও আর মুখ ফেরালো না। শান্তনু চ'লে গেল।

মেয়েটা অবুঝ, মেয়েটা সরল,—সেই কারণে আপন হঠকারিতার সম্ভাব্য পরিণামটা বুঝতে পারেনি। শান্তনু নিরুপায় বেকার, কিন্তু যদি তার হাতে কোনো উপায় থাকতো তবে এই মেয়েটির কল্যাণকর্মে সে নিজেকে নিয়োজিত করতো। এ মেয়ে অতি সাধারণ, অত্যন্ত সহজবোধ্য, চিরকালের অবলা। ভাণ-ভণিতা নেই জীবনে, বিলাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, তারুণ্য-সজ্জায় পুরুষের মন ভোলাবার চেষ্টা করে না, প্রণয়-বিলাপের গদগদ ভাষা শেখেনি কোনোদিন। এরা নিতান্তই স্নেহের বস্তু।

শান্তনু এক পথ থেকে গেল অন্য পথে। প্রত্যাখ্যান থেকে এসেছে তার প্রতিক্রিয়া। সমস্ত মনটা তা'র বেদনায় টনটন করছে। তা'র একমাত্র কামনা রইল, সুষমার দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচুক, ওর ভবিষ্যৎ আনন্দময় হোক।

৩

বেকারের পক্ষে সময়ানুগত্য রক্ষা করার কথা ওঠে না। কোনো একখানা বই নিয়ে অধিক রাত্রি জাগা, তারপর অনেক বেলায় বিছানা ছেড়া ওঠা। প্রভাত সূর্য কা'কে বলে সেটি জানা নেই। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে শান্তনু ঘন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

অনেকক্ষণ হ'তে চললো, বাইরে কি যেন একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। শান্তনু সেদিকে একবার চোখ খুলে আবার পাশ ফিরে নাক ডাকালো। তথা-কথিত 'বৌ'কে সে নিষেধ ক'রে দিয়ে এসেছে, সুতরাং আর কোনোই উদ্বেগের কারণ নেই। এমন তুরীয় 'স্ত্রী' আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটে, বলাও কঠিন।

বাইরে একটা কথাবার্তা চলছিল। এই নোংরা গলির মধ্যে ভোরের দিকে এক ঝাড়ুদার ছাড়া আর কেউ ঢোকে না এবং তা'রা কলের পুতুলের মতো কাজ করে চলে যায়।

কে যেন এক ব্যক্তি এসে একটি বিশেষ নম্বরের বাড়ী খুঁজছিল এবং এ-বাড়ীতে নম্বর লটকানো না থাকলেও শান্তনু চৌধুরী আছে কিনা এই নিয়ে একটা আলোচনা চলছিল। পাড়ার কোনো কোনো নাবালক এই ভোরবেলায় এ-বাড়ীর কড়া নাড়ছে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শান্তনুকে জাগতে হলো। তা'র ধারণা, ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, কোনো মতেই তা'র স্বাস্থ্য খারাপ হ'তে চায় না। তা'র প্রতি অনেকের আক্রোশ এই কারণে যে, এ-বাড়ীর কা'রো সঙ্গে তা'র চেহারার সাদৃশ্য নেই, সে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। সে যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ পাকায়, তাহ'লে এক জেঠিমা ছাড়া আর সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বাড়ীর কেউ এখনও বিছানা ছাড়েনি। শান্তনু শোয় বাইরের দিকের পরিত্যক্ত নোংরা ঘরখানায়,—যেখানা ছেড়ে গেলে একমাত্র গোয়াল ঘর হ'তে পারে! বৌদিদি বলেন, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। উপমা প্রয়োগে বাঙ্গালী মেয়ের জুড়ি নেই,—বৌদির অন্তর্দৃষ্টি একেবারে নিখুঁৎ।

মুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে চড়িয়ে শান্তনু বাইরে এসে একেবারে হতবাক্। সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীমান্ নন্দ। নন্দও নত নমস্কার জানিয়ে কুশলবার্তা বিনিময় ক'রে অবশেষে নিবেদন করলো, এক্ষুণি আপনাকে যেতে হবে, ছোটবাবু।

শান্তনু বললে, কোন্ চুলোয়, নন্দ? এত ভোরবেলায় মুরগী ছাড়া আর কেউ ওঠে না, তা জানো? কোথায় আমাকে নিয়ে গিয়ে জবাই করতে চাও?

নন্দ জিভ কেটে বললে, ছোটবাবু, ওকথা বলতে নেই। আমাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন রাত থাকতে উঠিয়ে, পাছে বেলা হ'লে আপনি বেরিয়ে যান। সেখানে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন। যেমন আছেন এইভাবেই চ'লে আসুন।

শান্তনু বললে, দশমাইল দূরে গিয়ে চা খাবো সকালবেলায়? সেই চা চিনি দিয়ে না মধু দিয়ে তৈরী, নন্দ? কই, নেমন্তন্নর পত্র কোথায়?

নন্দ বললে, চিঠি দিলে পাছে আপনি বেঁকে বসেন, সেজন্য গাড়ী দিয়ে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে। চলুন ছোটবাবু, চা খেতে দেরি হ'লে আপনার শরীর খারাপ হবে।

বাঃ, নন্দ, তুমি ত' দিব্য সুশিক্ষিত কিঙ্কর! দাঁড়াও, চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে আসি।

গলির বাইরে একখানা মস্ত মোটর দাঁড়িয়েছিল। দুজনে এসে গাড়ীতে উঠলো। নন্দ যথারীতি বসলো ড্রাইভারের পাশে। গাড়ী ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে দক্ষিণ কলকাতার দিকে। নতুন রাস্তাটা ধ'রেই চললো—যে রাস্তা দিয়ে সেদিন শান্তনু সুটকেশ ঘাড়ে ক'রে অত রৌদ্রে হেঁটে এসেছিল হাবড়া ষ্টেশন থেকে। প্রভাতকালের কলকাতার পথঘাট সুন্দর, প্রথম আবিষ্কার করলো শান্তনু।

মিনিট কুড়ি লাগলো পৌছতে। মস্ত বড় বাড়ীর গেটের মধ্যে গাড়ী এসে ঢুকলো। সামনের বাঁধানো উঠোনের কোণ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে

দোতলার দিকে। গাড়ী থেকে নেমে নন্দকে অনুসরণ ক'রে শান্তনু সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে চললো। নীচের ফ্ল্যাটে থাকে এক ধনী পাঞ্জাবী পরিবার। একটি পায়জামা পরা মহিলা তাদের দেখে আবার ভিতরে গেল।

দোতলায় উঠে সামনেই খোলা বারান্দা দক্ষিণমুখী। রাক্তম রোদের আভা এসে পড়েছে সেখানে। আশে পাশে অন্যান্য বাগানবাড়ীর গাছের জটলা, তাদেরই ভিতরে ভিতরে প্রভাতী পাখীর কাকলী তখনও চলছে।

নন্দর সাড়া পেয়ে দ্রুতপদে ঈশানী বেরিয়ে এলো। শান্তনু সহাস্যবদন। ঈশানী বললে, কি ভাগ্যি, আমার মাথায় বুদ্ধি ঢুকলো। কোনো কিছুতেই যার লোভ নেই, তাকে চায়ের লোভ দেখানো ছাড়া আর কি উপায় ছিল?

নন্দ কোন্ মুহূর্তে যেন গা ঢাকা দিয়েছে। শান্তনু বললে, কলকাতা কিন্তু আমার নিজের রাজত্ব, এখানে মন্ত্রিত্ব পেলে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারতুম। সুতরাং ভয়ে-ভয়ে কথা বলতে আমি বাধ্য থাকবো না, তা আগেই ব'লে রাখছি।

ঈশানী সহাস্যমুখে বললে, পরোয়া করিনে, আমিও তা'র জন্যে প্রস্তুত। দশ বছর আগে যে মেয়ে সর্বহারা হয়ে এই শহরের পথে পথে ঘুরেছে, চোখের জল ছাড়া যার আর কোনো সম্বল ছিল না,—সেও আর কোনো কিছুতে ভয় পায় না, আমিও ব'লে রাখলুম।

শান্তনু থমকে গেল। বললে, কথাটা শুনতে মন্দ লাগলো না। শুনলে সজাগ হয়ে উঠবে অনেকে। শুনি গল্পটা কিরূপ?

হাসিমুখে ঈশানী বললে, মেয়েমানুষের আত্মকাহিনীর ওপর অত লোভ কেন? এসো, ঘরে বসি।

তিন চারটি ঘর ছাড়িয়ে একটি ঘরে এসে দু'জনে ঢুকলো। পরিপাটি আসবাবপত্রের এমন অজস্র বিলাস সহসা চোখে পড়ে না। নিজের পায়ের ছেঁড়া চটি এবং জীর্ণ সজ্জাটা এবার শান্তনুর খারাপ লাগছে। সুতরাং একটু আড়ষ্ট হয়ে একটি গদি আঁটা চেয়ারে সে বসলো। তারপর হাসিমুখে বললে, এত তাড়াতাড়ি আত্মীয়-সম্ভাষণ শুনে একটু অবাক হচ্ছি কিন্তু।

ঈশানী বললে, তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা, রেখে-ঢেকে কথা বলতে চাও না।

এই সব কারণেই দাদা আর বৌদিকে চটিয়ে রেখেছ, এখন বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার ওপর ওরা খড়্গহস্ত কেন, বলো ত ?

শান্তনু বললে, এত তাড়াতাড়ি শুনতে চাইলে বলতে পারবো না। ওটা বিষয়-সম্পত্তি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপার। রসকস বড় কম।

শান্তনুর আড়ষ্টতা কমেনি। ঈশানী সে কথা বুঝলো। কাছাকাছি ব'সে বললে, আত্মীয় সম্ভাষণ করেছি কেন জানো ? তুমি আমার সমবয়সী। আরেক কথা, প্রথম পরিচয়ে তুমি মিনমিনে কথায় আমাকে খুশী করতে চাওনি। আমাকে তাচ্ছিল্য করেছ তুমি প্রথম থেকে নিজের অহঙ্কারে। সত্যি বলবো, তোমাকে ভালো লেগেছে।

শান্তনু বললে, বুঝলুম। তবে এর থেকেই ত' অনেকে জাল বোনে!

ঈশানী সহাস্য বাঁকা চোখে তাকালো। মানে ?

শান্তনু এক ঝলক হাসলো। পুনরায় বললে, সেই পুরনো গল্প। ছেলেরা বোনে স্বপ্নজাল, আর মেয়েরা মায়াজাল!

ঈশানী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী নিষ্ঠুর তুমি! মিহিজামে শেষের কটা দিন তুমি থাকলে কত আনন্দ পেতুম, আর তুমি কিনা না ব'লে পালিয়ে এলে? মেয়েদের ওপর কি একটুও দয়ামায়া নেই ? যে দুর্ভাগ্যবতী তোমার গলায় মালা দেবে, তা'র দুঃখে এখনই আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

শান্তনু বললে, বিয়ে করবো কি না, আগে সেই মতলবটা স্থির হোক।

থাক্‌, ওকথা অমন সবাই বলে। তারপরে হঠাৎ একদিন, 'বদলে গেল মতটা!' কেন বিয়ে করবে না শুনি ?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, নিজেই খেতে জানি, কিন্তু অন্যকে খাওয়াতে জানিনে।

ঈশানী বললে, সে যদি উপার্জন ক'রে নিজের ভাত নিজেই খায়, তাহ'লেও বিয়ে করবে না ?

সুষমার কথাটা শান্তনুর মনে ঝলসে উঠলো। সে কিছুক্ষণ আনমনাভাবে

তাকিয়ে রইলো একদিকে। বাস্তবিক, এর পরে হঠাৎ আর কোনো যুক্তি এনে ফেলা যায় না।

রামতীরথ চা এবং অন্যান্য খাদ্য এনে হাজির করলো। তারপর শান্তনুর উদ্দেশে হাসিমুখে নমস্কার ঠুকলো। শান্তনু ওদের সকলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঈশানী বললে, দাঁড়াও, আমি এসে তোমাকে চা ঢেলে দেবো। ইতিমধ্যে লোভে প'ড়ে যেন হাত বাড়িয়ো না।

ঈশানী তাড়াতাড়ি উঠে গেল এবং পাঁচ-সাত মিনিট পরে সে যখন ফিরে এলো, তখন তা'র ভিন্ন সজ্জা। মুখখানা পরিচ্ছন্ন, মাথা আঁচড়ানো। চেহারায় অতি শান্ত সুরুচির আভা। ক্ষিপ্রহস্তে সে নীচু টেবিলের ওপর নানাবিধ আমিষ নিরামিষ খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে নিল। তারপর বললে, যদি অনুমতি করো তাহ'লে আমিও ব'সে যেতে পারি তোমার সঙ্গে।

দু'জনেই হেসে উঠে খেতে ব'সে গেল। এক সময় ঈশানী বললে, কই, আমার তখনকার কথার জবাব দিলে না ত ?

শান্তনু বললে, মেয়ে যদি উপার্জনশীল হয়, তবে তার রুচি-অভিরুচির কথা ওঠে। আমার ধারণা, অযোগ্যের গলায় সে মালা দেবে না। আর উভয়েই যদি উপার্জন করে তবে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ওঠে। আমি বলি, এ সব কথা এখন থাক্। উৎকৃষ্ট ভোজ্যবস্তু বিবাহ অপেক্ষাও লোভনীয়।

ঈশানী অতি যত্নে শান্তনুর সামনে খাবার গুছিয়ে দিল। তারপর বললে, তুমি ভারি চালাক, মনের কথা ধরা দিতে চাও না। পছন্দসই মেয়ে যদি পেতুম, তোমাকে জব্দ করতে দেরি হ'তো না।

শান্তনু বললে, ব্যাপারটা কিন্তু সঠিক আমার বোধগম্য হচ্ছে না। নতুন পরিচয়ের পর কোনো একটি মেয়ে যদি আমার বিয়ের ঘটকালি নিয়ে মাতে তাহ'লে ঠিক কারণটা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এবার যেন সবটাই রহস্যময় মনে হচ্ছে।

দু'জনে আহারাদি সেরে চা নিয়ে বসলো। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে।

ঈশানী বললে, কোন রহস্য নেই, অতি সহজ কথা। তুমি বিশ্বাস করো, কা'রো ঘর যদি গুছিয়ে দিতে পারি, সেই আমার আনন্দ।

শান্তনু বললে, এখানে অন্য লোক থাকলে এই কথা জিজ্ঞেস করতো, অন্যের ঘর গুছিয়ে দিতে যার এত আনন্দ, নিজের ঘরটা সে কি মনের মতন ক'রে গোছাতে পেরেছে ?

অন্য লোক কেউ থাকলে সে জবাব দিতুম।—মনে হোলো ঈশানীর একটি ছোট্ট নিশ্বাস পড়লো।

চায়ে চুমুক দিল শান্তনু। তারপর বললে, একটা কথা জানার বড় লোভ হচ্ছে।

ঈশানী মুখ তুললো। শান্তনু প্রশ্ন করলো, এতগুলো সাজানো-গোছানো ঘর দেখছি, আর কা'রা থাকে এখানে ?

আমি ছাড়া আর কে থাকবে ?

একা ?

ঈশানী বললে, একা কি মানুষ থাকতে পারে এত বড় ফ্ল্যাটে ? চাকর, ঠাকুর, ড্রাইভার, রাতদিনের ঝি—এরা যাবে কোথায় ?

কিন্তু শান্তনু একটু থতিয়ে গেল।

ঈশানী ধমক দিল, অমনি অদম্য কৌতূহল, কেমন ? এর পর যে কথাটা ওঠে, সেটা মুখে আটকে আছে কেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ ক'রে থাকার পাত্র শান্তনু নয়। সে হাসিমুখে বললে, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে অর্ধেক রাজত্ব, আর রাজকন্যে। ব্যাপারটা কি ? লোকজন থাকলে একটু ভরসা পেতুম, এখন যেন বিপদ-আপদের গন্ধ পাচ্ছি।

বিপদ-আপদ। ঈশানী হেসে ফেললো।—কিসের বিপদ ? এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ যে ?

শান্তনু এবার একটু দম নিল। বললে, মিহিজামে থাকতে আমার ধারণা হয়েছিল, নানা সমাজে তোমার একটু নাম- ডাক আছে। সেই জন্যেই ত' ভয়। নামকরা মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করলে অনেক ঝঞ্চাট !

নাম আমার আছে কিনা জানিনে, তবে ঝঞ্ঝাট কিসের ?

যে ব্যক্তি আনাগোনা করে তা'র সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে রটনা রটে এবং অনেক অযথা অপবাদ ঘাড়ে চাপে।

ঈশানীর মুখখানা এবার গম্ভীর হয়ে এলো। বললে, একথার পর আর তামাসা চলে না। একটা কথা বলি আমার নিজের কোনো অপবাদ নেই। এখানে আমি থাকি একা। এক-আধজন যদি কেউ কখনো আসে, তা'রা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সমাজের লোক। একটা কথা মনে রেখো শান্তনু, অপবাদ যারা রটনা করে তারা দুর্বল, আর অপবাদের ভারে যারা নুইয়ে পড়ে তারাও মেরুদণ্ডহীন। নাও, আরেকটু চা খাও।

শান্তনুর সামনে চা ঢেলে দিয়ে একটু শান্তভাবে ঈশানী পুনরায় বললে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকা ক'রে নিচ্ছি, এজন্যই তোমার মনে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, সে আমি বুঝি। মিহিজামেও তোমার এই সন্দেহ দেখেছি, এখানেও তুমি আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিচার করে নিচ্ছ। কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না।

শান্তনু চুপ ক'রে রইলো। আন্তরিকতায় ঈশানীর কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে উঠেছে। আজকের সকালটা আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। সমস্ত নৈরাশ্যকর জীবনের মধ্যে দু'একটি মুহূর্তও যদি দিব্যদীপ্তিতে জ্ব'লে ওঠে তবে সেইটিই ত' জীবনের পরম মূল্য। মিহিজামের সেই স্বল্পকালটুকুকে মনে হয়েছিল রূপকথা, কিন্তু আজকের এই সকালের আনন্দলোক, এও যেন অনেকটা অবাস্তব।

মুখ তুলে শান্তনু একটু হাসলো। বললে, মিহিজামে তোমাকে এমন সব কথা ব'লে এসেছিলুম—অল্প পরিচয়ের মধ্যে যে সব কথা কোনো ভদ্র মেয়েকেই বলা চলে না। কিন্তু তুমি হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছিলে।

ঈশানী বললে, তোমার কথায় পরিহাস ছিল, ঘৃণা-বিদ্বেষ কিছু ছিল না—তাই সমস্তটাই ভালো লেগেছিল।

কিন্তু আজ কি জন্যে আবার ডাকিয়ে আনলে শুনি ?

উদ্দেশ্য একটা আছে বৈ কি—ঈশানী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, না, ভয় পেয়ো না,—কোনো দূরভিসন্ধি নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

শান্তনু বললে, আমি কিন্তু ব'লে রাখছি, মেয়েছেলের বিয়ের ঘটকালি আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

কাচের পাত্র যেমন সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, ঠিক তেমনিভাবে ঈশানীর গাম্ভীর্যটাও হেসে চুরমার হোলো। শান্তনু সেই হাসির মধ্যেই আবার যোগ ক'রে দিল, জীবনে অনেক রকম দুর্গতি আমার ওপর দিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ধনবতী এক মেয়েকে ঘাড়ে নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াবো,—এ দুর্ভোগের মধ্যে আমাকে এনো না, দোহাই তোমার।

হাসির পর হাসির তরঙ্গে ঈশানীর মুখ-চোখ রাঙ্গা। কী বিদীর্ণ সেই হাসির চেহারা। 'জাহ্নবী তা'র মুক্তধারায়, উন্মাদিনী দিশা হারায়'। সেই হাসির জের টেনেই ঈশানী বললে, যদি বলি বিয়ে নয়, তার চেয়ে আরো সাংঘাতিক ?

মানে ?—শান্তনু চোখ পাকালো,—প্রণয় কাহিনী ? না না, ও সব প্রণয় কাহিনীর দৌত্যগিরি আমার দ্বারা চলবে না।

মুখে তাড়াতাড়ি আঁচল চাপা দিয়ে ঈশানী হাসি চাপবার অনেক চেষ্টা করলো। তারপর বললে, এর বেশি আর কিছু বুঝি ভাবতে পারলে না ? তোমার কবিকল্পনার দৌড় বুঝি এই পর্যন্ত ?

শান্তনু নিরুপায় হয়ে পিছনে ঠেস দিয়ে বসলো। তারপর নৈরাশ্যের সঙ্গে বললে, তাহ'লে বুঝবো আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবার জন্যেই আজ এখানে ডেকে এনেছ !

ঈশানী বললে, নাচবার ছেলে তুমি নও, একথা জানি ব'লেই তোমাকে কাছে এনেছি। আমি নিজেই যেতুম তোমার ওখানে, কিন্তু পাছে তোমার পাড়ায় কানাকানি হয় এজন্যে নন্দকে পাঠিয়েছিলুম। শোনো, এবার তামাসা রাখো। তোমার দাদা-বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রে তোমার বাড়ীর আবহাওয়া আগাগোড়া বুঝতে আমার এক মিনিটও লাগেনি। ও-বাড়ীতে তুমি কোনোমতেই টিঁকতে পারবে না, এ ব'লে রাখলুম।

শান্তনু বললে, কিন্তু ওটা আমার পৈতৃক ভিটে, ওর টান অন্তরকমের। যত দুর্ভাগ্যই হোক, ওটা নিজের বাড়ী। যতই অপমান সহ্য করি, ওখানে আমার আত্মিক অধিকার।

ঈশানী বললে, পৈতৃক ভিটে ব'লেই ওই অন্ধকূপে উপবাস ক'রে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকবে? মনুষ্যত্বের অপচয়কে ভয় করো না?

শান্তনু বললে, ওটাকে তুমি ভাসিয়ে দিতে বলো কিসের ভরসায়?

ঈশানী বললে, ওটা নিজের থেকেই ভেসে যাবে শান্তনু, তুমি কোনোমতেই ধ'রে রাখতে পারবে না। তোমরা ভাই-বোনে যখন নাবালক, তখন তোমার বিধবা মাকে দিয়ে নানা প্রকার সই-সাবুদ ওরা ক'রে নিয়েছে। বারো বছরের ওপর টেক্স-খাজনা দিয়েছে, তোমার বোনকে পার করেছে, তোমার বিধবা মায়ের খরচ যুগিয়েছে।—এর পরেও তোমার সম্পত্তির ওপর আত্মিক অধিকার আছে বলতে চাও?

শান্তনু বললে, শুনেছি, একবার আমাদের অংশটা নাকি নিলামে উঠেছিল।

তবে ত' আরো ভালো। বেনামী ক'রে সেটা কিনেও রেখেছে। এখন লোকলজ্জার ভয়ে তোমাকে তাড়াচ্ছে না। কিন্তু তুমি হাত বাড়ালেই এবার তাড়া খাবে।

শান্তনু অবাক হয়ে ঈশানীর কথা শুনছিল। এবার বললে, তুমি এত জানলে কোত্থেকে?

আমি।—ঈশানী বললে, ষোল বছর তখন আমার বয়স। গ্রামের বাড়ীর থেকে একদিন তাড়া খেয়ে একেবারে একা চ'লে এসেছিলুম নেড়িকুকুরের মতন। মনে পড়ে সেদিন সন্ধ্যেবেলা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়েছিলুম। অনভিজ্ঞ, নির্বোধ দিশাহারা এক গাঁয়ের মেয়ে আমি, কোনো পথ সেদিন চিনতুম না।

শান্তনু সাগ্রহে বললে, তারপর? কি করলে?

থাক, শান্তনু—ঈশানী স্মিতমুখে বললে, ইংরেজি উপদেশটা মনে করো। কাঁদলে একা কাঁদো নিজের দুঃখে, কিন্তু তুমি যদি হাসো, পৃথিবীসুদ্ধ তোমার সঙ্গে

হাসবে। সে সব কথা মনে করলে সেদিনকার ওই অর্বাচীন মেয়েটার চোখে আজও জল আসে।

ঈশানী উঠে অন্য ঘরের দিকে চ'লে গেল।

অসীম কৌতূহল নিয়ে শান্তনু পিছন দিক থেকে তার দিকে তাকালো। সমস্তটা বিস্ময়,—আগাগোড়া। এমন উদ্বেলিত প্রাণবন্যা,—যেন অভিভূত করে সমগ্র সত্তাকে। এ লীলায়িত তনুলতার বর্ণনা করতে গেলে নিগূঢ় আসক্তি প্রকাশ পায়,—না থাক্, ও-ব্যাপারটায় শান্তনুর উৎসাহ কম। কিন্তু কোথায় যেন আছে শাণিত ইস্পাতের কাঠিন্য ওই দেহবল্লরীর অন্তরালে, সেটার আভাস পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

বেলা বেড়ে গেছে অনেক। এবার শান্তনুকে যেতে হয়। যেতে হবে অনেক দূর। বড়লোকরা যদি বা নিমন্ত্রণ করে, আসা-যাওয়ার দুর্ভোগটা তারা বিবেচনা করে না। এ বাড়ীতে নিয়মিত যদি শান্তনুকে আনাগোনা করতে হয়, তবে ত' সে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হবে। কোথায় পাবে যখন-তখন ধোপদস্ত জামা আর আস্ত ধুতি? রুমাল চাই একখানা ভদ্রগোছের। অবিলম্বে নতুন জুতো না কিনলে চলবে না। নিত্য দাড়ি কামাবার খরচ এবং সময়ের অপব্যয়। পকেটে নিয়মিত কিছু অর্থ। না, অসম্ভব। ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক মেলা-মেশা এই কারণেই অসম্ভব। পদে পদে পায়ে কাঁটা ফুটবে, পদে পদে আড়ষ্টতা এবং ব্যবহারিক আচরণের এক চুল এদিক-ওদিক হ'লেই ব্যাস,—হাসির পাত্র! অনুকম্পা! দারিদ্র্যের মধ্যে আর কিছু না হোক, স্বাচ্ছন্দ্যটা অবাধ। তার দায় কিছু নেই, নেই আড়ষ্টতা। ওজন করা হাসি, অঙ্ক কষা ভালোবাসা, হিসাব করা অভ্যর্থনা,—দরিদ্রের ঘরে এ সব কিছু নেই। দু হাত বাড়িয়ে তারা ডাকে, হৃদয়ের আসনে তারা বসায়, অন্তর উজাড় ক'রে তারা ভালোবাসে। বিদুরের অন্ন ভাগ ক'রে আনন্দের ভোজে তারা ডেকে নেয়।

শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। নিজের মনই তার দোলায়মান। সমস্ত হাসি এবং পরিহাসের প্রশ্রয়ের আড়ালে সে কি ঈশানীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছে না?

কিন্তু অনন্ত যৌবনা উর্বশীর পক্ষে একা এই ঐশ্বর্য সম্পদ নিয়ে নিভৃতে বাস করাটা কি সন্দেহজনক নয়? ও মেয়েটির বিগত অতীতের থেকে কি এক প্রকার নিগূঢ় রহস্যজনক গন্ধ সে পাচ্ছে না? কে, কি ও কেন। দুরভিসন্ধি নেই বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা? সত্য পরিচয় কি? জাতি গোত্র কেমন?

নন্দ এসে ঢুকলো। খাবারের উচ্ছিষ্ট সমেত পাত্রগুলি একে একে গুছিয়ে নিয়ে চ'লে যাবার আগে বললে, ছোটবাবু, দিদিমণি গেছেন রান্নাঘরে, এখুনি আসছেন। আপনাকে বসতে বললেন।

শান্তনু বললে, কিন্তু আমাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে, নন্দ। তোমার মহিলা-মনিব নিরাপদে এবার স্নানাহার করুন, আমি ততক্ষণে বিশ্বপথে বেরিয়ে পড়ি। তাঁকে ব'লো।

তাঁর সে হিসেব আছে।—পর্দাটা সরিয়ে দ্রুতপদে ঈশানী এসে ঢুকলো। শান্তনুকে আবার ফিরে দাঁড়াতে হোলো। নন্দ চ'লে গেল।

ঈশানী বললে, তোমার নিজের মনেই গণ্ডগোল। তুমি কি উমেদারি করতে এসেছিলে যে পদে পদে অস্বস্তি? এসো ভেতরে।

ভেতরে। কেন? কি করবো ভেতরে গিয়ে?

সে কি কথা, একটু বিশ্রাম করবে না? ভয় নেই, একা থাকো যতক্ষণ খুশি। আমি একটুও জ্বালাবো না।

শান্তনু বললে, কিছু মনে করো না, ব্যাপারটা এবার যেন একটু ঘোরালোই মনে হচ্ছে।

চোখ পাকিয়ে ঈশানী বললে, আমাকে অবলা ব'লে বার বার ভুল ক'রো না, শান্তনু। ভেতরে এসো।

আমি কিন্তু এর জন্যে একেবারেই তৈরী হয়ে আসিনি।

ঈশানীর অনুসরণ ক'রে শান্তনু পূর্বদিকের বারান্দা পেরিয়ে একটি ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর ঈশানী হাসিমুখে বললে, খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো, তারপর কাজের কথা হবে।

আবার কিসের খাওয়া?—শান্তনু জানতে চাইলো।

প্রাতরাশের পর মধ্যাহ্ন ভোজন।—এই ব'লে ঈশানী বেরিয়ে যাচ্ছিল। ব্যস্ত হয়ে শান্তনু ডাকলো, শোনো, শোনো,—

ঈশানী হাসিমুখে বললে, আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ ওই বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখো, আর ভুল সংশোধন করো। আর এক কথা, ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে মেয়েছেলেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ডাকতে নেই।

ঈশানী চ'লে গেল রান্নাঘরের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো শান্তনু। এর পরে আর কিছু বলবার নেই। এদিক ওদিক সে একবার তাকালো। সামনেই গৌতম বুদ্ধের সেই অস্থিচর্মসার কঙ্কালের একখানা বড় ছবি। আরেকখানা ছবি বিদেশী। দান্তে আর বিয়াত্রিচের প্রথম সাক্ষাৎকার। আয়নার পাশে সুসজ্জিত সেক্রেটারিয়েট টেবল—উপরে কয়েকখানি বাঙলা ও ইংরেজি বই গোছানো। টিপাইয়ের উপর একটি কাচের কুঁজো আর গেলাস। একপাশে পরিষ্কার বিছানা দুগ্ধফেননিভ। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত সুদূর গাছপালা দেখা যায়।

শান্তনু তার আড়ষ্ট পায়ে জোর আনলো। দু'পা এগিয়ে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক ক'রে পান করলো। এর চেয়ে সুষমার সান্নিধ্য নিরাপদ। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে বলা চলে? একজন বিনা বিবাহে সিঁদুর চড়াচ্ছে মাথায়, আরেকজন প্রকাশ্য দিবালোকে তাকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে অগাধ জলে তলিয়ে দেবার চেষ্টা পাচ্ছে। একজন তাকে কোনোমতেই ছাড়তে চায় না, অন্যজন কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। এরা কেবলমাত্র দুটি মেয়ে নয়, দুটি তরঙ্গ। দুটি তরঙ্গের আঘাতে আহত-প্রতিহত হয়ে কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে বলা কঠিন। কিন্তু এই পরিস্থিতি তার কাম্য ছিল না। এর কোনোটাই ভালোবাসা নয়। দুটোর একটাতেও কোনো রস-কল্পনা নেই। একদা রঙীন চোখ ছিল তার,—সেই চোখের দৃষ্টি শুচিশুদ্ধ। অর্বাচীন, অভিজ্ঞতা-বিহীন এবং অজ্ঞান তার মন। একদা অমরাবতীর বাতায়ন থেকে কোনো এক কালে কোনো এক মেয়ে তাকে ডাক দেবে, সেই আহ্বানে জ্যোৎস্না রাত্রে রাজহংসের মতো শুক্লপক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে যাবে সে দূর গগন প্রান্তে,—

মেয়েদের সম্বন্ধে এই ছিল তার কল্পনা। পুষ্পলতায়, চন্দ্রশোভায়, উদ্যান-বীথিকায় কচিৎ দর্শন মিলবে তার,—যাকে দেখলে তার বক্ষোরক্তে বীণাবাদিনীর সুরের মূর্ছনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। কোথা সেই কপোতের ক্লান্ত কণ্ঠ,—শূন্য মনের পরম বেদনা যেখানে উচ্ছ্বসিত? কোথা সেই মধুরভাষিণী বনবিহঙ্গী! কোথা বা সেই সুচিত্রবর্ণা পরিহাসিনী মধুপতঙ্গী।

কিন্তু এরা তা' নয়, এরা অত্যন্ত সুলভ। এদের জন্য তপশ্চর্যা নেই, এরা মায়াকাননের ইন্দ্রজালের অন্তরালে থাকে না,—এরা বড় সুস্পষ্ট, বড়ই প্রত্যক্ষ। রসকল্পনার অসীম আনন্দ-লোক থেকে এরা নেমে আসেনি,—এরা থাকে কালীঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। এরা আকারের বাঁধনে ধরা দিয়েছে ব'লেই শান্তনুর মন বার বার ধাক্কা খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহবাদী মনোভাব শান্তনুকে যেন অস্থির ক'রে তুললো। তার সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন শৃঙ্খলিত—এটি তাকে ভূতের মতো সহসা পেয়ে বসলো। আজই এর সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার, আজই এর নিষ্পত্তি হওয়া চাই; শান্তনু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সেই প্রকার মিষ্টহাস্য নিয়েই ঈশানী আবার ফিরে এলো। কিন্তু ঘরে শান্তনু নেই। এদিক-ওদিক তাকালো ঈশানী। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফিরে গেল অন্য ঘরে। ঘুরে এলো ড্রয়িং থেকে। না, শান্তনু কোথাও নেই। উপর দেখে নীচে গেল ঈশানী। বাঁধানো উঠোনোর ওপ্রান্তে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য ক'রে দেখলো গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে তেওয়ারী, যেমন সুবিধা পেলে প্রত্যেক ড্রাইভার ঘুমোয় গাড়ীর মধ্যে।

শান্তনু কোথাও নেই। ঈশানী আবার ফিরে উপরে উঠে এলো। নন্দ গিয়েছিল বাইরে। ফিরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, দিদিমণি, ছোটবাবুকে ত' দেখছিনে!

ঈশানী বললে, না, তিনি নেই।

ওদিকে রামতীরথের ঘরে রান্নাবান্না সব তৈরী, এবং নন্দই সব আয়োজন

করেছে। কিন্তু মুখ ফুটে নন্দ আর কোনো প্রশ্ন করলো না। ঈশানীর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগলো পাইকপাড়ার সেই গলিতে পৌঁছতে। পৈতৃক ভিটের রাজপথ এটি। গলির ওপ্রান্তে গরু-মহিষের খাটাল। এদিকের নালা-নর্দমা দিবারাত্র দুর্গন্ধে ভরা। মাছি ভন ভন করছে সর্বত্র। কলেরার মহামারী দেখা দিলে এখানে প্রথম রোগী মরে; টাইফয়েডের প্রথম বলি এখানে। পিছন দিকে চৌধুরী গোষ্ঠিদের সেই জরাজীর্ণ শিবমন্দির,—বৃষ্টির দিনে কেবল-মাত্র ছাগল ঢুকে শিবের কোলে আশ্রয় নেয়।

শান্তনুর পৈতৃক ভিটে। নেড়িকুকুরের দল আর রুগ্ন মূঢ় গৃহস্থ থাকে গায়ে গায়ে। জগৎজোড়া অভিযান চলেছে মানুষের, চলেছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, খ'সে পড়েছে ইংরেজের সাম্রাজ্য, নতুন মানব-বংশের জাগরণ-কল্লোল শোনা যায় দিকে দিকে, জরা-ব্যাধি বিকারের বিরুদ্ধে প্রাণবন্যার প্লাবন আঘাত করছে সকল জীর্ণ সংস্কারকে,—কিন্তু শান্তনুর প্রাচীন পৈতৃক ভিটের দরজায় সে-চেতনা আজও এসে পৌঁছয়নি। এখানে সকল কলহ-কলঙ্ক-মালিন্যের আশে পাশে পরম নিশ্চিন্ততা। সেই আদি ও অকৃত্রিম পুরাতন পৃথিবী এখানে নিরুদ্বেগ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তনু এসে বাড়ীতে ঢুকলো। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে টা টা করছে চারদিক। আর কিছু না হোক, অনাহত নিরুদ্বিগ্ন জীবন এখানে। প্রাণ-সমস্যার কোনো ভীড় এখানে নেই।

একটু অবাক হয়ে গেল শান্তনু। তার দরজায় দুটো মোটা তালা লাগানো। এ দুটো লোহার সিন্দুকের তালা, তার পৈতৃক আমলের। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, তার সেই নোংরা বিছানাটা একপাশের বারান্দায় পুঁটলী পাকানো প'ড়ে রয়েছে। পুরনো কয়েকখানা পাতা খসানো বই পথের ধারে বেশ গুছিয়ে রাখা। সুটকেশটা খোলা। ভিতরে দু-একটি জামা-কাপড় এবং তার ক্যামেরাটা। পুরনো তারিখের কয়েকখানা খবরের কাগজ ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া।

খান দুই বাঁধানো খাতা বইয়ের গোছার পাশে। ছবির প্যাকেটটা তার ওপর।

শান্তনু থমকে দাঁড়ালো। ব্যাপারটা সঠিক তার বোধগম্য হোলো না। সে ডাকলো, মিনু ?

বলা বাহুল্য, মিনু কাছাকাছিই ছিল। ডাকামাত্র সে সামনে এসে দাঁড়ালো।
—কি, ছোড়দা ?

এ-সব জিনিষপত্র এখানে কেন ? ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে ত' ব্যাপারটা ?

মিনু বললে, আমাদের চিঠি পেয়ে বড়দা ফিরে এসেছে মিহিজাম থেকে। তোমার ঘরটা মেরামত ক'রে এবার ভাড়া দেওয়া হবে।

শান্তনু বললে, আমি থাকবো কোন্ ঘরে ?

আর কোন ঘর ত' খালি নেই !

সহসা ফুটন্ত রক্তের উচ্ছ্বাসে শান্তনুর মাথাটা ন'ড়ে উঠলো। সে বললে, তাহ'লে এই দাঁড়ায়, আমার নিজের বাড়ী থেকে আমাকে বা'র ক'রে দেওয়া হচ্ছে, এই না ?

চারদিকে স্তব্ধ নীরবতা। নতমুখে মিনু দাঁড়িয়ে।

দাদা-বৌদিদি কোথায় ?

মুখ তুলে মিনু বললে, ওরা বোধ হয় খেতে বসেছে।

শান্তনু বললে, ওদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে আয়, আমার পৈতৃক অধিকার থেকে আমাকে সরানো হচ্ছে কেন ? এর ফলাফল কি তারা বোঝে না ?

সহসা ওপরের বারান্দা থেকে দাদা গলা বাড়িয়ে বললেন, ফলাফল হাইকোর্ট থেকে জানবার চেষ্টা করতে পারো,—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে ফলাফল নাই শুনলে ?

বাড়ী তোমার একার নয় !

এর জবাবও সেখানে পাবে !

শান্তনু কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মিনু তাড়াতাড়ি বললে, তোমার পায়ে পড়ি ছোড়দা, তুমি চুপ করো। দাদা সত্যিই বলেছে, এ-বাড়ীতে তোমার অংশ

দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। নাম খারিজ করার জন্যে তুমিই ত' বছর কয়েক আগে নিজের হাতে সই ক'রে দিয়েছিলে, মনে নেই ?

মিনুর কথায় হঠাৎ শান্তনু জুড়িয়া গেল। বললে, ও, তা হবে, মনে নেই। তখন নাবালক ছিলুম, অনেকগুলো সই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিল !

নাবালক কেন হবে ? সাবালকের প্রমাণ আছে কাগজ-পত্রে ! দলিলের বয়েস অন্য রকম হয়, তুমি কিচ্ছু জানো না !

মিনুর কথায় অন্ততঃ বিবাদটা থেমে গেল। নিশ্বাস ফেলে শান্তনু বললে, বেশ, তাহ'লে চ'লেই যাচ্ছি, বলবার কিছু নেই।—বলতে বলতে স্যুটকেশ থেকে তার প্রিয় ক্যামেরাটা কেবলমাত্র সে তুলে নিল।

মিনু বললে, শুদ্দুরের মেয়ে বিয়ে করেছ তুমি, সেই জন্যেই এই কাণ্ড, তা জানো ছোড়দা ? দাদা আরো আগুন হয়ে উঠেছে এই জন্যে যে, তুমি এ-বাড়ীতে থাকলে কোনো ছেলেমেয়ের আর বিয়ে হবে না। সমাজে একঘরে হ'তে হবে। একেই ত' পাড়াময় ঢি ঢি তোমার জন্যে !

কোনো কথা আর শান্তনুর মুখে এলো না। বোধ করি এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রের ছায়ার নীচে অন্ধকার ভগ্ন ভিটার আশপাশে তার প্রেতচ্ছায়াময় জনক-জননী তাকে শেষ বিদায় দেবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেইজন্য বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল তার দুটো চোখ। কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলো। একবার এদিক ওদিক তাকালো। দাদা-বৌদিদি যখন ফিরেছে, তখন কোথাও না কোথাও ছোট ছেলেটা খেলা করছে। শান্তনুর ক্ষুধার্ত দুটো চোখ চঞ্চলভাবে ছেলেটাকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু সে কোথাও নেই। অবশেষে নিশ্বাসটা চেপে রেখেই এক সময় ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে শান্তনু বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছিলেন বৌদিদি। মুখ বাড়িয়ে তিনি বললেন, দুপুরবেলা এক মুঠো মুখে দিয়ে গেলেই ত' পারতে !

ততক্ষণে শান্তনু গলির ওপ্রান্তে চ'লে গেছে।

সন্দেহ নেই, তার জীবনের গতিতে মরচে ধরেছিল। আজ মাত্র আধ

ঘণ্টার মধ্যে ভাগ্যের চাকাটা চক্ষের পলকে ঘুরে গেল। কিছু ভাববার আগে, কিছু তলিয়ে বোঝবার আগে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে এসে পড়লো এমন এক জীবনে, যেখানে আশ্রয় ব'লে আর কোথাও কিছু রইলো না। এমন একটা নিষ্ঠুর মুক্তি যেটা সম্পূর্ণ অবারিত, যেটার চারদিকে ছায়া এবং আশ্রয়ের লেশমাত্র নেই।

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে হাঁটতে লাগলো সোজা পথে। ফটোগ্রাফ বিক্রির দরুণ তার পকেটে কিছু টাকা ছিল। কিন্তু তার পরিমাণ এমন নয় যে, ওটা নিয়েই সে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে। একটা কথা মনে পড়ছে, ঈশানীর ধারণাটা কতখানি সত্য। মেয়েমানুষ যেটা সহজ অনুভূতির থেকে বোঝে, পুরুষ সেটি যুক্তির দ্বারা অনুধাবন করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে। ঈশানী জানতো, দাদা আর বৌদিদির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা শান্তনুকে পথে বসাতে উদ্যত। কিন্তু সেটা যে এত শীঘ্র এমন দানবীয়ভাবে ঘটবে, এ হয়ত ঈশানীও কল্পনা করেনি।

ভালো কথা, ও-গল্পটা ঈশানীর কাছে এখনও শোনা হয়নি। ষোল বছর বয়সে একা মেয়ে গ্রাম থেকে বিদায় নিয়েছিল রিক্তহস্তে কোনো এক সন্ধ্যায়। ওই বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরিত চঞ্চল কটাক্ষের অন্তরালে সেদিন ছিল সকরুণ অশ্রুসজলতা! এই পর্যন্ত তার গল্প, তারপরে তার সমস্ত আত্মকাহিনী অন্ধকারে ঢাকা। প্রবলের স্পর্ধিত অন্যায় তাকেও কি শান্তনুর মতো আপন ভিটা থেকে একদা বহিষ্কৃত করেছিল ?

শান্তনু আপনার অজ্ঞাতেই ঈশানীর বাড়ীর দিকে অভিযান করেছিল। কিন্তু এবার গিয়ে কী বলবে তাকে ? সম্পদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপন নিরুপায় দশার বর্ণনা করবে ? সে যে ভয়ানক চিত্তের দৈন্য! এর নামই ত' মুষ্টিভিক্ষা!

শান্তনু তৎক্ষণাৎ অন্য পথে ঘুরলো। কালীঘাটের দিকে সে চললো। সুষমাকে ব'লে আসা দরকার তার বর্তমান অবস্থার কথা। কোনো এক ঘাটে তার নোঙর এতকাল বাঁধা ছিল, কিন্তু সেই নোঙর ছিঁড়ে গেল আজ, তরী অকূলে ভাসলো। আশা করবার কিছু নেই, আশ্বাস কিছু রইল না।

বাস থেকে নেমে সে চললো সুষমাদের বাড়ীর দিকে। কিন্তু কেন যাচ্ছে সে? প্রাণের টান ত' কিছু নেই! সুষমা তাকে স্বামী ব'লে জানতে চায়, নিরুপায় মেয়ের পক্ষে একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা! এর মধ্যে ত' ভালোবাসার কথা কোথাও নেই! প্রেম নয়, অনুরাগ নয়,—শুধু স্বামী-স্ত্রী হওয়া। দরিদ্রঘরের অন্ধকার মেঝের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে একটি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়ে,—সে কেবল চায় জীবিকানির্বাহের একটি অবলম্বন। একটি স্বামী! স্বামী হ'লেই খুশী। তার ওপর ছেড়ে দাও আপন ভাগ্যের দুর্বহ বোঝা, দুঃসহ দায়িত্ব! তারপর নিজে থাকো নিশ্চিন্ত হয়ে,—মরুক একটা পুরুষ! মেয়েমানুষের স্থূল একটা মাংসপিণ্ডের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিরপরাধ একটা পুরুষ আমরণ দাসত্বের দস্তখৎ করুক, কিন্তু স্ত্রী হ'তে পারলে আমি নিশ্চিন্ত! আমার অন্নবস্ত্র বাঁধা, আশ্রয় কোথাও না কোথাও, আর কোনো ভাবনা নেই। খুশী রাখো স্বামীকে, যখন তখন 'পতি পরম গুরু' ব'লে সম্ভাষণ করো, নির্বোধ পুরুষ তাতেই খুশী। সন্তান ধারণের অসীম অধ্যবসায়সহ স্বামীর পায়ে হাত বুলিয়ে দাও,—ব্যস, চিরকালের অন্নবস্ত্র নিশ্চিত। ঘাম ঝরুক পুরুষের কপাল বেয়ে, ক্ষত-বিক্ষত পায়ে রক্ত পড়ুক, দিনযাপনের গ্লানি তার আকণ্ঠ হোক, জীবিকা সংস্থানের পথে পদে পদে পুরুষের মাথা নত হোক, আমি শুধু রইলুম তার আরামশয্যার সঙ্গিনী!

ধিক্কার দিল শান্তনু। তারপর গলির মুখ থেকে সে ফিরে গেল অন্যত্র। ঘৃণার চেহারা ফুটে রইলো তার মুখের চেহারায়, সমস্ত জন-কোলাহলের মাঝখানে সে দেখতে পেলো ওই ধিক্কার। নিত্য ছুটছে পুরুষ ওই নোংরা বাসনার দিকে। চারদিকের এই বৃহৎ কর্মজীবনের মূল তাৎপর্য ওই। লালাসিক্ত লোভ নিয়ে ব'সে আছে মেয়ে, সেই লোভের কদর্য উপকরণ যোগাচ্ছে পুরুষ! এর নাম নরনারীর মিলিত জীবন। এই খেলা নগরের, এই খেলা সভ্যতার!

এর চেয়ে মৃত্যু হোক, এর থেকে মুক্তি হোক। শান্তনু হন হন ক'রে চললো। এই চক্রান্ত থেকে সে পালিয়ে যাক, সেই ভালো। কোনো অজানা দেশের অচেনা জগতে, বিজন সমুদ্রতীরে, নিভৃত অরণ্যলোকে, পর্বতপ্রান্তের

কোনো পাখীডাকা উপত্যকায়, যেখানে আকাশ পেতে রেখেছে তার জন্য অনন্তশয্যা। সেখানে গিয়ে কোনো নামহারা পরিচয়হারা সন্ন্যাসীর আশ্রম-উপান্তবর্তী নদীকূলে আপন মনে আনন্দের দিনগুলি কাটানো। সভ্য জগৎ থাকুক পিছনে, সে চলুক এগিয়ে।

—আরে, ও মশাই, শুনছেন? কেমন আছেন? এই যে, এই দিকে—সেই যে সেই মিহিজামে আলাপ, মনে আছে ত?

রমেনবাবু একেবারে কাছে এসে গায়ে গ'লে প'ড়ে শান্তনুর একখানা হাত ধ'রে ফেললেন।

শান্তনু হাসিমুখে তাকালো।—ভালো আছেন?

ভালো থাকতেই হবে!—রমেনবাবু বললেন, নিজের শরীরের ওপর নিজের দখল আছে, একথা ভুল। ঈশ্বর একটা দম দিয়ে রেখেছেন, তাই দেহের ঘড়িটা চলছে। আপনার ইচ্ছে অনিচ্ছে যাই থাক, যন্ত্রটা নিজের নিয়মে চলবে! তারপর কোথা চললেন? ক্যামেরাটাও সঙ্গে আছে দেখছি! আপনার বাড়ী ত' সেই পাইকপাড়ার ওদিকে! তা চলুন, আমাদের ওখানে একটু চা খেয়ে যান?

শান্তনু বললে, ভারি খুশী হলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হোলো! কিন্তু আমাকে বিশেষ একটা কাজে যেতে হচ্ছে! বেশ ত', অন্য একদিন গিয়ে আপনাদের ওখানে খুব গল্প ক'রে আসবো।

রমেনবাবু হো হো ক'রে হেসে বললেন, ওই দেখুন, সেদিনও যা আজও তাই। আড়ষ্টতা আর আপনার কাটলো না। ভারি লজুক আপনি, ঈশানী ঠিকই বলতো। কিন্তু আপনার সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে অথচ আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাইনি, একথা শুনলে সে-মেয়ে রেগে আগুন হবে। সুতরাং আর কোনো কথা চলবে না মিষ্টার চৌধুরী, না গিয়ে আপনার উপায় নেই।

একটি সম্পূর্ণ বাহুর দ্বারা শান্তনুকে আলিঙ্গন ক'রে রমেনবাবু তাকে একদিকে টেনে নিয়ে চললেন।

ভাগ্যের ক্রীড়নক শান্তনু। চলতি স্রোতে ভাসমান সে। সেই স্রোতের

ধাক্কায় তার ইচ্ছার কোনো জোর থাকে না। সে হোলো নিয়তির খেয়ালের খেলা। কখনও ঢেউয়ের আঘাত, কখনও বা আবর্তের ঘূর্ণীপাকে পাক খাওয়া। সুতরাং রমেনবাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সে বাধ্য হোলো।

বড় রাস্তাটা তারা পার হোলো। বিপরীত ফুটপাতে গিয়ে উঠে কিছুদূর তারা চললো, তারপর ঢুকলো আরেকটা রাস্তায়। রমেনবাবু বললেন, এই যে, এই আমাদের 'গীতালী সঙ্ঘ'। এ দিকটা একটু নিরিবিলি, রাস্তাঘাটের গোলমাল কম। আসুন—

বয়স্ক লোক রমেনবাবু, তাঁর পীড়াপীড়ি কথায় কথায় প্রত্যাখ্যান করা চলে না। গেট্ পেরিয়ে শান্তনু তাঁকে অনুসরণ করলো। এপাশে ওপাশে অজস্র ফুলের গাছ বসানো। সামনেই বাড়ীর দক্ষিণমুখী পর্চ, তার নীচে দু'একজন চাকর ও দারোয়ান ব'সে আছে। রমেনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু দোতলায় উঠে গেল। ছেলেমেয়েরা অনেকেই এসেছে, কোনো কোনো ঘর থেকে গান-বাজনা শোনা যাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠলো শান্তনু,—মাত্র এক পেয়ালা চায়ের জন্য, তার বেশী এখানে তার পরমায়ু নেই। মুস্কিল এই, ঈশানী যদি টের পায়। আজ প্রভাতকাল থেকে সুরু হয়েছে একটা বিচিত্র নাটকীয় আলোড়ন, এখন সন্ধ্যার আলো জ্বললো। আজ সমস্ত দিন ধ'রে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, কিন্তু তবু দুরন্ত বন্যার সর্বনাশা তাড়না থেকে সে সারাদিন ধ'রে আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলেছে। ছেঁড়া চটি আর দরিদ্র সজ্জা নিয়ে সে তা'র পুরুষ-পরম্পরাগত স্বাধিকার বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে ত্যাগ ক'রে এসেছে। এখানে এই বাড়ীর এত বড় একটা সমাজে কেউ নেই তার জুড়ি। ঈশ্বরদত্ত অধিকার ছেড়ে এসেছে সে শান্তির জন্য। গর্বোদ্ধত অন্যায়ের পদতলে ন্যায় ও নীতির অপমৃত্যু ঘটেছে বটে, কিন্তু শান্তনুর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য আর পৌরুষ অন্তত আর কিছু না পারুক, ওই জরাজীর্ণ বাড়ীর সর্বত্র রক্তের ধারা ঝরিয়ে আসতে পারতো। একটির পর একটি হত্যা ক'রে সে ওই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতো বৃহৎ রাজপথে। তার বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্রের বাসা, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্র নেই তার। সে মানুষ ক'রে তুলতো ওই শিশুকে শাণিত তরবারির

মতো ক'রে। বড় হ'লে রণতুরঙ্গের পিঠে বসিয়ে দিত সেই পুরুষকে। ঝলসে উঠতো তার কঠিন দক্ষিণ হস্তে তরবারি। যেখানে যত অনড় জীবন, যেখানে যত মূঢ়তা আর কূটবুদ্ধি, যেখানে যত আলস্য আর কুসংস্কার,—চিত্তের মালিন্য, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা, নিষ্ক্রিয়তার ষড়যন্ত্র,—ওই নির্দয় তরবারি হোতো তাদের শেষ প্রতিকার।

তারপর উঠে দাঁড়াতো নবীন জীবন, নতুন প্রভাতকাল। এই হোলো তার কবিকল্পনা, এই সত্যের মধ্যেই তার বাসা। সভ্যতার সকল কীর্তি মুছে যায়, সমস্ত আলো একে একে নিভে যায়,—কিন্তু যুগে যুগে মানুষ রেখে যায় কবিকল্পনা, যার ভিন্ন নাম হোলো আইডিয়া। সেও রেখে যাক্ তার এই কল্পনা, তার এই সত্যোপলব্ধি।

একটা বড় হল্-এ এসে রমেনবাবু দাঁড়ালেন। সেখানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দুজন বর্ষীয়সী মহিলাও রয়েছেন। রমেনবাবু সকলের সঙ্গে শান্তনুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটা নতুন সমাজ শান্তনুর কাছে।

যেমন-তেমন সাজসজ্জা তার, কিন্তু তার প্রদীপ্ত সুশ্রী চেহারাটার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাকে দেখে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাওয়া যায় না। মেয়েদের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, পুরুষের বন্য কৌমার্য ওরা সহজেই আবিষ্কার করে। ওরা দেখতে পায় সম্ভাবনা, দেখে নেয় কৃতিত্বের ছায়া। ওদের মন হোলো গ্রহণেচ্ছু, মস্তিষ্ক হোলো হিসাবী।

একটি মেয়ে হাসিমুখে বললে, ক্যামেরাটা বুঝি আপনি কাছছাড়া করেন না?

মেয়েটির নাম হেনা, মিহিজামে শান্তনু ওকে দেখেছে। শান্তনু বললে, ওটা আমার ব্যবসা। চায়ের আমন্ত্রণে এসেছি, ব্যবসাটা ভুলিনি। ছবি তুলে বেড়াই যেখানে সেখানে।

বর্ষীয়সী একটি মহিলা প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়া আর কোনো কাজ করেন না?

দরকার হয় না।

ওর পরিচ্ছদ সজ্জার প্রতি সবাই তাকালো। একটি তরুণ যুবক টেবলের

তলা দিয়ে আরেকটি যুবকের পায়ে চিমটি দিল। ভাবটা এই, দেখেছ অহঙ্কারের চেহারা। অন্য ছেলেটি চিমটি দিয়েই জবাব দিল, ভয় পাসনে, শূন্যপাত্রের আওয়াজ বেশী!

রমেনবাবু বেরিয়ে গেছেন। অন্য হল্-এ গানের মহড়া চলছে।

এক সময় চা এলো, চায়ের সঙ্গে কেক্-বিস্কুট। হেনা উঠে এসে সযত্নে চায়ের পেয়ালা এবং খাদ্য-সামগ্রী সকলের মধ্যে ভাগ করে' দিল। হেনা বোধ হয় নিজের ফটোখানা বিনামূল্যে আগেই তোলাতে চায়, তাই অতিথি আপ্যায়নে এত আগ্রহ।

দ্বিতীয় মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনার গান আসে?

শান্তনু চায়ে চুমুক দিল। বললে, আজ্ঞে না, গলার আওয়াজটা এতই কর্কশ যে, কোনোদিন বাগ মানাতে পারিনি।

এবার সকলে নিছক আনন্দে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বললে, মোটেই না, একথা আপনার একেবারেই মিথ্যে!—বাজনাও আসে না?

বাজনার মধ্যে বাঁশীটা একটু চেষ্টা করেছিলুম।

বাঁশী!—লাফিয়ে উঠলো একটি চঞ্চল মেয়ে।—বাঁশীর লোক আমাদের নেই। আপনি আমাদের বাঁশী শোনান একদিন। কেমন?

একটি যুবক আর থাকতে পারলো না। সে ব'লে উঠলো, ঈশানীদির সঙ্গে আলোচনা না ক'রে তুমি ওঁকে কেন অনুরোধ করছো তপতী?

তপতীর হয়ে আরেকটি মেয়ে জবাব দিল, ঈশানীদি কখনো কারোকে কোনো অনুরোধ করেন না, এ কি ভুলে গেছ?

চুপ ক'রে গেল সবাই।

বর্ষীয়সী প্রথম মহিলা বললেন, তাঁকে এ সবের মধ্যে না জড়ানোই ভালো। তা ছাড়া এখানে তিনি ত' বিশেষ আসা-যাওয়া করেন না, আমাদের সঙ্গে দেখাও হয় না।

একটি যুবক বললে, তা যা বলেছেন। তাঁর পক্ষে অজ্ঞাতবাসে থাকাই ভালো। কোথাও তিনি এসেছেন এ খবর জানাজানি হ'লে পাড়ায় পাড়ায় হৈ চৈ প'ড়ে যায়।

এবার শান্তনুকে একটু হাসতে হোলো,—কেন বলুন ত ?

প্রশ্নটা শুনে সবাই বিস্ময়াহত। সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সবাই তাকালো শান্তনুর প্রতি। লোকটা কি কলকাতায় বাস করে না ? ঈশানীর দেশজোড়া পরিচয় কি শোনেনি ? এত বড় একজন শিল্পীর সম্বন্ধে কি লোকটা কোনো খবরই রাখে না ?

বাইরে রমেনবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল এবং সেই পলকেই যিনি ভিতরে এসে সহাস্যে দাঁড়ালেন, তাঁকে দেখে সকলেই—বর্ষীয়সী মহিলা দুজন সমেত—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওদের সঙ্গে শান্তনুও মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ঈশানী।

ঈশানী হাত তুলে শান্তনুকে নমস্কার জানালো, কতক্ষণ এসেছেন মিষ্টার চৌধুরী ?

এই একটু আগে।—শান্তনু শান্তকণ্ঠে জবাব দিল।

রমেনবাবু ফোনে আপনার কথা বললেন। এঁরা সকলে নিশ্চয় খুশী হয়েছেন আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ?

নিশ্চয়ই।—সকলে একবাক্যে জানালো।

ব্যস, ওই পর্যন্ত।—ঈশানী সংযতবাক, এটা নতুন বটে। সমস্ত সকালের ইতিহাসটা সম্বন্ধে উভয়েই উদাসীন। ঈশানী আর সে মেয়ে নেই। একেবারে ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা, উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র বাহুল্য কেউ লক্ষ্য করলো না। শান্তনুর সঙ্গে তার পরিচয় ওইটুকু, ওরা সবাই জানলো। কিন্তু তবু ওরা বিস্ময়বিমূঢ়। ওইটুকু আলাপের জন্য শত শত লোক নিত্য লালায়িত, কিন্তু এই লোকটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। ঈশানীর খ্যাতির প্রতি তার গ্রাহ্যও নেই, এবং সেই দুর্লভ খ্যাতির কোনো খবরও রাখে না। হয় লোকটা অতিমানব, আর নয়ত মূঢ়। মূঢ়ই হবে, কেন না ওর চোখ-মুখ একেবারেই নির্বিকার। ওর চেতনায় কোনো কিছু রেখাপাত করে না।

ঈশানী গিয়ে বসলো একটি টেবলে। আজ বেশ গরম পড়েছে। চুলের গোড়ায়-গোড়ায় মুক্তাবিন্দুর মতো ঘাম জমেছে। ঘরের হাওয়াটা গেল বদলে।

অন্ধকার ছিল এতক্ষণ, এবার প্রদীপ্ত শিখা এসে পৌঁছলো। সমগ্র হলটি সুগন্ধময়, গৌরবের আভায় উদ্ভাসিত।

হেনা ব'লে উঠলো, ঈশানীদি, মিষ্টার চৌধুরী বাঁশী বাজাতে পারেন কিন্তু।

সম্ভব! ঈশানী ওজন ক'রে হাসলো,—একটু যাও ত' হেনা, রমেনবাবুকে ফাইলগুলো পাঠাতে বলো। দেখে-শুনে চ'লে যাই, আমার তাড়া আছে।

হেনা চ'লে গেল। আর সবাই উঠলো। শান্তনু এবার একটু অধীর হয়ে বললে, আমাকেও যেতে হবে এবার।

ঈশানী বললে, বেশ ত', যাবেন বৈ কি। কলকাতায় রাত দুটো পর্যন্ত গাড়ী পাওয়া যায়। বসুন না একটু ?

এই অনুরোধের পিছনে যে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব মুখ-ঢাকা আছে, সেটি শান্তনুর জানা। সমস্ত স্নেহের ষোড়শ উপচার প্রত্যাখ্যান ক'রে সে যে চোরের মতো সকালবেলা ঈশানীর ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে, তার জন্য কঠিন লাঞ্ছনাও লুকানো রয়েছে ওই অনুরোধের আড়ালে। শান্তনু একটু কেঁপে উঠলো।

ছেলেমেয়েদের অনেকেই উঠে চ'লে গেল। রইলো কেবল জন তিন চার। বর্ষীয়সী মহিলা দুটির কিছু আর্জি ছিল। তাঁদের একজন এবার বললেন, আমরা রমেনবাবুকে অনেকবার অনুরোধ করেছি, কিন্তু তিনি আপনার কাছে যাবার অনুমতিও দেননি, আপনার ঠিকানাও দিতে চান না।

ঈশানী একটু গম্ভীর হয়ে রইলো। তারপর একটু হেসে বললে, আমার কাছে গিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ আমি যেখানে থাকি, সে-বাড়ী আপনাদের ছেলেমেয়ের নৈতিক বিচারক্ষেত্র নয়।

তাঁরা সবিনয়ে বললেন, আজ আমরা অনেক সৌভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি। এবারের মতো আমাদের ছেলেমেয়ে দুটিকে ক্ষমা করুন। আপনি এ প্রতিষ্ঠানের আসল কর্তা।

শান্তকণ্ঠে ঈশানী বললে, অত্যন্ত ভুল আপনাদের ধারণা। আমার কিছু সাহায্য আছে বটে, তবে অধিকার আমার অতি সামান্য!—যাক গে, একটি কথা আমি নিবেদন করি। নাচ-গান করে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা, তাদের

সম্বন্ধে এখনও অনেকে ভয় পায়, অনেকে ভুরু কোঁচকায়। এখানে আনন্দের চেহারাটা অবাধ ব'লেই নানা লোক এখানে অসংযমের চেহারাটা আবিষ্কার করতে চায়। সেজন্য নৈতিক শুচিতা রক্ষাই এখানকার প্রথম মন্ত্র। লোভের উপকরণ এখানে ছড়ানো ব'লেই কঠিন সংযমের দরকার। আপনাদের ছেলেমেয়ে দুটিকে এই প্রতিষ্ঠানে রাখলে যে বিষবাষ্প সৃষ্টি হবে, আমি তার দায়িত্ব নেবার জন্য এ প্রতিষ্ঠানকে বলতে পারবো না। এখান থেকেই অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছে, অনেকে প্রণয়সূত্র রচনা করেছে,—কিন্তু বিন্দুমাত্র অসংযমের পরিচয় কেউ দেয়নি। এটা সাধনা ও সিদ্ধির জায়গা, প্রজাপতির কারখানা এটা নয়!—ঈশানী একটু হাসলো।

মহিলা দুজন আরো যেন কি অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এখানকার ঝি পুঁটুর মা এক তাড়া ফাইল নিয়ে এসে ঢুকলো। ফাইলগুলি রেখে সে চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখ পড়লো শান্তনুর প্রতি। তৎক্ষণাৎ এক গাল হেসে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে পুঁটুর মা বললে, ওমা, আপনি এখানে?

শান্তনু সবিস্ময়ে এই অপরিচিত স্ত্রীলোকটির দিকে একবার তাকালো। ঈশানী মুখ ফিরিয়ে উভয়কে লক্ষ্য ক'রে বললে, কি ব্যাপার? তুমি ওঁকে চেনো নাকি, পুঁটুর মা?

চিনিনে? উনি যে আমাদের মুখুজ্যেপাড়ার জামাই! নীরেনবাবুর বোন সুষমাকে বে' করেছেন। আমরা একই বাড়ীর ভাড়াটে।

শান্তনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল। সেও তামাসা ক'রে বসলো, জামাই ব'লে ঠিক চিনতে পেরেছ ত'? মানুষ-ভুল করোনি? অগ্নি আর নারায়ণ সাক্ষী রেখে কিন্তু বিয়ে হয়, তা জানো ত'?

পুঁটুর মা গদগদ হয়ে বললে, ওমা, তা আর বলতে! ঘরে গিয়েই সুখবরটা দেবো। তবে জামাইটি একালের ছেলে কিনা, বুঝলেন বড়দিদিমণি, সুষমাকে সিঁদুর ছোঁয়াতে কিছুতেই উনি দেন্ না! এই নিয়ে নানা কথা ওঠে!—আপনি ও-বাড়ী যান না কেন জামাইবাবু? ওরা যে ভেবে খুন।

ঈশানী বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও, পুঁটুর মা।

পুঁটুর মা চেনা লোক পেয়ে আবার একগাল হেসে চ'লে গেল। শান্তনু কাঠ হয়ে ব'সে রইলো আগুনের ডেলার মতো। মেয়েমানুষের গোয়েন্দা-গিরি তার জীবনকে অসহ্য ক'রে তুলেছে।

বর্ষীয়সী মহিলা দুটি নতমুখেই ব'সে ছিলেন নীরবে। নিঃশব্দে যে সাংঘাতিক নাটক একটু আগে ঘ'টে গেল, সেজন্য তাঁদের কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু প্রথম কথা বললে ঈশানী। বললে, ভারি খুশী হলুম আপনার স্ত্রীর কথা শুনে, মিষ্টার চৌধুরী। এখানে তাঁকে আনছেন কবে? আসুন একদিন, সবাই মিলে গল্প করি! চলুন, এবার যাই।

দরজার বাইরে বোধ করি অনেকেই অপেক্ষা করছিল—কতক্ষণে ঈশানী বেরিয়ে আসবে। তারা দর্শন পেলেই খুশী হয়! ঈশানী উঠে দাঁড়ালো। এবার মরিয়া হয়ে শান্তনু তীব্রকণ্ঠে তাকে একবার ছোবল মারলো,—এর মধ্যে উঠলেন? থানার দারোগার মতন বেশ ত' বক্তৃতা করছিলেন।

কথাটা শুনে ঈশানী একেবারে হাসিতে ফেটে উঠলো। সে যেন সমস্ত কক্ষে রাশি রাশি মণিমাণিক্য ছড়িয়ে দিল। হাসির আওয়াজেই বুঝতে পারা গেল, এতটুকু চিত্তবিকার তার ঘটেনি। তারপর উঠে এসে সে বললে, আসুন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, নিশ্চয় রাগ করেছেন। আমার ড্রাইভারকে ব'লে দেবো, সে আপনাকে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে!

শান্তনু বললে, প্রস্তাবটা মন্দ নয়, সেখানে যাবার জন্যেই ব্যস্ত হচ্ছিলুম!

চাপা পরিহাস আর কেউ শুনতে পেলো না, এই রক্ষা! কিন্তু ঈশানী আবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠে অগ্রসর হোলো।

বর্ষীয়সী মহিলা দুটি কাঁচুমাচু হয়ে পিছন দিক থেকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষুদ্র একটি জনতার ভিতর দিয়ে পথ কেটে ঈশানী ও শান্তনু নেমে চ'লে গেল।

পিছন থেকে তখনই রটনা হোলো, শান্তনু চৌধুরীর নাম শোনোনি? কলকাতায় সবচেয়ে ভালো ফ্লুট্ বাজায়! ঈশানী রায়ের নতুন আবিষ্কার! প্রতিভাই প্রতিভাকে খুঁজে বা'র করে!

৪

তেওয়ারী গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। রাত আটটা বেজে গেছে। গাড়ীর মধ্যে ব'সে রয়েছে দুটি মৃতদেহ—শান্তনু আর ঈশানী। অনেকক্ষণ থেকে ওরা চুপ, ওদের মনে নেই।

এক সময় ঈশানী শান্তকণ্ঠে বললে, তুমি বাঁশী বাজাও, একথা সত্যি ?

শান্তনু মৃদুকণ্ঠে বললে, আগে বাজাতুম।

ও, বিয়ের পরে বুঝি বৌ মানা ক'রে দিয়েছে, পাছে হার্টের ব্যামো হয় ?

শান্তনু জবাব দিল না।

এক সময় ঈশানী সামনে ঝুঁকে প'ড়ে হিন্দিতে বললে, তেওয়ারী, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চলো, এখন ফিরবো না।

তেওয়ারী তৎক্ষণাৎ ভিন্নমুখে গাড়ী ঘোরালো। শান্তনু প্রতিবাদ জানালো না। এক সময় ঈশানী প্রশ্ন করলো, আজ সারাদিনে বাড়ী ফেরোনি মনে হচ্ছে ?

শান্তনুর আহত মন সহসা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, কিন্তু সে দমন করলো নিজেকে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, যে-ব্যক্তি তোমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে চোরের মতন পালিয়ে এসেছে, তার কোনো কথাই ত' বিশ্বাসযোগ্য হবে না!

গাড়ী চলতে লাগলো অনেকক্ষণ! ঈশানী পথের দিকে একেবার তাকিয়ে বললে, যদি বলি তার জন্যে আমার শ্রদ্ধাই বেড়ে গেছে তোমার ওপর ?

শ্রদ্ধা!

কোনও প্রকার স্নেহ-মোহ যার মনকে আচ্ছন্ন করে না, সে ব্যক্তি ত' অশ্রদ্ধার পাত্র নয়!—ঈশানী বললে, তুমি কি সত্যিই বাড়ী যাওনি ? সারাদিনই পথে পথে ঘুরলে ?

শান্তনু বললে, না, বাড়ী গিয়েছিলুম।

স্নানাহার করেছিলে ?

না।

ঈশানী চুপ ক'রে গেল কতক্ষণ। তেওয়ারী লেকের মধ্যে গাড়ী নিয়ে ঢুকে একটি নিরিবিলি অঞ্চলে এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজেই সে গাড়ী থেকে নেমে অদূরে গিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইলো।

সামনেই সরোবর। দক্ষিণ বাতাসের মধুর দোলায় লহরীর মালা সঞ্চালিত হচ্ছে। পূর্ণিমা পেরিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রাভা দেখা দিয়েছে পূর্বদিকে। গাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার। শান্তনু বললে, তুমি যে বললে আমাকে গাড়ী ক'রে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দেবে ?

ঈশানী স্মিতহাস্যে বললে, আমাকে পরীক্ষা ক'রো না, শান্তনু। আমি ঠিকই পৌঁছে দেবো। সারাদিন ধ'রে যে রুক্ষ চেহারা নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ, এ অবস্থায় স্ত্রীর কাছে পৌঁছলে সে মেয়েটিও আঁৎকে উঠবে। আমার ওখানে গিয়ে স্নান ক'রে সুস্থ হয়ে নাও, তেওয়ারী তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর ফস ক'রে বললে, তোমার অন্ধ স্নেহ আমার কোনো মিথ্যাচারকেই দেখতে পায় না, এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে ! মেয়েদের শ্রদ্ধা কি এতই সুলভ ?

তুমি বিয়ে করলে আমার শ্রদ্ধা ক'মে যাবে এই বা কেমন ক'রে ভাবলে ? তোমার জীবনের ঘটনা আমার কোনো স্বার্থে ত' বাঁধা নেই ! তুমি অবিবাহিত ব'লেই আমার ভালো লেগেছে, এই নোংরা মনোবৃত্তি ত' আমার ছিল না।

শান্তনু বললে, কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে তোমার এই অন্তরঙ্গতা আমার স্ত্রী যদি বরদাস্ত না করে ?

খুব স্বাভাবিক—ঈশানী বললে, তবে নিজের আচরণের শুচিতা যতক্ষণ আমার নিজের মনে সন্দেহ-সঙ্কুল না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুত্ব ! নৈলে তোমার স্ত্রীর অপছন্দের অপেক্ষা রাখবো না, অনায়াসে তোমার সংস্পর্শ ছেড়ে চিরকালের জন্য স'রে যাবো, শান্তনু।

শান্তনু বললে, তা হ'লে প্রথম প্রশ্ন এই আসে, এই বন্ধুত্বই বা কেন ! যার

ভিত্তি দীর্ঘস্থায়ী নয়, যার আয়ু কেবলমাত্র একজনের সাধারণ খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে, তেমন বস্তু নিয়ে নিত্য উদ্বেগের প্রয়োজন আছে কিছু? যে-শিশু জন্মের থেকেই দুরারোগ্য ব্যাধির বীজ সঙ্গে আনে, তার পক্ষে শিশুকালেই ত' মৃত্যু ভালো!

ঈশানী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। তার পাশে শান্তনুও নিশ্চল। অন্ধকারের মধ্যে ব'সে রইলো দুই ছায়ামূর্তি। অনাদি-অনন্ত সৌরলোকের দুই কক্ষচ্যুত গ্রহ যেন কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে রয়েছে; দুই অপরিচয় যেন পাশাপাশি। উভয় উভয়ের নিকট সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত।

মুখ বাড়িয়ে ঈশানী তেওয়ারীকে ডাকলো। তেওয়ারী এসে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিল। ঈশানী বললে, বাড়ী চলো।

রাত তখন প্রায় দশটা।

এদিকটা বালীগঞ্জের শেষ প্রান্তে পড়ে, আশেপাশে এখনও ঘন বসতি গ'ড়ে ওঠেনি। ক্বচিৎ কখনো ঠুং ঠুং ক'রে রিক্সার আওয়াজ শোনা যায়, আর নয়ত মোটর। এদিকটা বেশ নিরিবিলি।

বাড়ী ফিরতেই টেলিফোন বাজলো। ঈশানী গিয়ে রিসিভার তুলে নিল! রমেনবাবু ডাকছেন। সেই বর্ষীয়সী মহিলা দুটি এখনও কাকুতি-মিনতি করছেন। এখান থেকে বহিষ্কৃত হ'লে তাঁদের ছেলেমেয়ে দুটির যে সামাজিক দুর্নাম হবে, সেটির আঘাত তাঁদের পরিবারে কোনোমতে সইবে না। ঈশানী সব শুনে বললে, আমারও ওই একই কথা। তবে আপনি যদি ছেলেমেয়ে দুটোকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থায় আনতে পারেন তাহ'লে দেখুন। মুস্কিল এই, ক্ষমা করলেই অন্যেরা প্রশ্রয় পাবে!

ঈশানী ফোন্ ছেড়ে স'রে এলো। নন্দ আর রামতীরথ এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। শান্তনু বললে, ওবেলা যা খাইয়েছিলে, সন্ধ্যে পর্যন্ত সেটা হজম হোলো, বুঝলে রামতীরথ?

রামতীরথ বললে, যে-আজ্ঞে!

ঈশানী ব'লে দিল, রামতীরথ, তুমি শীগ্‌গির খাবার তৈরী করোগে।

নন্দ আর রামতীরথ দু'জনেই সোৎসাহে চ'লে গেল। ঈশানী এবার হাসিমুখে বললে, ভাইপোটির বদলে এবার বুঝি ক্যামেরাটার ওপর তোমার মায়া পড়েছে? ওটা কি তোমার সঙ্গের সাথী? কোথায় ছবি তুলছিলে সারাদিন?

ঘরের আলোটা একটু নরম। শান্তনু সেইদিকে একবার তাকিয়ে বললে, ওটা সঙ্গেই আছে, কিন্তু ছবি তোলার জন্যে ওটা সঙ্গে রাখিনি।

তবে?—ঈশানী ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তাকালো।

ওটা ছাড়া আমার আর কোনো সংস্থান নেই ব'লেই ওটাকে নিয়ে বাড়ী থেকে শেষবারের মতন বেরিয়ে পড়েছি।

ঈশানী বললে, শেষবারের মতন? মানে? বাড়ী থেকে তাড়া খেয়ে?

শান্তনু বললে, তোমার আন্দাজটাই সত্যি!

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ, তারপর বললে, হুঁ, এত শীঘ্র তুমি বেরিয়ে আসবে, এ ভাবিনি। ঝগড়া করেছ?

না।

তাহ'লে উপলক্ষ্যটা কি?

শান্তনু বললে, আমি নাকি শূদ্রের মেয়ে বিয়ে করেছি।

ঈশানী জানতে চাইলো, তোমার স্ত্রী কি শূদ্রের মেয়ে নন্?

শান্তনু তার একাগ্র দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললে, একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে আমার ওপর চাপানো হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে, আমি জানিনে।

কথাটা কান পেতে ঈশানী শুনলো। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সে বললে, এসো, আগে স্নান ক'রে নাও।

শান্তনু উঠে গেল বাথরুমের দিকে। সঙ্গে তার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই, ঈশানী জানে। সে নিজে ঢিলা পায়জামা পরে, তারই একটা বা'র ক'রে নিয়ে এলো। এই পরিধেয়টা নীচেকার পাঞ্জাবী মহিলারা তাকে কিছুদিন আগে সুপারিশ করেছিল। গায়ে জড়াবার জন্য নরম রেশমের একটি লম্বা 'রোব' বার ক'রে আনলো। তারপর সেগুলি সযত্নে রেখে এলো বাথরুমে। নন্দকে ডেকে ব'লে দিল, এক বালতি গরম জল দিয়ে আয় ত' নন্দ!

পরদিন ভোরবেলা শান্তনুর ঘুম ভাঙ্গলো নতুন জগতে। অতি মৃদু গানের সুর আসছে দূর থেকে।

বিছানাটা এত নরম যে, সে যেন আরামের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে মধুমাসের বাতাস এসেছে সমস্ত রাত ধ'রে,—সেই পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে শান্তনুর সুশ্রী মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গানের আওয়াজটা দূরের নয়, ঘরে রেডিয়ো যন্ত্রটা অতি মিহিটানে খুলে রাখা। গত রাত্রে শান্তনু যখন বিছানায় উঠেছিল, কি যেন একটা কাজের ছুতো নিয়ে ঈশানী সেই যে গা ঢাকা দিল, আর আসেনি। তার ক্লান্তির কথা ঈশানী জানতো, সুতরাং এটা তাকে ঘুম পাড়াবারই ফন্দি। মেয়েদের বিচার ব্যবস্থা অন্য রকমের।

শান্তনু উঠে বসলো বিছানায়। নন্দ এসে দাঁড়ালো। বললে, আপনি কি বিছানায় ব'সে চা পছন্দ করেন, ছোটবাবু?

না—শান্তনু জানতে চাইলো, মেমসাহেব উঠেছেন?

নন্দ হাসলো।—উনি ওঠেন রাত থাকতে। তারপর মেহনত সেরে চান করতে যান্।

শান্তনু তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, মেহনত? সে আবার কি?

আমরা কোনোদিন দেখিনি, ওঁর ঘর বন্ধ থাকে। শান্তনু কৌতুক বোধ ক'রে উঠে মুখ ধু'তে চ'লে গেল। ফিরে যখন বারান্দায় এসে দাঁড়ালো, দেখলো সদ্যস্নাতা ঈশানী তার মাথার অজস্র রেশমের গোছা ফিরিয়ে বেঁধে চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। হাসিমুখে শান্তনুকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, এসো। ঘুম হয়েছিল?

ঘুম! কোনো জ্ঞান ছিল না।—শান্তনু এসে মুখোমুখি বসলো।

ঈশানী বললে, বাঁচলুম। ভয় ছিল, অর্ধেক রাত্রে বুঝি আবার শ্বশুরবাড়ীর দিকে পালাও!

শান্তনু খুব হাসলো। তারপর তামাসা ক'রে বললে, সুন্দরী নর্তকী যদি সারারাত পাহারা দিয়ে রাখে তাহ'লে দু'চার দিন শ্বশুরবাড়ী না গেলেও চলে।

অত্যন্ত নির্মল হাসির ধারায় ঈশানী তার পরিহাসের জবাব দিল। প্রভাতের রাঙ্গা আলো এসে পড়েছে ওদের সর্বাঙ্গে রক্তিম আভায়! অপরূপ লাগছে দুজনকে।

রামতীরথ চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ রেখে দিয়ে গেল।

শান্তনু বললে, তুমি নাকি ঘর বন্ধ ক'রে 'মেহনত' করো?

ঈশানী বললে, নন্দটা বলেছে বুঝি। বছর আষ্টেক ধ'রে একটা বদ্ অভ্যাস করেছি বটে। মাঝে মাঝে এই পোড়া দেহটা যে লোকসমাজে বা'র করতে হয়!

ওদিকটা শান্তনুর জানা নেই! অন্যকথায় সে ফিরে গেল। বললে, আরেকবারও জানতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তুমি জবাব দাওনি। তোমার নাকি ভয়ানক খ্যাতি দেশের সর্বত্র?

ঈশানী তাকে তিরস্কার করলো, সকাল বেলা এসব বাজে কথা কেন তুলছো তুমি? খ্যাতিটাই তোমার কানে উঠেছে, কিন্তু ওই নোংরা খ্যাতিকে যে আমি ধিক্কার দিই, একথা কি কেউ তোমাকে বলেনি?

নোংরা কেন বলছ?

যাক্, এ আলোচনা তোমার মুখে মানাবে না, শান্তনু! তার চেয়ে বরং তোমার স্ত্রীর গল্প করো,—শুনতে আমার ভারি সাধ হয়েছে।

শান্তনু সোজা কথায় এলো। বললে, স্ত্রীর গল্প করবো, না আমার স্ত্রী ব'লে যাকে পরিচিত করা হচ্ছে তার গল্প শুনবে?

মানে?—ঈশানী উৎসুক হয়ে বললে, পুঁটুর মা যা বললে, তা কি সত্যি নয়?

পুঁটুর মা চোখে যা দেখেছে, তার বাইরে সবটাই মিথ্যে।

তুমি বিয়ে করোনি?

না।

লুকোচ্ছো আমার কাছে?—ঈশানী তাকালো।

শান্তনু বললে, তোমার ওপর লোভ থাকলে লুকোতুম বৈ কি। তোমাকে

ভয় পেলেও লুকোতুম, তোমার সঙ্গে চিরস্থায়ী সম্পর্ক রাখার আসক্তি থাকলেও লুকোতুম।

আশ্চর্য, সুষমা কি তোমার স্ত্রী নয় ?

না।

তা হ'লে কি এই কথাই বুঝবো, তুমি তাকে লোভ দেখিয়ে পথে ভাসিয়ে পালাতে চাইছো ?

শান্তনু চায়ের পেয়ালা রেখে অবাক হয়ে ঈশানীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঈশানী বললে, ঠিক অবস্থাটা বলো, শান্তনু, আমার কাছে কোনো লজ্জা ক'রো না। যদি দরকার হয় আমি তোমাদের সমস্ত বিপদে সাহায্য করবো। কি হয়েছে সত্যি বলো ত ?

শান্তনু শান্তকণ্ঠে বললে, বিশ্বাস করো ঈশানী, এ জীবনে আমার হাতে কোনো মেয়ের প্রতি অবিচার হয়নি ! আর—আর যদি বেশী জানতে চাও, তাহ'লে অকপটে বলবো, আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি, তাদের একটি আঙ্গুলও কখনও ছুঁইনি !

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কতক্ষণ হাসিমুখে। আগাগোড়া ব্যাপারটা তার সত্যই বোধগম্য হচ্ছিল না। কোথাও কিছু একটা চাপা থেকে যাচ্ছে, এই তার ধারণা। একসময় সে বললে, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায় না ?

যায় বৈ কি।

বাইরে থেকে কে যেন সাড়া দিল। ঈশানী মুখ ফিরিয়ে বললে, কে ? এদিকে এসো।

একটি লোক জুতো ছেড়ে এদিকে এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, ও আপনি ? নন্দকে দিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। এঁর গায়ের মাপটা নিন্ ত ?

লোকটা ফিতা বা'র ক'রে শান্তনুর দিকে এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, আজ সন্ধ্যের দিকে অন্তত গোটাদুই পাঞ্জাবী বানিয়ে কেচে ইস্তিরি ক'রে দেবেন। ওঁর বিশেষ দরকার।

সমস্ত ব্যাপারটার খেই হারিয়ে শান্তনু উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। বাইরের লোকের সামনে এমন কোনও মন্তব্য করা চলবে না, যেটা প্রতিবাদের মতো শোনায়। লোকটা তাকে উল্টে পাল্টে অনেক রকমের মাপ নিয়ে একসময় বললে, সন্ধ্যেবেলাতেই দিতে পারবো। বাকিগুলো একে একে এক সপ্তাহের মধ্যেই দিয়ে দেবো।

ঈশানী বললে, রেশমী কাপড় দেবেন না, বেশী সৌখীন হ'লে ওঁর পক্ষে অসুবিধে হবে।

লোকটা চ'লে যাবার পর শান্তনু বললে, পরের পয়সায় যদি বা একটু নবাবী করার সুবিধে পেলুম, লোকটাকে তুমি মানা ক'রে দিলে।

ঈশানা বললে, পরের পয়সা মানে? তোমাকে দিচ্ছে কে? এ ত' তোমারই টাকা।

শান্তনু বললে, অর্থাৎ?

তোমার ক্যামেরাটা যে আমি কিনে নিয়েছি।

কিনে নিয়েছ! এ যে তুমি দাদাকেও হার মানালে! যার সম্পত্তি সে জানলো না, অথচ বিক্রি হয়ে গেল? কত টাকা দিয়ে কিনলে শুনি?

হাসিমুখে ঈশানী বললে, যার সম্পত্তি সেই নির্দেশ করবে!

শান্তনু বললে, মনে রেখো ওটা আমার মূলধন। ওটাই ভাঙ্গিয়ে আমার পেট চলবে।

বেশ ত'—এখন থেকে তাই হবে!

সমস্যার এত সহজ মীমাংসা দেখে শান্তনু হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললে, ঈশানী, তুমি কি আজ থেকে আমার সব ভার নিতে চাইছ?

ঈশানী বললে, স্বীকার ক'রে মরি আর কি! মেয়েমানুষ তোমার সব ভার নিলে তুমি হয়ত সব ফেলে পালাবে একদিন। তোমার মনের চেহারা আমার জানতে আর বাকি নেই!

তাহ'লে এভাবে আমার বন্ধনদশা ঘটাচ্ছ কেন? বনের পাখী সোনার খাঁচার লোভ ছেড়ে যদি আর উড়ে যেতে না চায়?

ঈশানী বললে, সে অজ্ঞান ব'লেই পোষ মানে। তুমি বনের পাখীর চেয়েও বন্য!

তোমার স্নেহ পেয়ে যদি পঙ্গু হয়ে যাই?

তোমার স্ত্রীর ভালোবাসাই সেই পঙ্গুতাকে ঘুচিয়ে তোমাকে পথ দেখাবে! ভয় কি?

শান্তনু বললে, কোথায় আমার স্ত্রী?

ঈশানী বললে, সুষমা কেমন মেয়ে আমি জানিনে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যদি সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়, তা হ'লে আমি তোমার বিয়ে দিয়ে তোমার সংসার গুছিয়ে দেবো।

সংসার গুছিয়ে দেবে, মানলুম। কিন্তু মন? সে যদি কোনো গোছ না মানে? যদি সে সব পেয়েও কাঁদুনে শিশুর মতন আবদার ধ'রে থাকে?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। কথাবার্তাগুলো তাড়াতাড়ি বড়ই গাম্ভীর্যের দিকে ঘেঁষে গেল। এক সময় সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলো যাই।

শান্তনু বললে, কোথায়?

বলছি।—ব'লে বারান্দার ছাদের দিকে ঈশানী এগিয়ে গেল, এবং গলা বাড়িয়ে বললে, তেওয়ারী, গাড়ী বাহার কর দো।

যো হুকুম, মেমসাব।—তেওয়ারী সাড়া দিল।

বিপন্নভাবে শান্তনু এগিয়ে এসে বললে, এই কিম্ভুতকিমাকার পোষাক নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি যাবো কোথায়?

ঈশানী বললে, বটে, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছ একবার? সত্যবানের বৌ সতী সাবিত্রীরও মাথা ঘুরে যেত।

ঈশানী তাড়াতাড়ি ভিতরে গেল, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে সেও ওই একই ঢিলা পায়জামা আর লম্বা গাউন চড়িয়ে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, এবার ভয় ভাঙলো ত?

শান্তনু বললে, সর্বনাশ! দুজনে এই জোব্বা নিয়ে পথে নামলে রাস্তার লোক কি ঠাওরাবে বলো ত?

মধুর আনন্দে ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, নির্বোধ পথচারীরা চিরকালই যা কল্পনা ক'রে আনন্দ পায়, তাই ভাববে! চলো।

দুজনে নেমে এলো নীচে। গাড়ীতে উঠে ঈশানী নিজেই ষ্টিয়ারিং ধরলো। শান্তনুকে বসালো পাশে। তেওয়ারী যথারীতি পিছনের সীটে বসলো।

ফটক ছাড়িয়ে গাড়ী বেরিয়ে গেল।

একটা কথা জানবার জন্য শান্তনু অনেকক্ষণ থেকে উদ্বিগ্ন ছিল! কথাটা যে নতুন, তা নয়! মিহিজামে থাকতে সমস্ত হাসি পরিহাসের মধ্যেও ঈশানী একথাটা বলতে ভোলেনি যে, তাকে একটি বিশেষ বিষয়ে সাহায্য করা দরকার। বস্তুত, সাহায্যলাভের কথা থেকেই তাদের দুজনের প্রথম ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু সে-সাহায্য কি প্রকার, সেটার আনুপূর্বিক আলোচনা কোনো সময়ই হয়নি। গত-কাল থেকেও সে লক্ষ্য করেছে, ঈশানীর সমস্ত স্নেহ-সম্ভাষণ এবং সমাদরের আড়ালে ওই কথাটাই যেন সর্বপ্রধান হয়ে সকল প্রকার আলোচনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা বিস্ময়জনক সন্দেহ নেই। যার হাতের মধ্যে এত বড় প্রতিষ্ঠান, এত লোকজন এবং সুযোগ-সুবিধে চারিদিকে, অর্থের স্বাচ্ছল্য যার অব্যাহত, তার পক্ষে সাহায্যের জন্য নিরুপায়ের মতো হাত পেতে দাঁড়ানো একটু বিচিত্র ধরণের বৈ কি। আর্থিক, বৈষয়িক অথবা সামাজিক কোনো সাহায্যই ত' ঈশানীর পক্ষে দুর্লভ নয়।

শান্তনু শান্তভাবে বললে, আমার কথাগুলো তুমি আগাগোড়া শুনে নিলে, কিন্তু আমাকে দিয়ে তোমার কি দরকার মিটতে পারে,—কই, সে কথা একবারও বললে না ত'?

ষ্টিয়ারিং ধ'রে পথের দিকে চেয়ে ঈশানী হেসে বললে, আগে একটা কথা দাও আমাকে?

কি কথা?

আমার অবাধ্য হবে না কোনোদিন, কথা দাও?

দিলুম।

কথা দাও, কোনো অবস্থায় আমাকে ফেলে চ'লে যাবে না?

শান্তনু বললে, এ ত' আবার সেই বন্ধনদশার কথাই এনে ফেলছ। তুমি কি আমাকে দিয়ে দাসখৎ লিখিয়ে নিতে চাইছো? তোমার ঘরে ব'সে ছুটি-ছুটি ভাত খাবো, তোমার মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী হাসি-তামাসা ক'রে তোমার মন ভোলাবো, দরকার হ'লে তোমার ফাই-ফরমাস খাটবো, এবং তোমার রূপের সুখ্যাতি করতে করতে তোমার পিছনে-পিছনে ঘুরবো,—তুমি কি এই কথাই আমার মুখ থেকে স্বীকার করিয়ে নিতে চাও? আমি পুরুষ মানুষ, ভুলে যেয়ো না, ঈশানী! আমার দাপটে মেদিনী কম্পিত থাকুক, সব পুরুষের মতন আমারও তাই কাম্য।

ষ্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রেখেই ঈশানী একেবারে হেসে লুটোপুটি। শান্তনু তৎক্ষণাৎ আবার যোগ ক'রে দিল, পুরুষকে খুশী করবার জন্যে মেয়েছেলের জন্ম, এই জেনে তোমার বাড়ী ঢুকেছিলুম, কিন্তু মেয়েছেলেকে খুশী করার জন্য আমার জন্ম, এই জেনে হয়ত তোমার বাড়ী থেকে পালাতে হবে।

আবার! ভালো হবে না কিন্তু!—ঈশানী শাসালো তাকে।

শান্তনু বললে, বেকার বসে থাকবো তোমার পাশে, আর দুটো ভালোমন্দ কথা বলতে পারবো না, এ কি কখনও হয়? আজ যদি তোমার দরকারের কথাটা না শুনতে পাই, তবে অর্ধেক রাত্রে ঠিকই শ্বশুরবাড়ী পালাবো।

আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়ে গেছে, বিয়ে তুমি করোনি!

কেমন ক'রে বিশ্বাস করলে?

ঈশানী বললে, যে-পুরুষ একদিনের জন্যেও মেয়েছেলেকে নিয়ে কাটিয়েছে, তার চরিত্রের ইসারা অন্য রকমের। তুমি সেই চরিত্রের নও। আঁচলের হাওয়া তোমার গায়ে আজও লাগেনি।

শান্তনু বললে, তুমি জানলে কেমন ক'রে? তোমারও ত' কোনো অভিজ্ঞতা নেই!

ঈশানী সহাস্যে বললে, যদি বলি অনভিজ্ঞ নই, তাহ'লে কি তুমি ঘেন্না করবে আমাকে?

শান্তনু বললে, ওটা ঠিক বুঝিনে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরা কি স্বামীকে ঘেন্না করে ?

ওটা আমিও বুঝিনে, শান্তনু।—ঈশানী আবার হেসে উঠলো।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো একটি জনবহুল বাজারের সামনে। ফলের ও মনোহারির দোকান ঠিক পাশাপাশি। তেওয়ারী গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ফলের দোকানে দাঁড়ালো। সেখান থেকে নিল কতকগুলি মেওয়া ফল, পাশের দোকান থেকে নিল কেক, বিস্কুট, মাখনের টিন, লজেন্স ইত্যাদি। অনেক দ্রব্যসম্ভার নিয়ে সে গাড়ীতে আবার এসে উঠলো। সমস্ত ব্যাপারটা যেন যন্ত্রচালিত। বুঝতে পারা যায়, এখানে ঈশানী নিয়মিতই আসে।

গাড়ী ছেড়ে দিল আবার। অনেক লোকের ভিড়। কথা বলছে না দুজনে। সতর্কভাবে ড্রাইভ করছে ঈশানী। জনতা তাকে বড্ড বেশী লক্ষ্য করছে। যৌবন যেন রাজবেশ ধরেছে। সবাই সেলাম ঠুকে যায়। এই গাড়ীর চাকার নীচে প্রাণ দেবার জন্য হয়ত অনেকেই প্রস্তুত হ'তে পারে!

দেখতে দেখতে নানাপথ পেরিয়ে একটি পুল ছাড়িয়ে গাড়ী এসে ঢুকলো এক গেট্-এর মধ্যে। সামনেই বিস্তৃত বাগান। বাগানের পরে বিশাল এক অট্টালিকা। উত্তর দিকের খোলা মাঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নানা খেলায় মত্ত। গাড়ী থামিয়ে ঈশানী বললে, একটু বসো, আমি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

শান্তনু অপেক্ষা ক'রে রইলো। ঈশানী সেই ঢিলা পায়জামা আর জোব্বা সমেত নেমে গেল ও-পাশের পর্চের তলা দিয়ে ভিতর দিকে। মোটরের ঘড়িটার দিকে শান্তনু একবার তাকালো। পাশের সীট এখন শূন্য, কিন্তু সেখানে ঈশানী তার শুষ্ক চুলের সুগন্ধ রেখে গেছে। ষ্টিয়ারিংটায় হাত বুলিয়ে সে দেখলো, ঈশানীর নধর হাতের তালুর মধুর উত্তাপ এখনও জড়ানো। তেওয়ারী বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আন্দাজ করা যায়, ঠিক তারই মতো ঈশানীর জীবনটা একেবারে বাধ্য-বাধকতাহীন। এতদিনের মধ্যে একটিবারও ঈশানী তার কোনো আত্মীয়স্বজনের

উল্লেখ করেনি! তবে কি কেউ নেই তার? কেন নেই? আছে কি কেউ? ছিল কেউ? সহসা অসীম কৌতূহলে শান্তনু আচ্ছন্ন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ, কিন্তু বৃন্তটা কই? গাছটা কোথায়? নামহারা পরিচয়হারা বনফুল? কিন্তু এটা ত' কাব্য। মা-বাবা-ভাই-বোন—তারা কোথায়? কেন ঈশানীর এই নিঃসঙ্গ স্বেচ্ছা-নির্বাসন?

মিনিট দশেক পরে ঈশানী বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে এলো একটি ইউরোপীয় মেম, এবং একটি নয় দশ বছরের সুশ্রী বালক। মেম-এর একখানা হাত জড়িয়ে ধরেছে বালকটি। হাসি হাসি মিষ্ট মুখ। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ।

ঈশানী ইঙ্গিত ক'রে শান্তনুকে নেমে আসতে বললে। নেমে এলো শান্তনু। ঈশানী উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল ইংরেজি ভাষায়।—ইনি হলেন শিলভিয়া ভায়োলেট—আমার অতি প্রিয় বন্ধু,—আর ইনি মিষ্টার চৌধুরী, এ জগতে আমার একমাত্র নবলব্ধ অভিভাবক।

সবাই সোল্লাসে হেসে উঠলো। ঈশানী বললে, আর একে চিনতে পারো? শিলভিয়ার ছেলে। ভিক্টর ডাট্। একটু একটু বাংলা বোঝে কিন্তু।

বিস্ময়ের কথা বৈ কি। শান্তনু হাসিমুখে গিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর শিলভিয়ার দিকে চেয়ে বললে, কোন্ খনি থেকে এমন রত্ন খুঁজে পেলে, মিস ভায়োলেট?

ঈশ্বরের দান, মিঃ চৌধুরী।

ভিক্টর ডাট্ মধুর ইংরেজি ভাষায় শান্তনুকে বললে, মিষ্টার চৌধুরী, আমি একটা ছোট্ট লাইব্রেরী গড়েছি। আসুন, আপনাকে দেখাই। সব বই হোলো শিকারের আর ভ্রমণের গল্প!

চলো, নিশ্চয়ই দেখবো।

ভিক্টর সোৎসাহে বললে, জানেন, য়্যাড্‌ভেন্‌চারের গল্প সব চেয়ে ভালো। নানিংয়ের গল্প আপনি জানেন?

নানিং! গ্রীণল্যাণ্ডে যে গিয়েছিল বলছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি দেখছি সব জানেন। রোজ আসবেন ত? মাম্মি বলেছে, বড় হয়ে আমি সোয়েন হেডিনের গল্প পড়বো!

পিছনে পিছনে হাসিমুখে আসছে ঈশানী আর শিলভিয়া! শিলভিয়া বললে, বুঝলে চৌধুরী, ও হোলো সত্যি একটা প্রতিভা,—বাড্‌ডিং! বিশ্বাস করো, 'কুইয়্যার ষ্টোরিজ' আমাকে মুখে-মুখে বানিয়ে বলে। ওর চেহারাটি তোমার বেশ সুন্দর লাগছে না?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, এত সুন্দর যে, বর্ণনা করতে গেলে তোত্‌লা হয়ে যাই!

উল্লোল হাসির ফোয়ারায় সবাই যেন ফেটে পড়লো। শিলভিয়া তারপর মৃদু গলায় ঈশানীকে বললে, এমন সুরসিক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু দিন দিন তুমি যে আরো সুশ্রী হয়ে উঠছো, ব্যাপারটা কি বলো ত?

প্রেমে পড়েছি!—শিলভিয়ার কানে কানে ঈশানী বললে।

বিশ্বাস করিনে!

কেন? পড়তে পারিনে?

শিলভিয়া বললে, তোমার হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থ নেই। অনেক রাজপুত্র তোমার পায়ে সর্বস্ব দিতে পারতো, কিন্তু তোমার কঠিন মন গ্রাহ্যও করেনি। আর তা হবেই ত! তুমি হীরে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, চকচকে পরকলার কাচে তোমার মন উঠবে কেন? জানি ত' সব!—যাকগে, খবর পেলে কিছু?

ঈশানী ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

এতকালের মধ্যে কোনো সঙ্কেত পেলে না? তবে যে সেদিন বললে, পাঞ্জাব না কোথাকার কোন্ কাগজে তার একটা খবর দেখেছিলে? তুমিই ত বলেছিলে, তার সন্ধান করবে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে মন্দ কি?

ঈশানী বললে, অবশ্য একবার শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে! আচ্ছা, সে কথা পরে হবে।

শিলভিয়া বললে, তুমি ত' তোমার এই বন্ধুর সাহায্য নিতে পারো এসব কাজে ?

ঈশানী বললে, সেকথা আমি ভেবেছি, তবে ওঁকে এখনও খোলাখুলি কিছু বলিনি।

ভিক্টরের সঙ্গে শান্তনু বেরিয়ে এলো। তেওয়ারী এগিয়ে গিয়ে এবার একজন খানসামার হাতে খাদ্যসামগ্রীগুলি একে একে তুলে দিল।

শিলভিয়া সোৎসাহে ব'লে উঠলো, কেমন, দেখলেন ত' মিষ্টার চৌধুরী, ও ছেলে আশ্চর্য। দু' দুবার ফার্ষ্ট হয়েছে এই কন্‌ভেণ্ট স্কুলে। আমি জানি ও ছেলে বড় হয়ে দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি হবে। ওর কৌতূহল এবং জানবার পিপাসা দেখে এখানে সবাই অবাক। রূপের সঙ্গে এমন গুণ ক'জন বালকের হয় !

ঈশানী বললে, ছেলের বড্ড সুখ্যাতি ক'রে ফেলছ তুমি, শিলভিয়া !

শিলভিয়া বললে, তুমি বাধা দিলেও আমি শুনবো না, ঈশানী ! সব ছেলেই আমার সন্তান, কিন্তু ওর বৈশিষ্ট্য বর্ণনার অতীত।

ঈশানী হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে রুমাল দিয়ে ছেলেটির কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। কিন্তু ভিক্টর আর শান্তনুর বন্ধুত্ব দেখার মতো। ওদের যেন কতকালের আলাপ ! এই কন্‌ভেণ্টে কবে একটি মাছরাঙ্গা পাখী এসেছিল, ক্রিকেট খেলায় এবার কে-কে নাম করেছে, ওরা সদলবলে গঙ্গায় গিয়ে ভারতীয় ক্রুজার জাহাজ কবে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় কোন্ জানোয়ার এসেছে নতুন,—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা গল্প নিয়ে ওরা দু'জন মেতে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুও তলিয়ে গেছে নিজের বাল্যকালে। সে মার্বেল গুলী খেলতো তার ছোটবেলায়, চলন্ত ষ্টিমারে দাঁড়িয়ে লাটু ঘোরাতো, পিক্‌নিক্ করতে যেতো বোটানিক্যাল্ গার্ডেনে, ফুটবল-এ সে গোল্‌কীপার খেলতো,—এবং তারপর একবার জঙ্গলে গিয়েছিল বন্দুক হাতে নিয়ে,—ইত্যাদি সব রোমাঞ্চকর কাহিনী।

অবশেষে ভিক্টর ধ'রে বসলো, সপ্তাহে অন্তত দু'বার তাকে এখানে আসতেই

হবে। এমন চমৎকার লোককে না পেলে তার কিছুতেই চলবে না। ডু কাম্, প্লীজ, মিষ্টার চৌধুরী!

ঈশানী তামাসা ক'রে বললে, তুমি যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলে, শান্তনু।

শান্তনু ভিক্টরকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছিল। বললে, মুগ্ধ যদি কেউ করে, আমি নিরুপায়!

ঈশানী একবার তন্ময় হয়ে তাকালো ওদের দিকে, তারপর বললে, এবার চলো যাই।

ওরা সবাই পরস্পর বিদায় নিয়ে গাড়ীতে এসে উঠলো। তেওয়ারী এবার চালাবে। ঈশানী আর শান্তনু বসলো পিছনে। ভিক্টর চট ক'রে একবার গাড়ীর ভিতরে ঢুকে ওদের দুজনের সঙ্গে সাদরে করমর্দন ক'রে গেল। তারপর শিলভিয়া এগিয়ে এলো। ঈশানী বললে, বলবে কিছু, শিলভিয়া? এঁর কাছে গোপন ক'রো না, ইনি সব জানেন আমার।

শিলভিয়া বললে, আজকের টাকা কি ডোনেশনের খাতায় তোলা হবে?

ও, আচ্ছা, আমি ফোনে কথা বলবো ফ্রেডেরিকের সঙ্গে।

শিলভিয়া চ'লে গেল। তেওয়ারী গাড়ী ছেড়ে দিল। চুপ ক'রে রইলো ঈশানী। উল্লাসের সমস্ত কলরবটা রেখে এলো সে ওখানে, গাড়ীর মধ্যে ব'সে সে যেন কোথায় হারিয়ে গেল। কথা বলছে না কেউ। শান্তনু শুধু মনে মনে প্রশ্ন করছিল—সবই কি তোমার জানি? কই, কিচ্ছু জানিনে ত? শুধুই কি বন্ধুত্ব ওদের সঙ্গে, আর কিছু নয়? টাকা দিলে কেন শিলভিয়াকে? অত খাবার কিনে আনলে কা'র জন্যে? আর আমাকে অন্ধকারে রেখো না, ঈশানী।

গাড়ী হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। ঈশানী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল বাইরের দিকে চেয়ে। রৌদ্র গরম হয়ে উঠেছে। রুমাল বা'র ক'রে ঈশানী তার রাঙ্গা মুখখানা একবার মুছলো। একসময় সহসা সে যেন দূর আকাশ থেকে নেমে এলো। বললে, ভিক্টরের মুখের সঙ্গে তোমার ভাইপোটির একটু আদল আসে, নয়?

গা ঝাড়া দিল শান্তনু। বললে, হয়ত আসে, কিন্তু ভিক্টর চমৎকার। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ! ওদুটো বস্তু একসঙ্গে পেলে আনন্দে আমি অধীর হই।

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে বললে, শিলভিয়ার মতো মাকে ওর পাশে বেশ মানায়, না ?

কিন্তু ভিক্টর ত' ওর ছেলে নয় ?

ঈশানী কিয়ৎক্ষণ থেমে বললে, কনভেণ্টের অনেক শিশু জন্ম-রহস্যে বাঁধা, এ কি তুমি জানতে না ?

শান্তনু বললে, ওটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। জন্মরহস্য যদি থাকে থাক, পৃথিবীর সব শিশু নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ। প্রাকৃতিক কারণে প্রত্যেক সন্তানই কামজ, কিন্তু প্রেমের দ্বারা সেই সন্তান যদি অভিষিক্ত না হয়, তবে সে দোষ তার পিতামাতার,—তার নয় !

৫

টেলিফোন করেছিলেন রমেনবাবু একটু আগে। অতঃপর আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি ঈশানীর ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দ তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ঈশানীকে এসে খবর দিয়ে গেল।

ইজিচেয়ারে বসেছিল শান্তনু। দুজনের আলাপ চলছিল নিরিবিলি। নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরমুহূর্তে ঈশানী বিছানা থেকে নেমে বললে, লক্ষ্মীটি, তোমার সম্বন্ধে রমেনবাবুকে যা বলবো তুমি যেন তার প্রতিবাদ ক'রো না।

শান্তনু বললে, বেয়াড়া কিছু বলবে নাকি?

না, সেজন্য নয়। তোমার এখানে থাকা নিয়ে ওঁর মনে প্রশ্ন উঠতে পারে ত? সেটা আমি মুছে দেবো—উনি একটু সেকেলে লোক কিনা! তুমি যেন আবার গিয়ে বেমক্কার মতন কথা ব'লো না!

ঈশানী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরে এসে রমেনবাবুর কাছাকাছি বসলো। বললে, এমন অসময়ে?

রমেনবাবু বললেন, চারিদিক থেকে তাগাদা আসছে, কিন্তু আমাদের 'শো' কবে দেবো সে-তারিখটা কই তুমি ত' ঠিক করলে না? টিকিট বিক্রীর আবার একটা সময় দিতে হবে ত! তাছাড়া আমার জানা দরকার, তুমি নিজে নামবে কি না।

ঈশানী একটু গম্ভীরভাবে বললে, সেবারের কথা মনে ক'রে দেখুন। আপনাদের 'শো'র মধ্যে আমি নামলে হিসেবপত্র নিয়ে বড্ড গণ্ডগোল বাধে। যদি আমাকে নামতেই হয় তাহ'লে অন্য তারিখ নেবো।

রমেনবাবু হাসলেন। বললেন, এ প্রতিষ্ঠান তুমিই গ'ড়ে তুলেছ তোমার উপার্জনের টাকায়। আমাদের 'শো' দিয়ে যে টাকা আসবে সেও একপক্ষে

তোমারই টাকা। তুমি যদি তোমার হিসেব সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে চাও, কারো কোনো আপত্তি নেই!

সেই ভালো, রমেনবাবু। প্রতিষ্ঠানের একাউণ্টে টিকিট বিক্রী হ'লে তার থেকে নিজের জন্য টাকা নিতে আমার বাধে, মনে হয় দিয়ে আবার কেড়ে নিচ্ছি।—ঈশানী পুনরায় বললে, তার চেয়ে এই ভালো, এতে আমার নিজের হাত খোলা থাকে।

রমেনবাবু বললেন, তা হ'লে 'শো' আমরা কবে দেবো?

অন্তত সপ্তাহ তিনেক হাতে রেখে টিকিট বিক্রী আরম্ভ করুন? বাকিটা ত' সাজানো গোছানোই আছে।

কাষ্টিং তুমি যা রেখেছিলে তাই থাকবে ত'?

হ্যাঁ, তাই রেখে দিন্।

রমেনবাবু বললেন, তবে তোমার কথামতোই ডবল কাষ্টিং ক'রে রেখেছি। কি জানি কখন কলেরা-বসন্তের মহামারী লাগে!

ঈশানী বললে, এবারেও কি মহামারী লাগার ভয় আছে?

রমেনবাবু বললেন, আমার বয়স ষাট বছর হ'তে চললো। গত সাঁইত্রিশ বছরে এমন এক বছরও বাদ যায়নি, যে বছরে এই পোড়া শহরে এই সময়টায় মড়ক লাগে নি। স্থতরাং ওটা মনে রেখেই ডবল কাষ্টিং করেছি। সে যাই হোক, তোমার 'শো'র তারিখটা তুমি কবে দিতে চাও?

সেটা এখন অনির্দিষ্ট থাক। যদি নামি তবে 'চিত্রাঙ্গদা' করবো।

রমেনবাবুর মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, প্রস্তাবটা আমিই করবো মনে করেছিলুম। তোমার মুখে শুনে ভারি আনন্দ পেলুম। 'চিত্রাঙ্গদা' করলে তুমি সবচেয়ে ভালো হাউস পাবে। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, ছুদিনে তোমাকে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা এনে দেবো। তুল-কালাম ক'রে দেবো কলকাতা!

রমেনবাবুর গলার আওয়াজটা মোটা। এ ঘরে পর্যন্ত তার প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। শান্তনু আর হাসি চাপতে পারলো না, সে গুটি গুটি এ ঘরে এসে দাঁড়ালো। রমেনবাবু বললেন, বাহবা, সাবাস,—আমি ত খবর পাইনি আপনি এখানে।

আরে মশাই, আপনার জন্যেই তো আমাকে আসতে হোলো। ভাবছিলুম কোথায় গেলে আপনার ঠিকানাটা পাওয়া যায়!

ঈশানী বললে, আপনি এখনও খবর পাননি, শান্তনু আমার খুব নিকট আত্মীয়। আমার মায়ের যিনি সাক্ষাৎ বৈমাত্রেয় ভাই, ও হোলো তারই শ্যালীর দেওরপো।

রমেনবাবু সোল্লাসে ব'লে উঠলেন, ওই যথেষ্ট, আর না বললেও চলবে! তাই ত বলি এমন রাজপুত্তুর এলো কোত্থেকে,—হবেই ত, বংশের ধারা যাবে কোথায়? এতদিনে তোমার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি লোক পেলে! মিঃ চৌধুরী, বিশ্বাস করুন, মিহিজামের চেয়ে আপনার এখনকার চেহারা অনেক ভালো হয়েছে। ওঁকে অর্জুনের পার্টটা দিলে কেমন হয়? উনি কবি, শিল্পী, সুরসিক। কথাটা একবার ভেবে দেখো।

ঈশানী বললে, উনি বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, এখানেই এখন থাকবেন। ওঁর দাদার সঙ্গে মামলার একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উনি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন। ওঁর পক্ষে এসব নিয়ে মাথা ঘামানো বোধহয় সম্ভব নয়।

রমেনবাবু বললেন, কিন্তু সব জায়গায় রটে গেছে যে, ওঁর মত বাঁশী নাকি আর কেউ বাজায় না। আমার ঘরে ফোনের পর ফোন। কাগজওলারা এসে চেপে ধরেছে।

শান্তনু হাসলো। বললে, মনে হচ্ছে প্রচার চক্রান্তে প'ড়ে গেছি।

ঈশানী চকিত কটাক্ষে একবার রমেনবাবুকে লক্ষ্য ক'রে হেসে বললে, তুই বাঁশী বাজাতে পারিস একথা স্বীকার ক'রেই যে মাটি করেছিস।

তুই! পলকের মধ্যেই শান্তনুর চোখের তারা উভয়ের উপর দিয়ে ঘুরে এলো। অতি নিকট অন্তরঙ্গতাটা রমেনবাবুর কানে বাজুক, এটা ঈশানীর ইচ্ছা। শান্তনু বললে, আমি কি জানি তোদের প্রতিষ্ঠানের লোকেরা আমাকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলবে?

তুই সম্ভাষণটা শুনে ঈশানী পুলকিত হ'য়ে উঠলো। তুই চোখের টেলিগ্রাফের মর্মটা শান্তনু বুঝেছে। ওকে ধন্যবাদ।

রমেনবাবু বললেন, কাজ হয়ে গেল, এবার আমি উঠবো, তাড়া আছে। হ্যাঁ, আরেক কথা।

রমেনবাবু উঠছিলেন, আবার বসলেন। উভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালো। তিনি বললেন, পুঁটুর মা'র সঙ্গে একটি মেয়ে আমার আপিসে তিন চারদিন ধ'রে আনাগোনা করছে,—ওদের ওই মুখুজ্যেপাড়ারই মেয়ে। নাম হোলো সুষমা।

ঈশানী বললে, আপনার ওখানে কেন?

তোমার সঙ্গে দেখা করবার ভয়ানক আগ্রহ তার। কিন্তু তোমার অনুমতি না হ'লে ত' এখানকার ঠিকানা দিতে পারিনে। আজও আমার অপেক্ষায় সে বসে আছে, আমিই বসিয়ে রেখে এসেছি। গরীবের মেয়ে, লেখাপড়া মোটামুটি বেশ জানে। আই-এ পরীক্ষায় ফিজ দিতে পারেনি, সেজন্য পাশও করেনি!

ঈশানী বললে, আমার এখানে তিনি আসতে চান কি জন্য?

শান্তনু জবাবটা দিল, বোধহয় প্রাণের দায়ে!

ভুল বুঝলেন রমেনবাবু। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, না না, চৌধুরী মশাই, প্রাণের দায়ে নয়। তা যদি হোতো, তাহ'লে আমার মাসতুতো ভাইদের ব্যাঙ্কের আপিসে মেয়েটির একটি চাকরী জুটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু মেয়েটির বোধহয় অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।

শান্তনু প্রশ্ন করলো, বিবাহিত মেয়ে?

ঈশানী তামাসা ক'রে বললে, অবিবাহিত হ'লে বুঝি তুই তার মাথায় সিঁদুর চড়াতে বলতিস?

হো হো ক'রে রমেনবাবু হেসে উঠলেন। পরে বললেন, বয়েসটা আমার এত বেশী হয়েছে যে, মেয়েছেলের কপালের দিকে আর চোখ পড়ে না।

ঈশানী খুব হেসে উঠলো। শান্তনু একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

রমেনবাবু পুনরায় বললেন, আর তাছাড়া আজকাল ওদের আর চেনাও যায় না। বিয়েঅলা মেয়ে সিঁদুরের চিহ্নটুকু আজকাল চুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে, এবং মাথার ঘোমটাও ফেলে দিচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী সিনেমায় যায়, যেন তরুণী শ্যালী আর নব্য ভগ্নীপতি। ঠিক যাকে বলে, ভগ্নীপতিব্রতা।

তাঁর ঠোঁট ওলটানো দেখে শান্তনু এবার হৈ হৈ ক'রে হেসে উঠলো। কিন্তু রমেনবাবু থামলেন না, এক নিশ্বাসেই ব'লে গেলেন, আর ওই ছাখো নতুন বিধবাদের। সিঁদুর নেই বটে, কিন্তু পরনে শাড়ী আর জামা, পায়ে চমৎকার জুতো, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। এক হাতে রিষ্টওয়াচ, অন্য হাতখানা কুমারী মেয়েদেরই মতন। ফলে, হয়েছে কি জানো? মেয়ে জগতে ভয়ানক কমপিটিশন! এর ন্যায্য পাওনা ও কেড়ে নিচ্ছে! তবে ওরই মধ্যে আবার একটু পার্থক্য! সেটা হোলো মুখে রং মাখানো।

দুজনে হেসে একেবারে লুটোপুটি। রমেনবাবু বললেন, আমাদের কিন্তু ওসব দেখতে নেই,—তবে চোখে পড়ে কিনা! সধবারা রং মাখে না, তবে একটু পাউডার ঘষে, কেননা তাদের ত' কাজ হাসিল হয়ে গেছে। বিধবারা পাঁচ রকম রং মাখতে এখনও একটু লজ্জা পায়। সুতরাং কুমারীরাই এখন আষ্টে-পৃষ্ঠে মুখের ওপর রংয়ের পোঁচড়া বুলোয়!

ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত হাসি ওদের ফেনিয়ে উঠলো। রমেনবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহ'লে সুষমাকে কি বলবো?

অপাঙ্গে ঈশানী একবার শান্তনুর দিকে তাকালো। তারপর বললে, বেশ ত,' আলাপ করতে দোষ কি, কেমন শান্তনু?

শান্তনু বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাঁর যখন অত আগ্রহ!

ঈশানী বললে, আপনি তাকে পাঠিয়ে দিন এখানে।

রমেনবাবু সম্মতি জানিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

ওরা দুজনে চুপ ক'রে ব'সে রইলো কতক্ষণ। এক সময় ঈশানী বললে, যাক, বাঁচলুম আমি।

শান্তনু তাকালো। ঈশানী বললে, হঠাৎ তোকে এখানে দেখলে ওদের খটকা লাগতো। একটা কৈফিয়ৎ রইলো মাঝখানে, ভালোই হোলো।

শান্তনু বললে, তোর কোনও ভয় কি নেই?

ঈশানী হাসলো। বললে, পিঁপড়েকে কেউ ভয় পায় না, কিন্তু কামড়ের ভয়ে পা সরিয়ে নেয়। ওরা একবার যখন শুনলো তখন আর কখনো কৌতূহলী

হবে না। তা ছাড়া যে কারণেই হোক, আমার ওপর ওদের বিশ্বাসও আছে। তোর দিক থেকেও আড়ষ্টতা না থাকে, এও আমার ইচ্ছে।

শান্তনু বললে, এ সব চোখ টেপাটিপির জন্যে মনের মধ্যে যদি গ্লানি জ'মে ওঠে?

সেটা মনের দোষ, শান্তনু।

শান্তনু বললে, ধর্ আমি যদি তোর সম্বন্ধে অন্যত্র চোখ টিপে রাখি, সেটা কি আমার নোংরামির পরিচয় হবে না?

একথা ওঠে না।—ঈশানী বললে, মানুষ সবচেয়ে অন্তরঙ্গর কাছে সবচেয়ে বেশী দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে রাখে, কেননা উভয়ের মধ্যে একটা বিশ্বাসের ক্ষেত্র পাকা হয়ে আছে। কেউ কারুকে কখনও প্রতারণা করবে না। এখানেই মনের শুচিতার কথা ওঠে, শান্তনু। তুই কখনও নোংরায় নামবিনে, তোর চেয়ে আমি একথা বেশী ক'রে জানি ব'লেই তোর হাতে নিজেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, তা' জানিস?

হাসিমুখে শান্তনু বললে, এটা কিন্তু শাসনের মতন শোনাচ্ছে।

শাসন! তোকে? আবার আমাকে জন্মাতে হবে।

নন্দ ঘরের মধ্যে এলো। বাইরে চৈত্র মাসের রোদ দেখে রামতীরথ ওর হাতে অরেঞ্জ-জুস পাঠিয়েছে দু'গেলাস। নন্দ হেঁট হয়ে ট্রে থেকে গেলাস দুটো নামিয়ে রেখে চ'লে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে তেওয়ারী এসে জানালো, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ওপরে ডেকে আনো।—ঈশানী জবাব দিল।

তেওয়ারী যাবার পর চুপ ক'রে গেল ওরা দুজন। ঠিক যেমনটি বসেছিল ঈশানী, ঠিক তেমনিভাবেই ব'সে রইলো, এতটুকু তার চাঞ্চল্য দেখা গেল না। শান্তনুর মুখখানা গম্ভীর। আজ সে তার জীবনের একটা অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যার নিষ্পত্তি দেখতে চায়। শুধু বললে, আমি কি ওধারে যাবো?

ঈশানী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, মনের অগোচরেও যদি অন্যায় বোধ থাকে তাহ'লে যেতে পারিস।

শান্তনু গেল না, স্থির হয়ে একই ভাবে ব'সে রইলো।

সিঁড়ি দিয়ে সটান উঠে এলো সুষমা। এদিক ওদিক তাকালো, চটিজুতোটা বাইরে ছেড়ে রাখলো, তারপর পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলো।

এ কি! থমকে দাঁড়ালো সুষমা। শান্তনুর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললে, তুমি এখানে?

শান্তনু বললে, এ বাড়ীটা প্রায় আমার নিজের, আমিই তোমাকে এখানে ডাকতে পাঠিয়েছিলুম। বসো।

হাসিমুখে তাকালো ঈশানী। বললে, তোমারই নাম সুষমা?

সুষমা নমস্কার জানালো। তারপর বেতের সোফায় বসলো। ব'সে বললে, আপনার সঙ্গেই দেখা করবার চেষ্টা করছিলুম। ওঁকে এখানে দেখবো ভাবিনি।

ঈশানী বললে, ওর সঙ্গে কবে থেকে তোমার চেনাশোনা হোলো?

তা পাঁচ ছ'মাস হবে। কিন্তু ওঁর মুখ থেকে একবারও আপনার কথা শুনিনি।

শোনবার মতন নয় ব'লেই বোধহয় শোনোনি।

এ কি বলছেন?—সুষমা অনুযোগ করলো, আপনার দেশজোড়া নাম, কত লোক মাথা খোঁড়ে আপনাকে দেখবার জন্যে। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া ত' সৌভাগ্য!

ঈশানী বললে, কে কে আছেন তোমার বাড়ীতে?

আমার বাবা বেঁচে নেই, তবে মা দাদা বৌদি,—এঁরা আছেন। আমাদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়।

শান্তনু একটু হাসলো। বললে, গরীবের ওপর দয়া করা ঈশানীর একটা বদ অভ্যেস, তুমি সব কথা বলতে পারো, সুষমা।

থাম্।—ঈশানী তাকে ধমক দিল। তারপর বললে, এ হতভাগার সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হোলো, সুষমা?

সুষমা মাস ছয়েক আগেকার একটি বিশেষ দিনের কথা স্মরণ ক'রে একটু সলজ্জ হাসি হাসলো। বললে, একজিবিশনে গিয়েছিলুম দাদা আর বৌদির সঙ্গে। উনি প্রত্যেক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এমন তামাসা করছিলেন যে, উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দ পাচ্ছিল। সেখানেই ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ওঁকে আমরা নেমন্তন্ন করেছিলুম।

শান্তনু বললে, প্রথম থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল আমি লোভী।

ঈশানী বললে, পুরুষমাত্রেই তাই! তোমাকে বুঝি অনেক রকম মিষ্টি কথা শোনাতো!

সুষমা বললে, একদিনও না। ওঁর তামাসাই বলুন, আর চেহারাই বলুন, সবই বাইরের, ভেতর একদম ফাঁপা!

ঈশানী বললে, আমারও তাই বিশ্বাস। আরো একটা উপসর্গ আছে ভাই, হয়ত তুমি বুঝতে পারোনি। জ্ঞানের ভাণ করে, কিন্তু আসলে অজ্ঞান। মন ব'লে কোনো পদার্থ ই নেই। ওর ওপর নির্ভর ক'রে আমি এতবার ঠকেছি, কি বলবো!

শান্তনু বললে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ঈশানী।

হোক না কেন, তোর কীর্তির কথা শুনুক সবাই। আমার এক বন্ধু শিলভিয়াকে এমন গাছে তুলে দিয়ে এলো যে, সে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে পাগল। মেয়েরা বড্ড ঠকে ওর হাতে!

সুষমা একটু যেন হতচকিত হয়ে গেল। কিন্তু শান্তনু আর এখানে তিষ্ঠতে পারলো না। বললে, নাঃ এবার দেখছি আমার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে টানাটানি চলছে। আমি ওঘরে যাচ্ছি, দরকার হ'লে ডেকো।—এই ব'লে সে উঠে চ'লে গেল।

সুষমা এবার বললে, আপনার কাছে ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু আপনি যে এত চমৎকার, আমার জানা ছিল না। শান্তনুর সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, এসব আমার কখনও মনেই আসেনি।

দুই নারী এবার মুখোমুখি বসলো। ঈশানী প্রশ্ন করলো, ওর সম্বন্ধে তোমার মনে কি কোনো কথা আছে, সুষমা?

এমন ক'রে জিজ্ঞেস করলে আমি মিছে কথা বলতে পারবো না!

ঈশানী কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তাহ'লে ওকে তুমি বিয়ে করো না কেন?

নতমুখে সুষমা বললে, আমার মাও সেজন্যে খুব ব্যস্ত, কিন্তু শান্তনু বিয়ে করতে চায় না।

কেন? তুমি ওর প্রিয় হ'তে পারোনি?

আমার দুর্ভাগ্য সেটা।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, শান্তনু কি কোনোদিন কোনো আশ্বাস তোমাকে দিয়েছে?

সুষমা বললে, না।

তোমার বাড়ীর আশেপাশের লোক তাহ'লে শান্তনুকে পাড়ার জামাই ব'লে মনে করে কেন? শান্তনু কি মধ্যে মাঝে থাকে তোমাদের ওখানে?

না না, সেদিকে ওঁর একেবারেই মন নেই। তবে আমাকে নানা লোকে টিটকারি দেয়, নিন্দে রটায়, তাই দু'চার দিন মাথায় সিঁদূর দিয়ে ওঁর বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়েছিলুম। উনি তখন মিহিজামে।

ঈশানী বললে, তারপর?

সুষমা বললে, এই নিয়ে ওঁর বাড়ীতে খুব গণ্ডগোল ঘটে। আমি সেজন্যে খুবই লজ্জা পেয়েছি।

ছেলেমানুষ তুমি, এখানে মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছ। সিঁদূর হোলো একটা মস্ত সংস্কার। এটার সঙ্গে জীবনের একটা বিবর্তন জড়ানো। এ কাজটি তোমার পক্ষে ভালো হয়নি। এখন তুমি কি করতে চাও, সুষমা?

সুষমার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল এলো। কম্পিত কণ্ঠে বললে, আপনি আমাকে ব'লে দিন।

ঈশানী অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, তোমার বয়স কত, ভাই?

উনিশ এখনো হয়নি।

তোমার বাড়ীর অবস্থা সত্যিই কি রকম ?

সুষমা অকপটে বললে, খুবই শোচনীয়।

ঈশানী বললে, শান্তনুর সঙ্গে কথা ব'লে আমার যে সন্দেহ হয়েছিল, তোমার কথা শুনে সেটায় আমার বিশ্বাস হোলো। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করোনি, আমাদের দেশের বহু মেয়ে অভাব-অভিযোগের থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কোনো একটা অবলম্বন খোঁজে। যদি পায় তবে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে। ভুল ক'রে নাম দেয়, ভালোবাসা ! অনেক নির্বোধ ছেলে চাকরি না পেয়ে শাঁসালো শ্বশুর খোঁজে ; অনেক মেয়ে দারিদ্র্য থেকে বাঁচবার জন্য বিয়ের লোভে প্রণয়াসক্ত হ'তে চেষ্টা পায়। কিন্তু এর সবগুলোই অস্বাভাবিক। ভালোবাসা এর ত্রিসীমানার মধ্যে নেই।

সুষমা বললে, শান্তনুকে দেখে কি আপনার মনে হয়, আমি ভুল করেছি ?

ঈশানী বললে, এ আমার অনধিকার চর্চা, সুষমা। ওটা তোমাদের উভয়ের ভেতরের কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, শান্তনুর মনের খবর তুমি হয়ত ভালো ক'রে পাওনি। হয়ত একটা কোথাও ভুল থেকে যাচ্ছে।

সুষমা অনেকটা হতবুদ্ধির মতো ঈশানীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

এদিকে শান্তনুরও মনে স্বস্তি ছিল না। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালো, সেটা জানা দরকার বৈকি। সুতরাং সে পুনরায় এঘরে এসে আগের চেয়ারখানাতেই ব'সে পড়লো।

ঈশানী শান্তনুর দিকে ফিরে তাকালো। বললে—শান্তনু, যে কারণেই হোক না কেন, মেয়েরা তোর কাছাকাছি এলে দুঃখ পায়।

শান্তনু বললে, সেইজন্যেই ত' পালিয়ে বেড়াই।

কিন্তু এরকম অবস্থা যদি দাঁড়ায়, এর একমাত্র প্রতিকার কি জানিস ?

সুষমা এবং শান্তনু দুজনেই ঈশানীর দিকে চেয়ে রইলো। ঈশানী বললে, আমার একান্ত অনুরোধ, সুষমাকে তুই বিয়ে কর।

শান্তনু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার স্বভাব-সংযম সে-উত্তেজনাকে প্রকাশ পেতে দিল না। শুধু শান্তকণ্ঠে সে বললে, সুষমা, এই

ছ'মাসের মধ্যে আমার ব্যবহারে আচরণে এমন কি কিছু ছিল, যার জন্য আমাদের বিয়ে হওয়া উচিত তুমি মনে করো ?

প্রথমটা সুষমা চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, আমার মা তোমাকে প্রথম অনুরোধ করেন। তুমি তার উত্তরে বলেছিলে, আপনার মেয়ের জন্য কিছু ভাবতে হবে না।

শান্তনু বললে, সেদিন থেকে কি আমি তোমার চাকরির চেষ্টা করিনি ? তোমার দাদার চিঠির উত্তরে আমি কি লিখেছিলুম ? আমার কথায় কি কোনো আশ্বাস ছিল ? আমি বারম্বার বলেছি যে, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো, আমার সঙ্গে তোমাদের দেখা হওয়া আর বাঞ্ছনীয় নয়।

ঈশানী মাঝখানে বললে, চাকরী একটা পেলে তুমি করবে, সুষমা ?

সুষমা বললে, আমাকে কে চাকরি দেবে ?

শান্তনু বললে, চাকরি করবে কি না তাই বলো।

হ্যাঁ, করবো।

ঈশানী বললে, তুমি সকলের আগে একটা চাকরিই নাও ভাই। পৃথিবী তোমার চোখে আরো স্পষ্ট হোক, রং ধুয়ে মুছে যাক। উপার্জনের মানেই হোলো, জীবন সম্বন্ধে রূঢ় অভিজ্ঞতা। তুমি ছেলেমানুষ, পড়াশুনো করেছ বটে, কিন্তু জীবনের পাঠ তুলে নাও এই কলকাতার পথঘাট থেকে। দেখবে আরেকটা নতুন কল্পনা উঠেছে তোমার মনে। তুমি বড় হ'তে চাইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর পাবে, নিজেকে কঠিন ক'রে জানতে শিখবে। সেটা কি সম্মানের নয়, সুষমা ?

সুষমার মুখে উদ্দীপনা ফুটে উঠলো। শান্তনু যোগ ক'রে দিল, তোমার মা অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন, সেটা কি ভালো না ? তোমার দাদা আর ভারাক্রান্ত বোধ করবেন না, বৌদিদির মুখে হাসি ফুটবে, আত্মীয়স্বজন লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাবে। প্রথম থেকেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকবে। এটা কেমন লাগে তোমার ?

উদ্দীপ্ত মুখে সুষমা বললে, কিন্তু চাকরি পেলে ত !

দাঁড়াও—ব'লে ঈশানী উঠলো। ও পাশের টেবলে গিয়ে ব'সে টেলিফোনের রিসিভারটা সে কানে তুলে নিল। তারপর একটা নম্বর চাইলো।

সুষমা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো তার দিকে।

হ্যালো, রমেনবাবু?

রমেনবাবুর সাড়া এলো ফোনে। ঈশানী বললে, হ্যাঁ, আমি। শুনুন, সুষমার সঙ্গে কথা বললুম। আপনাদের ওই ব্যাঙ্কের আপিসে ওর কাজটা ক'রে দিন্। কিন্তু ওদের অভাব-অভিযোগের সংসার, মাইনেটা একটু ভালো হয় যেন। প্রথমটা শ' দেড়েক টাকার কম না হয়। মেয়েছেলের খরচ বেশী মনে রাখবেন। সামনের সোমবার থেকে সুষমা জয়েন্ করতে চায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আরেক কথা, পুঁটুর মাকে আপনি একটু সতর্ক ক'রে দেবেন। সুষমার সম্বন্ধে কোনো কানাকানি কিম্বা আজে-বাজে কথা নিয়ে সে যেন মাথা না ঘামায়।—যাক, আমি তাহ'লে সুষমাকে পাঠিয়ে দেবো, কেমন? ধন্যবাদ।

রামতীরথ এবার বিকালের চা এবং গরম গরম শিঙ্গাড়া এনে হাজির করলো। ঈশানী নিজের হাতে সযত্নে এক প্লেট সাজিয়ে সুষমার দিকে এগিয়ে দিল। এমন অযাচিত স্নেহের আস্বাদ সুষমা এ জীবনে কখনও পায়নি। সেও উঠে দাঁড়ালো এবং এক পা এগিয়ে বললে, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা ঢেলে দিই।

ওর মুখ-চোখের চেহারায় কোনো বিমর্ষতা নেই লক্ষ্য ক'রে শান্তনু এতদিন পরে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হোলো। ঈশানী উভয়ের দিকে একবার তাকিয়ে সকৌতুকে এবার বললে, শান্তনুর একটা ভালো ক্যামেরা ছিল, তুমি জানো, সুষমা?

সুষমা বললে, জানি, ওটা দিয়ে উনি রোজগার করেন।

কিন্তু ওটা কিছুদিন আগে ও আমার কাছে বিক্রি করেছে। আমার ধারণা আমি ঠকেছি। সে যাই হোক, তার থেকে কিছু টাকা তোমার নিশ্চয় পাওয়া দরকার।

আমি পাবো কেন বলছেন?

ঈশানী হাসলো। বললে, তোমার নতুন চাকরি হোলো, সেই, আনন্দে

শান্তনু তোমাকে কিছু উপহার দিতে চায়। একটু আগেই ও আমাকে ব'লে রেখেছে। বসো, আসছি।

ঈশানী উঠে গেল। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে শান্তনু এবার বললে, আমার বিশ্বাস চাকরি পেলে তোমার বর্তমান সমস্যা অনেকটা ঘুচবে। অন্তত দৈনিক দুর্ভাবনাটার লাঘব হবে।

সুষমা বললে, তুমি এখন কি করবে?

ঠিক জানিনে, তবে এঁর এখানে হয়ত কিছু কাজের ভার আমাকে নিতে হবে। অবিশ্যি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে।

তোমার সঙ্গে কি আমার দেখাও হবে না?

নিশ্চয় হবে। শান্তনু বললে, কিন্তু দেখাশোনার ফলে যদি একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে দেখাশোনা অল্পই হওয়া ভালো, সুষমা!

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, ও পাড়ায় অন্তত আমাদের পক্ষে আর থাকা চলবে না, অন্যত্র ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যেতে হবে। সে আমি ব্যবস্থা করতে পারবো, তবে ঈশানীদিকে ব'লো,—আমি তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ রইলুম। তাঁর ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

তোমার কাছে আমারও ঋণ রয়ে গেল, সুষমা।

আমার কাছে? কিসের ঋণ?

তুমি আমার ব্যবহারের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি অনায়াসে ক্ষমা ক'রে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেলে, এর জন্য আমিও তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলুম।

সুষমা চুপ ক'রে রইলো। ছেলেমানুষের দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। কিন্তু কিছু বলবার আগেই ঈশানী এসে ঘরে ঢুকলো। তার হাতে মাঝারি বড় রকমের একটা সুটকেশ।

আহারাদি ও চা পান সেরে এক সময়ে সুষমা উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমি যাই।

ঈশানী বললে, এর মধ্যে?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বাইরে আছি, মা হয়ত ভাবছেন। সন্ধ্যের আগে না ফিরলে তিনি ভারি ব্যস্ত হন্।

মিষ্টকণ্ঠে ঈশানী বললে, ভারি আনন্দ হোলো তোমাকে দেখে। তোমার যে একটুখানি সুবিধে হোলো, এটা আরো আনন্দের কথা।—নন্দ ?

ডাক শুনে নন্দ এসে দাঁড়ালো। ঈশানী বললে, এটা গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়। তেওয়ারীকে বল্ দিদিমণিকে পৌঁছে দিতে।—সুষমার দিকে ফিরে সে পুনরায় বললে, এ সুটকেশ তোমার, সুষমা। ওর মধ্যে তোমার দিদির সামান্য কিছু উপহার এবং কিছু টাকা আছে, তুমি গ্রহণ ক'রো। তোমার চাকরি হোলো বটে, কিন্তু মেয়েমানুষের কত যে অসুবিধে, সে আমি জানি। তুমি যদি কোনোদিন কোনো বিপদে পড়ো, আমাকে ডেকো, আমার যথাসাধ্য সাহায্য তুমি পাবে।

শান্তনু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পিছনে।

ঈশানী পুনরায় বললে, হ্যাঁ, আরেক কথা। শান্তনু যে তোমার সঙ্গে এতটুকু বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রতারণা করেনি, এটি আমার জানা দরকার ছিল। আচ্ছা, এসো ভাই।

শান্তনু পিছনে পিছনে গেল সুষমাকে গাড়ীতে তুলে দিতে।

বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে অপলক চক্ষে ঈশানী ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছিল, ওরা বুঝতে পারেনি। গাড়ীতে উঠলো সুষমা, নন্দ সুটকেশটা রেখে দিল তার পাশে। তেওয়ারী দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। শান্তনু একটি কথাও বললে না। সুষমা মুখ ফিরিয়ে নিল। গাড়ী বেরিয়ে গেল ফটক পার হ'য়ে।

ঈশানীর চোখ দুটো ছল ছল ক'রে এলো। কুঁড়িটা শুকিয়ে গেল, ফুল ফুটলো না। প্রথম প্রণয়-চেতনার অপমৃত্যু !

চন্দ্র তার আপন কক্ষপথে বার বার ঘুরে গেছে। আবার এসে পৌঁছলো শুক্লপক্ষ।

শান্তনু সকালের দিকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে হয়ত সন্ধ্যায়।

গাড়ী সঙ্গে নেয় না, ওটা বন্ধন দশার সঙ্কেত। মুক্তির পথটা অবারিত না থাকলে তার চলে না। তার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া চলবে না, কোনওপ্রকার শাসনে সে ধরা দেবে না। উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে না পারলে শান্তনুর স্বস্তি নেই। নতুনের মধ্যে হোলো এই, শান্তনু মোটর ড্রাইভ করতে শিখেছে। আর কিছু না হোক, ঈশানীর সঙ্গে যদি তার বনিবনা না হয়, তবে মোটর ড্রাইভারি কাজ পাবে সে যেখানে-সেখানে। একশো টাকা মাইনে পাবে ফেলে-ছড়িয়ে। শান্তনু আর কাউকে পরোয়া করে না।

সুষমার চাকরি হয়েছে, রমেনবাবু এর মধ্যে কবে যেন জানিয়েছেন। প্রায় পৌনে দুশো টাকা মাইনে, পরে আরো বাড়বে। নতুন বাড়ীতে সুষমারা উঠে গেছে এবং বেশ মন দিয়ে চাকরি করছে। খবরটা সকলের পক্ষেই উৎসাহজনক।

রাত্রের দিকে রমেনবাবুর সঙ্গে ফোনে ঈশানীর আলাপ হচ্ছিল। কলকাতার 'শো'তে ঈশানী নামবে মাত্র এক দিনের জন্য। কিন্তু দিল্লী থেকে লোকেরা যে পীড়াপীড়ি করছে, তার উপায় কি? সেখানে একটি হাউস চারদিন ধ'রে 'শো' দিতে চায়,—পনেরো হাজার টাকা গ্যারাণ্টি। এ ছাড়া দিল্লীর সমস্ত খরচ, যায় রাহা খরচ পর্যন্ত। চারদিনে মোট চারটে পালা দিতে হবে। রমেনবাবু বললেন, তুমি রাজি হয়ে যাও। তুমি দেখে নিয়ো ব্ল্যাক মার্কেটে পর্যন্ত টিকিট বিক্রি হবে!

হঠাৎ বাঁশীর আওয়াজ শুনে ঈশানী টেলিফোন ধরেই একটু সজাগ হয়ে উঠলো। সন্দেহ নেই, শান্তনুর বাঁশী। আজ সারাদিন সে বাড়ী ছিল না, কখন ফিরেছে জানাও যায়নি। ঈশানী তাড়াতাড়ি বললে, আচ্ছা, রমেনবাবু, কাল আপনাকে ফাইন্যাল বলবো। আজ ছেড়ে দিচ্ছি।

রিসিভারটা রেখে ঈশানী উঠে এলো সোজা জ্যোৎস্নাহসিত বারান্দায়। এখানে দাঁড়ালে বিস্তৃত গগনলোক চোখে পড়ে। নিস্তব্ধ নয়, কোনো কোনো গাছে পাখী ডাকছে,—যাদের চোখে এখনও ঘুম আসেনি। নীচেকার পাঞ্জাবী পরিবার একটু আগে রেডিয়ো বন্ধ করে ঘুমোতে গেছে। নন্দ, রামতীরথ,

তেওয়ারী ইত্যাদি শুয়ে পড়েছে তাদের মহলে। ঈশানী চুপ ক'রে দাঁড়ালো। ঘর, বাড়ী, গাছপালা ছাড়িয়ে বাঁশীর মধুর তান ছুটে চলেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত। বাঁশী বাজাতে জানা এক বস্তু, কিন্তু তার স্থরের ভিতর দিয়ে নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ করা অন্য কথা। অন্তরের আদিম বেদনাকে প্রকাশ করার মীড়গুলি শান্তনু জানে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর মধ্যে যেন বন্য অনুরাগ, ওটা যেন পরিচিত সুর-শ্রেণীর বাইরে। মাঝে মাঝে একটা ধূয়ো ধরছে, সেটা পার্বত্য। দুঃখের দহনে জলে-পু'ড়ে না গেলে ওর বাঁশী বোঝা যায় না। অনেককালের অনেক কান্নাজর্জর হৃদয়ের হাহাকার না জানলে ওর বাঁশী ব্যর্থ।

ঈশানীর চোখে বাষ্প জমে উঠলো।

কিন্তু তার সজাগ মন, সে-মন ভাবস্রোতে ভাসা নয়। নিজের পদক্ষেপ সে গুণতে জানে,—ভ্রান্ত পা ফেলা নয়! তার নাচের অভ্যাস তাকে নিরাপদ এবং সঠিক পা ফেলতে শিখিয়েছে। পা শিথিল নয়, বরং অতি সতর্ক। নিজের হৃদয়াবেগ তার করায়ত্ত। এই পর্যন্ত, এর বেশী নয়,- -এই তার মূলমন্ত্র। সুতরাং নিজের সম্বন্ধে তার যেমন ভয় নেই, অন্যকেও তেমনি সে ভয় পেতে দেয় না।

ঈশানী ধীরে ধীরে পা বাড়ালো—যেদিক থেকে শান্তনুর বাঁশী শোনা যাচ্ছিল। নীচের সকল ঘর শূন্য, কোথাও নেই শান্তনু। ঈশানী ছাদের সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে গেল। সংশয় শঙ্কা সঙ্কোচ,—কোনোটাই তার পা জড়িয়ে ধরে না। নির্ভয় সে, সে অভয়মন্ত্র জপ করেছে চিরদিন। ভয়কে সে দেখেছে, জেনে এসেছে। অপমৃত্যু কা'কে বলে সে জানে। আপন মৃত্যু দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বারম্বার। এই জ্যোৎস্নার সোমরসধারা তার অস্থিমজ্জার মধ্যে নিবিড় বিহ্বলতা এনেছে কতবার; সুখের কান্নায়, দুঃখের আনন্দে তার এই বিবশ শিথিল তনুলতা লুটিয়েছে ভূমিতলে, বেদনা আর দুঃখের মধ্যেও শিহরণ লেগেছে পুলকের, বুকের মধ্যে তা'র কাঁপন লেগেছে ভূমিকম্পের। তার সমগ্র সত্তা দেহের বাঁধন ডিঙ্গিয়ে পাখীর মতো অপ্সরা লোকে উধাও হয়ে গেছে, নূপুরের মতো মৃত্যু নেচেছে তার দুই চরণে। দেখেছে সে নিজের সেই অপরূপ রূপ। দেখেছে সে নিজের অভিসম্পাত!

কতক্ষণ পরে শান্তনুর বাঁশী থামলো। যক্ষবিরহীর চোখের ওপর দিয়ে মেঘের দল ভেসে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, আকাশে এনে দিচ্ছে একটা ধূসরতা,—যেটা বিভ্রম লাগায় কাকজ্যোৎস্নার। রজনীগন্ধারা যার সন্ধান পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে জাগে। শান্তনু বাঁশী নিয়ে একবার চুপ ক'রে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এলো ঈশানী। শান্তনু চমকে পাশ ফিরলো।

তুই? এখনো জেগে?

ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, এমন ক'রে বাঁশী বাজালে বিছানায় কেমন ক'রে স্থির থাকি?

শান্তনু সলজ্জভাবে বললে, অনেক দিন বাজাইনি। তোরা ত' নাচ গান বাজনা নিয়ে থাকিস, আমি কত সামান্য। আমার নিজের পরিচয় কিচ্ছু নেই।

ঈশানী বললে, আছে, কিন্তু তুই টের পাসনে।

শান্তনু মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

ঈশানী বললে, হৃদয় ব'লে তোর কোনো পদার্থ নেই। যেভাবে তুই সুষমাকে বিদায় দিয়েছিলি, পৃথিবীর কোনো পুরুষ তেমন ক'রে অনাঘ্রাত ফুলকে অবহেলায় সরিয়ে দেয়নি কোনোদিন। মেয়েমানুষের সব অহঙ্কার তোর সামনে ঘুচে গেল।

কিন্তু আমার এ পরিচয়টা কি ভালো?—শান্তনু শুনতে চাইলো।

ভালো-মন্দ আমি জানিনে। তুই খেলতে ব'সে খেলা দেখিস শুধু, খেলায় মাতিসনে। তোর জন্যে যদি কারো বুক ভেঙ্গে যায়, তুই দেখতে পাস তার মধ্যে জীবনবিধাতার কৌতুক। তোর জন্যে কারো চোখের জল পড়লে তুই পাস একটা অদ্ভুত রস। কেউ ভালোবাসলে তুই সেটাকে বন্ধনদশা মনে করিস; ভালোবাসা না পেলে তুই ছুটিস তার পিছু পিছু। তুই কেবল ভালোবাসিস নিজেকে, তাই পদে পদে আঘাত বাঁচিয়ে চলিস। আনন্দ গ্রহণ করিস শুধু, কিন্তু দান করিসনে। রসের কল্পনায় তুই অভিভূত হয়ে যাস, কিন্তু গা ভাসাতে ভয় পেয়ে যাস রসের প্লাবনে। তোকে নিয়ে কি করি বল্ ত?

মুখ তুললো ঈশানী। ধবধবে শাদা শাড়ী আর শাদা জামা তার পরনে, এলোচুলের রাশি পিঠের দিকে হাওয়ায় উড়ছে, মুখখানা যেন মধুলাবণ্যের

মরণশয্যা,—আয়ত দুটি নিমীলিত চোখ যেন অচেতন দুটি ভ্রমরের মতো গভীরের দিকে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সেই দিকে অপলক চক্ষে তাকিয়ে শান্তনু মৃদুগলায় বললে, কি ইচ্ছে তোর? কেন আমাকে এমন ক'রে ধ'রে রেখেছিস, সত্যি ক'রে বল্ দেখি?

তোকে যেতে দেবো না।

কেন? কোন্ অধিকারে তোর এখানে থাকবো?

ঈশানী ব'সে পড়লো। বললে, অধিকার যদি না থাকে, তুই সৃষ্টি ক'রে নিতে পারবিনে?

শান্তনু একটু থেমে বললে, তোর একথার রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ঈশানী। আমাকে এমন ক'রে কাঁপিয়ে তুলিসনে। তোর সমস্ত জীবনের আবরণ সরিয়ে তুই বাইরে এসে দাঁড়া, তোকে ভালো ক'রে দেখতে দে,—আমাকে এমন ক'রে অস্থির করে তুলিসনে?

ধরা গলায় ঈশানী বললে, কি জানতে চাস তুই?

তোর অস্থিমজ্জা মেদ মাংস, তোর প্রতি রক্তকণা, প্রতি অণুপরমাণু,—না জানলে আমি স্থির থাকতে পারছিনে। তুই নিজেকে প্রকাশ কর, সমস্ত আবরণ ঘুচিয়ে দে। অন্ধকার সরে' যাক, আলো জ্বলে উঠুক।

ঈশানীর গলার আওয়াজ এবার কেঁপে উঠলো। বললে, সব জানবার পর তুই যখন কেবল ঘৃণা রেখে চ'লে যাবি, আমি সেই বোঝা বয়ে বেড়াবো চিরদিন?

শান্তনু ওর কাছে এসে বসলো। বললে, ছি ছি, এর চেয়ে আমাকে ধিক্কার দে তুই। আমার হাত থেকে এত বড় অবিচার পাবার আগে তোর যেন মৃত্যু হয়। এ সব তুই কি বলছিস্?

ঈশানী আঁচলে চোখ মুছলো। পুনরায় কান্নাজড়ানো কণ্ঠে সে বললে, মানুষের অবিচার আমার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, কিন্তু দীন-দুঃখী হতভাগীর রূপটাই কি শুধু তার পুঁজি, ওটাই কি তার শেষ কথা? আমার অনেক আছে, তবে কেন উপবাস ক'রে মরতে বসলুম, একথার জবাব কেউ দেয় না।

শান্তনু বললে, আমি তোর কোন্ কাজে লাগতে পারি বল্ ?

ঈশানী বললে, তোকে এনে বসিয়েছি তোর পায়ে মাথা খুঁড়বো ব'লে। তুই ভেঙ্গে দে সব—আমার আশ্রয়, সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, আমার সব বাঁধন। আঘাত করতে যেন তোর হাত না কাঁপে, দয়া-মায়া বিবেচনা কোনো কিছু যেন তোর নির্দয় মনকে আচ্ছন্ন না করে। দড়িদড়া টান মেরে ছিঁড়ে তুই আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দে, আমার মুক্তি হোক।

পুরুষের নৈতিক দায়িত্ব শান্তনু ভোলেনি। জ্যোৎস্নাজড়ানো এই মায়াকাননে অবলুণ্ঠিত এই অপ্সরার বিহ্বল তনুলতার দিকে চেয়ে সে নিজেকে সংযত ক'রে রাখলো কঠিন বাঁধনে। শুধু বললে, কিসের থেকে মুক্তি চাস তুই ?

ছাদের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে ঈশানী বললে, লোহার শেকলে আমি বাঁধা, তুই সে-বাঁধন খুলে দে। আমার বিশ্বাসের হাত থেকে আমি মুক্তি চাই, আমার অতীত জীবনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলে পালাতে চাই।

শান্তনু চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললে, এবারে ওঠ্, ঈশানী, —অনেক রাত হয়েছে।

আগে তুই কথা দে ?

দিলুম।

কথা দে আমি যেখানে তোকে নিয়ে যাবো, তুই যাবি ?

শান্তনু বললে, সে আবার কোন্ চুলোয় ?

ঈশানী বললে, যেখানে আমার মৃত্যু হয়েছে। যেখানকার চিতার আগুনে আমার ইহকাল পরকাল জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শান্তনু এতক্ষণে হাসলো,—রাহা খরচ পেলে সেখানে যেতে রাজি আছি !

৬

কে না জানে মানব বংশপরম্পরায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনের কাহিনী প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতের অন্ধকার অবলুপ্তির পথে বিলীন হয়ে চলেছে! সভ্যতার ইতিহাস মানেই ত' মানুষের গল্প। সেকথা ঈশানী-শান্তনু জানে বৈ কি। বিবর্ত্তনে, ইতিহাসে, পুরাণ-মহাকাব্যে,—সর্বত্র জীবনেরই জালবোনা। মানুষেরই কাহিনী লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হাজার হাজার বছর ধ'রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত। ঈশানী-শান্তনু হোলো তারই ছোট ছোট ক্ষুদ্র অংশ।

কিন্তু বছর দশেক আগে বাঙ্গলার অতি দুর্গতি-দুর্দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে যে ভিন্‌দেশী তরুণ যুবকটিকে গ্রামের পথে প্রথম দেখা গিয়েছিল, সে শান্তনু নয়, ভিন্ন ব্যক্তি। ছেলেটি অতি প্রিয়দর্শন এবং স্বাস্থ্যবান সুকুমার। জাতিতে বাঙ্গালী, কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে মানুষ, বাঙ্গলায় এসেছে এই প্রথম। ফলে, তার চোখে বাঙ্গলার গ্রামের শোভা অনন্ত বিস্ময় নিয়ে হাজির হয়। তাল-তেতুল-নারিকেল কুঞ্জ দেখে সে যেখানে সেখানে থমকে দাঁড়ায় স্থির হয়ে; বিস্তৃত দীঘি আর সরোবরের স্বচ্ছ শান্ত জলরাশির উপর শ্বেত ও রক্তিম পদ্মের অজস্র সৌন্দর্যের উপর দিয়ে রঙ্গীন প্রজাপতিরা যখন নৃত্য ক'রে বেড়ায়, ছেলেটি হতবুদ্ধির মতো চেয়ে থাকে। গাঙ-চিল আর মাছরাঙ্গারা ঘুরে বেড়ায়, বাবুই পাখীরা বাসা বাঁধে, দোয়েল শ্যামা পাপিয়ার নিত্য কূজন গুঞ্জন, নৌকায় মাঝির গান, বাউলের একতারায় ঝুমুর নাচ, মাঠে মাঠে তার সবুজ পশমের আস্তরণ, বন-বাগান-আম্রকুঞ্জ,—সমস্তটা মিলিয়ে ছেলেটি যেন বিস্ময়-বিমূঢ়। কিন্তু এই ছেলেটির সর্বাঙ্গে সামরিক পোষাক দেখে গ্রামের লোক কাছাকাছি আসতে চায় না। ওই পোষাকটাই ছিল গ্রামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার পরিচয়ের পক্ষে প্রধান বাধা। ছেলেটিও একথা বুঝতো ব'লেই সে দূরে-দূরে স'রে থাকতো।

প্রকাণ্ড মাঠের অপর প্রান্তে মিলিটারীর মস্ত তাঁবু পড়েছিল। গত যুদ্ধের কালে সীমান্ত প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গলার সর্বত্র প্রতিরোধ রক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করা হয়েছিল, বিশেষ ক'রে দক্ষিণ-পূর্বে যেদিকে সুন্দরবনের পরিপার্শ্ব। এই তাঁবুটিও তারই একটি অংশ। মস্ত একটি মাঠ ঘেরাও ক'রে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল। এখানে থাকতো বড় রকমের একটি দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। রসদ সরবরাহ করা এবং বার্তাবহন—এই ছিল এদের প্রধান কাজ। সুতরাং যুদ্ধের গতি-প্রগতি ও যুদ্ধপ্রচেষ্টার অন্যান্য নিত্যকর্ম নিয়ে এই তাঁবুর সামরিক লোকেরা নিয়ত কর্মব্যস্ত থাকতো। ওই ছেলেটি ছিল এই সামরিক তাঁবুরই একজন কর্মচারী ; এখানকার কোম্পানীর ক্যাপ্টেনের একজন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌। কিছুদিন হোলো সে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। খবরবার্তা নিয়ে ট্রাকে ক'রে তাকে অনেক সময়ে কলকাতা কেন্দ্রে যেতে হোতো, এবং ওই তাঁবু থেকে রসদ-সম্ভার সহ প্রকাণ্ড কন্‌ভয় তাকে ছাড়তেও হোতো। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ যুবকটি যে কারণেই হোক না কেন, প্রিয় ছিল সকলের।

সমগ্র বাঙ্গলা দেশের জীবনের উপর দিয়ে তখন অতিশয় দুঃসময় চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিক মন-কষাকষির সংবাদ শোনা যাচ্ছিল।

এমনি সময়টায় কয়েক দিনের জন্য ক্যাম্পে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। কলকাতায় মিলিটারী লরীব্যূহের উপর জনতার প্রবল আক্রমণের ফলে সরবরাহ ব্যবস্থাটা দিনকয়েকের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন গ্রামের উপরে এই তাঁবুর সামরিক লোকেরা হানা দিয়ে খাদ্যসম্ভারগুলি লুটপাট করতে থাকে। এ সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবার অধিকার জনসাধারণের তখন ছিল না। ফলে, আশপাশের গ্রামে অরাজকতা দেখা দেয় এবং কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা ভয় পেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকে। অবস্থা যখন চরমে ওঠে, সেই সময় একদিন কোম্পানীর ক্যাপ্টেন তাঁর সহকারীকে গ্রামের থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য আদেশ করেন। এই যুবকের প্রতি সেই কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হোলো। কিন্তু সামরিক পোষাকটা যে মস্ত বাধা। সুতরাং সেই পোষাক পরিত্যাগ ক'রে

সিভিল পোষাকে এই যুবকটি গেল মাঠ পেরিয়ে গ্রামের দিকে। যে-চণ্ডমূর্তির উগ্রতা ছিল তৎকালীন সামরিক পোষাকে, সেটি পোষাক পরিবর্তনের সঙ্গে সুকোমল হয়ে এলো। আল্‌গা পায়জামা এবং একটি ছিটের শার্ট প'রে এই প্রিয়দর্শন তরুণ গ্রামের চিত্তজয় করার জন্য এগিয়ে গেল। সমগ্র পল্লীজগতের অভিশপ্ত আবহাওয়ার মাঝখানে এই যুবক সেদিন এসে দাঁড়ালো যেন অনেকটা আশীর্বাদের মতো। মাঠের এ পারে এই অপরিচিত গ্রামটিতে সে আসেনি কোনোদিন। সে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো একেবারে হাটতলায়।

আশেপাশে কাঁচা-পাকা বাড়ী, কোথাও একটি ছোট ডিস্‌পেনসারী, কোথাও মুদি-মনোহারীর দোকান, কোথাও দড়ি ও তামাকের আড়ং, কোথাও বা সরকারী রেশনের সাব-অফিস। অদূরে একটি খোলা মাঠে পুকুরের ওপারে ছোট একটি বালিকা-বিদ্যালয়। সেখানে মেয়েমহলে খুব কলরব চলছে। কি একটা পর্ব উপলক্ষে স্কুলের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কা'রো কা'রো কথায় বুঝতে পারা গেল, এ গ্রামেও হিন্দু-মুসলমানের মন-কষাকষি চলছে। কবে আগুন জলে' ওঠে, তার ঠিক নেই।

ছেলেটির সঙ্গে ছিল জনচারেক মিলিটারী শ্রমিক। কিন্তু তারাও শাদা পোষাকে এসেছে। হাটতলায় ঘুরে ঘুরে এখান ওখান থেকে বহু পরিমাণ সব্জি ও অন্যান্য সামগ্রী তারা সংগ্রহ করলো। টাকা ছিল ওদের কাছে প্রচুর। সুতরাং চড়া দাম দিয়ে ওরা হাট থেকে যে সামগ্রী সম্ভার কিনলো, চারজন শ্রমিকের পক্ষে সেই বোঝা বহন করা সম্ভব নয়। তখন শীতকাল। শীতের তরি-তরকারী ওরা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করলো।

হাটের লোকের সহায়তায় ওরা খানতিনেক গরুর গাড়ী মোতায়েন করলো। ওরা নাকি মিলিটারীর ঠিকাদার, এসেছে কলকাতা থেকে। পেঁয়াজ, আলু, কপি মূলা ছাগল মুরগী ঘি-মাখন লবণ—যা কিছু ছিল হাটতলায়, সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গেল। ওরা টাকা ছড়িয়ে গেল অজস্র।

গাড়ী ছাড়তে মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেল। ওরা গেল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে। যুবকটি হাটতলায় এক ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু জলখাবার খেতে বসে' গেল।

চার পাঁচ মাইল হেঁটে তার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। জলযোগ সেরে সে আবার বেরিয়ে পড়লো।

একটি লোক তামাক কিনতে বেরিয়েছিল, ছেলেটিকে সে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল। সামনেই প্রাচীন রুদ্রেশ্বরের ভগ্ন মন্দির, সেখানে এক বাউলের গানের আশেপাশে কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছে। ছেলেটা থমকে সেখানে একবার দাঁড়ালো। যেখানে যা কিছু নতুন, ছেলেটার কাছে তাই যেন বিস্ময়। এমন সময় সেই লোকটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে গায়ে প'ড়ে আলাপ করলো, কোথায় থাকা হয়, বাবা? বাড়ী কোথায়?

পাশ ফিরে ছেলেটি ওকে দেখে বললে, শাহারাণপুরের দিকে।

উচ্চারণটা একটু অবাঙ্গালীর মতো। কিন্তু কণ্ঠের এমনই মিষ্টতা যে লোকটি আকৃষ্ট হোলো। বললে, এ মন্দিরটি অনেককালের বাবা। রাজা দীপেন্দ্র-নারায়ণের আমলের, সিদ্ধপীঠের জায়গা। শিবরাত্তিরে এখানে মস্ত মেলা হয়। তুমি কি করো, বাবা? এদিকে কেন?

তরুণ ছোকরা সত্যভাষণ করতে পারলো না, কারণ এখানে আবার একটা আন্দোলন উঠতে পারে। বললে, আমি ঠিকাদারের লোক, ক্যাম্পে মাল সাপ্লাই করি।

বেশ ত, তা দুচার পয়সা পুজো দিয়ে যাও না বাবা রুদ্রেশ্বরের দরজায়? দাঁড়াও ঠাকুর মশাইকে ডেকে দিই।

লোকটা নিজের উৎসাহেই পুরোহিতকে ডেকে দিল। পুরোহিত মশাই বেশ সৌম্যকান্ত। চেহারাটা প্রৌঢ়। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, এসো বাবা এসো। বাঃ এমন চেহারা এ তল্লাটে ত কোথাও নেই? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

দু'চারজন এসে আশেপাশে জড়ো হোলো। ছেলেটির পরিচয়াদি নিল সবাই। পশ্চিমঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের ছেলে, কিন্তু তার পিতৃপুরুষরা একশো বছর আগে বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ ক'রে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে চ'লে যায়। বাঙ্গলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একেবারেই নেই।

ছেলেটি যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। মুখে মিষ্ট হাসি লেগেই আছে।

নাটমন্দিরের পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধা, তিনি জপ্‌ আহ্নিক সেরে উঠে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, বাবা, অত দূর থেকে এসেছো, আমাদের ওখানে ডাল-ভাত যা হয়েছে এক মুঠো খেয়ে যাও।

সকলেই একবাক্যে সায় দিলো। বৃদ্ধা হচ্ছেন রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে নাতনী। সুতরাং তাঁর অনুরোধ অমান্য করা চলে না। অবশেষে ছেলেটিকে এনে হাজির করা হোলো এক ভগ্ন জরাজীর্ণ অট্টালিকার এক প্রেতপুরীর একাংশে।

একখানা ঘর আর একটু দরদালান, সেটি রান্নাবান্নার জায়গা। সামনে পুরোনো ইটের স্তুপ, সাপখোপের কায়েমী আড্ডা। দালানের পাশ দিয়ে পানাপুকুরের পথটা চ'লে গেছে! বৃদ্ধার সঙ্গে যুবকটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো, ভিতরে একখানা তক্তার বিছানায় এক ভদ্রলোক শুয়ে। বৃদ্ধা বললেন, ওটী আমার ছোট ভাই, বুঝলে বাবা,—ওর নাম উপেন। বাপের বংশে একে একে সবাই গেছে, আমরাই দু'জন আছি। আমার ভাইটি বাতের ব্যামোয় উঠতে পারে না। তোমার নামটি কি, বাবা?

ছেলেটি মিষ্ট ভাষণ ক'রে বললে, আমার নাম অরুণ।

বেশ, বেশ, আমার রান্নাবান্না সব তৈরী। রোজই এমন সময় একটা ডুব দিয়ে মন্দিরে গিয়ে জপ ক'রে আসি, তাই আজ তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। বসো বাবা এই চৌকিখানার ওপর। বংশের নাম-ডাকই আছে, ঘর-দোর ত তেমন নেই।

বাইরে এই সময় একটু সাড়াশব্দ শোনা গেল, এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটি বালিকার দীর্ঘ মিষ্ট কণ্ঠ কানে এলো, পিসিমা?

একটি মেয়ে ছুটে আসছিল বনহরিণীর মতো। কিন্তু সামনে একটি রূপ-কুমারকে দেখে হতচকিত হয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম।

মেয়েটির বয়স আন্দাজ সতেরো, বড় সুশ্রী মেয়ে। রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের এই জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষের সমস্ত বন্য গন্ধ নিয়ে তার স্বভাবটি তৈরী। চঞ্চল

চোখের অবাধ্য দুটি তারকা ছেলেটিকে দেখে স্থির হয়ে গেল। সর্বনাশীর প্রথম মৃত্যু হোলো প্রথম পলকে।

অরুণ বিস্ময়াহত চক্ষে মেয়েটির দিকে তাকালো।

পিসিমা বেরিয়ে এলেন। বললেন, পোড়ারমুখি, সেই কোন্ সকালে গেছিস ইস্কুলে, একেবারে বেলা কাবার ক'রে ফিরলি? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই,—আজ না ইতুসংক্রান্তি?—এই দ্যাখ্, নতুন অতিথি আমাদের বাড়ীতে!

কাছে এসে চাপাকণ্ঠে মেয়েটি বললে, ও কে, পিসিমা?

পিসিমা বললেন, ছেলেটিকে ডেকে এনেছি আমাদের এখানে। বাইরে থেকে এসেছে, রোদ্দুরে ঘুরে হয়রাণ। আমাদের এখানে দুটি খাবে। এই যে বাবা, এটি আমার ভাইঝি,—ওই উপেনের শেষকুড়ন্ত মেয়ে। আহা, পর পর তিন চারটি গেল, এর মাকেও ধ'রে রাখতে পারলুম না,—সিঁথের সিঁদুর নিয়ে আমাদের ফেলে সেও চ'লে গেল। এই মেয়েটিকে নিয়েই আছি,—শিবরাত্রির শল্‌তে। এর নাম মাধু, বাবা।

ঘরের বিছানা থেকে উপেন বললেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও, দিদি।

এই যে, দিই—পিসিমা সজাগ হলেন,—আহা, ছেলে ত নয়, ময়ূরছাড়া কার্তিক! কোন্ ভাগ্যিধরী তোমাকে পেটে ধরেছে বাবা! আমাদের ঘর আলো হয়ে উঠেছে। নে মা, হাত-পা ধুয়ে একটু দেখাশুনা কর দিকি। আসন পেতে দে, জল দে।

মাধুর যেন হাত-পা আসছে না। সে ছুটে গেল পুকুরঘাটের ওদিকে, কিন্তু আড়ালে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালে। সমস্তটা যেন দুলছে, পা দুটো যেন কাঁপছে। অরুণ হতবুদ্ধির মতো তার প্রতি নিমেষনিহত চক্ষে তাকিয়েছিল, সে জন্য মাধুর সর্বশরীরে যেন যন্ত্রণা ধ'রে গেছে। এবার যেন কোনোমতেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পা সরছে না। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেটাকে না দেখেও তার স্থির থাকার উপায় রইলো না। শান্ত নদীর উপর হঠাৎ উঠলো তুফান, হঠাৎ উঠলো ঝড়, হঠাৎ যেন ভূমিকম্প।

উপেনবাবু আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এলেন। মিষ্ট কণ্ঠে আলাপ করতে বসলেন অরুণের সঙ্গে। তাঁদেরই স্বশ্রেণী, একই ঘর, উভয়েই কুলীন। কিন্তু অরুণ অতশত জানে না। তার বাবা জীবিত, তিনি একজন বড় ডাক্তার, বাড়ীতে মা আছেন। ভাই-বোনেরা খুবই শিক্ষিত। বনেদী ঘর। অরুণ বললে, আমি বাঙ্গলা দেশে কখনও আসিনি, এই প্রথম। আপনাদের এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগছে।

কথার টানটা তার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, ভাষাটা তার দুরস্ত নয়। আড়াল থেকে মাধু হেসে একেবারে লুটোপুটি। ও না বাঙ্গালীর ছেলে, মাতৃভাষাও শেখেনি। কিন্তু ভাঙ্গা বাঙ্গলা হ'লেও গলাটি ভারি মিষ্টি! আশ্চর্য, পুরুষ মানুষ এত সুশ্রী হয়? অমন লম্বা-চওড়া সুন্দর স্বাস্থ্য, অমন বলিষ্ঠ, কিন্তু কী লাবণ্য সর্বাঙ্গে। মাধু যেন অভিভূত দৃষ্টিতে তাকালো।

উপেনবাবু বললেন, তুমি এতটুকু বয়সে ব্যবসায়ে নেমেছ, কিন্তু এ দেশের হাঙ্গর-কুমীরদের সঙ্গে পেরে উঠবে কি?

অরুণ তার স্বভাব সারল্যের জন্য এবার আর কোনোমতেই নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারলো না। ব'লে ফেললো, দেখুন, আমার কথাটা ঠিক বলা হয়নি। এ দেশে মিলিটারীকে সবাই ঘেন্না করে, ভয় পায়—তা ছাড়া গোরা সাহেবরা অনেক অনাচারও করে,—সেজন্যে মিলিটারীর লোকদের কোনো আদর নেই। আমি হলুম চড়কডাঙ্গার তাঁবুর একজন মিলিটারী লেফ্‌টেন্যাণ্ট্। আমার 'কসুর' মাপ করুন।

পিসিমা ও উপেনবাবু একটু ভীত হলেন। বললেন, আমরা মিলিটারীর নাম শুনেই কেঁপে মরি, কিন্তু ওদের দেখিনি কখনো। তোমাকে দেখে ত' আমাদের ভুল ভাঙ্গলো, বাবা। মিলিটারীর মধ্যে ভদ্রঘরের ছেলেরাও থাকে, এই প্রথম জানলুম।

অরুণ খুব হেসে উঠলো। আড়ালে দাঁড়িয়ে মাধু খুব হাসছিল। এবার পিসিমার ডাকে তাকে কাছে আসতে হোলো। সে ঠাঁই ক'রে দিল, জল এনে

রাখলো, আসন পাতলো। কিন্তু এইটুকুতেই সে রুদ্ধশ্বাস। অধীর উত্তেজনায় সে ঠক্ ঠক্ করছিল।

পিসিমা ভাতের থালা এনে সামনে দিলেন। পরে বললেন, তোমার বিয়ে থা' হয়েছে, বাবা?

আজ্ঞে না—অরুণ জবাব দিল।

পিসিমার সঙ্গে উপেনের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল। ওরা কেউ লক্ষ্য করলো না, জীবন-বিধাতা অন্তরীক্ষে কৌতুক বোধ করলেন। পিসিমা পুনরায় বললেন, আমাদের বাবা এইটুকুই ঘরকন্না। বিঘে পঞ্চাশেক জমি-জায়গা এখনও আছে, আর এদিক ওদিক কিছু কিছু আদায়-তশীল হয়। জেলা বোর্ড থেকে উপেন কিছু কিছু পায়,—ব্যস, ওই ভরসা। এই মেয়েটার একটা জোড়া গাথা কিছু হয়ে গেলেই আমরা নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। মাধু এবার একটা পাস করবে।

আঃ পিসিমা,—অদূরে দাঁড়িয়ে মাধু চাপাকণ্ঠে পিসিমাকে শাসন ক'রে দিল।

পিসিমা বললেন, ওমা, তা'তে কি হয়েছে। অরুণ হোলো আমাদের স্বঘর, ঘরের ছেলে বলতেও দোষ নেই। আর তাও বলি বাবা, মাধুকে নেবার জন্যে বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে।

পিসিমা, তুমি থামবে কি?—মাধু চেঁচালো।

শ্রীমান্ অরুণ নতহাস্যে খেয়ে যেতে লাগলো। পিসিমা সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বললেন, অবিশ্যি সে কথা সত্যি, যার হাঁড়িতে যে চা'ল দেয়, ভবিতব্যই হোলো আসল কথা। কে জানে বাবা, তোমার মা-বাবা খবর পেয়ে হয়ত দৌড়ে এসে হাজিরই হবেন। মেয়ে সুন্দরী হ'লে সব জায়গাতেই আদর। মাধু, তুই বল্ না মা, লেখাপড়ায় আর গান-বাজনায় ইস্কুল থেকে ক'বার যেন পেরাইজ পেয়েছিলি?

মাধু সেখান থেকে একবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

আহারাদি সেরে সেদিন অরুণ বিদায় নিল। কিন্তু যাবার সময় পিসিমা মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন, আবার কবে আসছ ব'লে যেতে হবে, বাবা। এক দিনেই

তোমার ওপর যেন কতদিনের মায়া প'ড়ে গেল। .কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ, পথের ধারে মাণিক কুড়িয়ে পেলুম। মাথার দিব্যি, অরুণ—কাল তোমাকে আবার আসতেই হবে, কেমন ?

অরুণ হাসিমুখে বললে, আমাদের ক্যাপ্টেনের হুকুম না পেলে ত' আসতে পারিনে ? তবে মালপত্র কিনতে আবার দু' এক দিনের মধ্যেই হয়ত আসতে হবে।

পিসিমা ব'লে দিলেন, বাবা অরুণ, মিলিটারীতে না হয় কাজ নিয়েছো, কিন্তু যুদ্ধ ত থেমে গেছে। আবার যুদ্ধ বাধলে তুমি বাবা মারধোর এড়িয়ে থেকো। যুদ্ধ আজ আছে কাল নেই, ওসব ত' মাথা গরমের ব্যাপার। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের। কাল থেকে তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

বিদায় দিয়ে পিসিমা হাসিখুশী মুখে ভিতরে এলেন।

মাধু কোথায় যেন আড়ালে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। অরুণের যাবার পথে হঠাৎ বেরিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো। জড়িত কুণ্ঠিত লাজনম্র কণ্ঠে শুধু বললে, ঠিক আসবেন কিন্তু।

অরুণ বললে, তুমি ত' কথা বললে না, কেন আসবো ?

হ্যাঁ, আমি বলেছি, অনেক কথা বলেছি, আপনি শুনতে পাননি।

ওইটুকু কথা বলতে গিয়েই পোড়ারমুখী হাঁপিয়ে উঠলো, কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট। মাধু অধীর আবেগ আর অসহ্য আনন্দ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

অরুণ তা'র দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ, তারপর হন হন ক'রে নিজের পথে চ'লে গেল।

এই ছোট্ট কাহিনীর পিছনে দুটি রাজনীতিক আবর্তনের কথা লুকিয়ে ছিল। একটি হোলো সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম, অন্যটি যুদ্ধের অবসান। সমগ্র বাঙ্গলায় একদিকে অরাজকতার হাওয়া বইতে সুরু করেছিল, অন্যদিকে শোনা যাচ্ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীনতার কথাবার্তা।

চারদিকে হুজুগ শোনা যাচ্ছিল, সৈন্য-বিভাগে ও নৌ-বিভাগে নাকি অন্তবিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। গভর্ণমেণ্ট তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করছেন।

দিন কয়েক চ'লে গেল।

এ বাড়ীতে অরুণ এসেছে আরো তিনচার বার। উপেন আর পিসিমা অরুণের মিষ্ট ব্যবহার এবং বিনয়নম্র আলাপে মুগ্ধ। অরুণ তার মা-বাবার কাছে চিঠি দিয়েছে। উপেনবাবু ধ'রে নিয়েছেন অরুণের হাতে মাধুকে তিনি নিশ্চিত তুলে দিতে পারবেন। পিসিমা বিশ্বাস করেন, আগামী ফাল্গুনের মধ্যে এ বিবাহ হবেই হবে। মাধু নিভৃতে ব'সে অরুণের সঙ্গে গল্প করে, অরুণ ওকে বিবাহ করবে।

অরুণকে আসতে হয় এ গ্রামে হু' এক দিন বাদে-বাদে। পনেরো দিন আগে প্রথম আলাপ, কিন্তু এর মধ্যে পাঁচ ছ'বার সে এসেছে। পিসিমা অতি পুলকিত, উপেনবাবুও উৎসাহিত। মাধু অরুণকে নিয়ে এই ভগ্ন অট্টালিকারই এদিক ওদিক দেখিয়ে শুনিয়ে বেড়ায়। এখানে ঠাকুর দালান ছিল, ওখানে ছিল ঘোড়াশালা, এটা বরকন্দাজদের আড্ডা, ও জায়গাটায় ছিল সেরেস্তা। প'ড়ো ঘর, ঝুপসি,—চামচিকে আর বাদুড়ের স্থায়ী বাসা। ওদিকে ছিল মেয়েমহল, সেখানে এখনও সোঁদা সোঁদা বুনো গন্ধ। ভাবী স্বামীর হাতখানা মাধু ধরে ভয়ে ভয়ে।

এদিক থেকে পিসিমা ভগ্নস্তূপের জটলার পাশ দিয়ে ওদের ঘনিষ্ঠতা দেখে বড় আনন্দ পান। কী ছেলেমানুষ ওরা দুজন। এলোমেলো অকারণ আলাপে কী আনন্দ ওদের! ওরা গল্প করতে করতে সাতমহলা ভগ্নাবশেষের আশেপাশে মিলিয়ে যায়। দেশের এই দুর্দিনে ভগবান যদি এ পরিবারটির দিকে মুখ তুলে তাকান্। আনন্দে পিসিমার চোখে জল আসে। উপেন ভাবেন, স্বর্গতা পত্নী যেন ওদেরকে আশীর্বাদ করেন।

এমনি সময়টায় সহসা একদিন এই গ্রামেরই আশেপাশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে' উঠলো। কাটাধানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের চাষীর মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ বেধে ওঠে, এবং সেখানে কয়েকজন হতাহত হয়।

সেই দুর্ঘটনার সংবাদ দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো মাত্র ঘণ্টা দুই। গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হোলো। কিন্তু শান্তি কমিটীর লোকেরা সেই আগুন নেভাতে পারলো না।

হাটতলায় লোকজন নেই, দোকানদানি বন্ধ, প্রাণভয়ে চৌকিদার পালিয়েছে, পুলিশের থানা এখান থেকে দু মাইল। এ গ্রাম ছেড়ে বহু লোক প্রাণ বাঁচিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে নানাদিকে। রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে পাহারা দেবার মানুষ নেই।

অরুণ আসেনি গত কয়েক দিন। অস্থির উদ্বেগে দিনে রাতে সবাই প্রহর গুণছে। রাত্রে বাবা ও পিসিমা নিঃসাড় হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে; এদিকে এক পাশে মেঝের বিছানায় শুয়ে অন্ধকারের দিকে দপ দপ ক'রে মাধু চেয়ে থাকে। চারিদিকের এই প্রেতপুরীর ইটকাঠের জটলার আনাচে কানাচে তার ব্যাকুল প্রাণ আহত প্রতিহত হয়ে কেবলমাত্র দুই চোখের ঘনকৃষ্ণ তারকায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেন জীবনজোড়া বিপ্লবের দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অরুণ আসছে না কেন?

একটি ভয়ত্রাতা যুবকের আগমন প্রতীক্ষায় নিরুপায় একটি ক্ষুদ্র পরিবার মৃত্যুভয়ভীত চক্ষে পথের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে রইলো।

অরুণ কোথায়! অরুণের কোনো সংবাদ নেই!

চারদিক থেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর রটতে লাগলো। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গরোধ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট নাকি হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামের পক্ষপাতী। কিন্তু দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই রাজনীতিক অবস্থার চুলচেরা বিচার করার মতো মানুষ পাওয়া গেল না।

প্রায় তিনদিন পর্যন্ত গ্রামের শান্তি কমিটি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাটতলা, বারোয়ারীতলা, ইউনিয়ন বোর্ডের আপিস, নাট্যসমিতি,—কোথাও কোনো মানুষ নেই। মাঝে মাঝে থানার মুসলমান দারোগা তাঁর দলবল নিয়ে এক-একবার এখানে ওখানে ঘুরে যাচ্ছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকরা পাহারা দিয়ে ফিরছিল এগ্রামে ওগ্রামে।

রুদ্ধশ্বাসে গ্রামবাসীরা প্রতীক্ষা করছিল শুভক্ষণের জন্য। কিন্তু মিথ্যা সেই প্রতীক্ষা। সেদিন প্রভাতে রুদ্রেশ্বর মন্দিরের দরজায় একটি বাছুরের মুণ্ড আবিষ্কৃত হোলো এবং আন্দাজ বেলা নয়টার মধ্যেই এ গ্রামে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেল।

এ বাড়ীর গুহাগহ্বরে লুকিয়ে ছিল তিনটি অসহায় প্রাণী। কিন্তু রেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় তাদের ঘরে হাঁড়ি চড়েনি আজ তিনদিন হোলো। ওরা গিয়ে উঠলো ভগ্নস্তূপের উঁচু জায়গাটায়। সেখান থেকে দেখা যায় মাঠের পথ,—যে পথ দিয়ে অরুণ এসেছে বার বার। কিন্তু জনশূন্য প্রাণীশূন্য প্রান্তর হাহাকার করছে।

আগুনের ধোঁয়ার সঙ্গে মৃত্যুর রোল উঠেছে আশেপাশে। উপেনবাবুর পক্ষে আর স্থির থাকা সম্ভব হোলো না। ভাঙ্গা দরজা, পুকুরের দিকটা খোলা, বাড়ীর পাঁচিল ধ্বসা—আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। তার ওপর মাধুকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবার একটা কানাকানি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকাই তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু অদূরবর্তী স্কুল বাড়ীটায় নিরাপদ আশ্রয় মিলবে কিনা উপেনবাবু তারই খোঁজে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেদিন বেরিয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, তিনি আর ফিরতে পারেননি। মধ্যরাত্রে উন্মাদিনীর মতো পিসিমাকে লুকিয়ে মাধু তার পিতার খোঁজ করতে বেরিয়েছিল খানিকটা পথ, কিন্তু উপেনবাবুর লাস খুঁজে পাওয়া যায়নি!

পরদিন অপরাহ্ণের দিকে এ বাড়ী আক্রান্ত হোলো। পিসিমা ও মাধু কোথায় গিয়ে লুকোলো কেউ সন্ধান পেলো না। তবে পিসিমা বোধ হয় মনে করেছিলেন, পুকুরপাড়ের নীচে কোথাও আত্মগোপন ক'রে তিনি রাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন, এবং হয়ত রাখতেও পেরেছিলেন—কেননা ওই দীপেন্দ্রনারায়ণেরই প্রাচীন পদ্মসরোবরের জলের উপরে পরদিন পিসিমার ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল!

গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে একটি ছোট পুঁটলী হাতে নিয়ে কালো

আলোয়ানখানা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে মাধু ছুট দিল মাঠের উপর দিয়ে। অরুণদের তাঁবু নাকি এই মাঠেরই অপর প্রান্তে।

ধানকাটা মাঠের পথে ধানের গোড়াগুলি যেমনই পায়ে আঘাত করে, মাটির ডেলাগুলি তেমনই কঠিন। পুষ্পাকীর্ণ চীনাংশুকের পেলবতার উপর দিয়ে যে পদ্মরক্তাভ দুখানি চরণের সঞ্চারণের কথা ছিল, সেই পা আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হোলো। শতবর্ষ বিরহিনী শ্রীমতী চলেছিলেন পাগলিনীর মতো অভিসারে ঘন অন্ধকার এবং শ্বাপদ-ভুজঙ্গ-ভয়কে তুচ্ছ ক'রে, কিন্তু মাধু ছুটেছে প্রাণভয়ে। পিছন থেকে বীভৎস মৃত্যু তার হিংস্র দংষ্ট্রা ব্যাদান ক'রে ব্যাঘ্রের মতো এগিয়ে আসছে, সে ছুটে চলেছে জীবনভয়ভীতা বন্য কুরঙ্গিনীর মতো।

দিনের বেলাতেও সেই দূরবর্তী ক্যাম্পের নিশানা গাছপালার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে দিক ভুল হবার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভবত মিলিটারী ক্যাম্প সম্বন্ধে জনসাধারণের একটা স্বাভাবিক আতঙ্কবোধ থাকার দরুণ দাঙ্গাবাজদের সমাগম এদিকে হয়নি। মাধুর বিশ্বাস, ক্যাম্পে কোনোমতে একবার পৌছতে পারলেই সমস্ত সমস্যার অবসান। সব শেষের দিনটিতে অরুণের শরীরটাও খুব ভালো ছিল না, এবং মাধুর বুকের মধ্যে ব'সে অন্তর্যামী একথা জানিয়ে দেন, অরুণ কঠিন রোগে ওই ক্যাম্পের মধ্যে শয্যাগত হয়ে প'ড়ে আছে। আর্ত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো মাধুর মুখ দিয়ে। থমকে সে দাঁড়ালো। উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস ঝাপসা ক'রে দিয়েছিল তার অবাধ্য চোখ। কিন্তু মাটির উপর পুঁটলীটা একবার ফেলে সে নিজের দুখানা হাতের তালু অন্ধকারে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলো, ময়লা দুখানা হাত,—এই দুখানা অসুন্দর হাতে সে ওই রাজপুত্রের পরিচর্যা করবে কেমন ক'রে? মালিন্য মাখা হাতে দেবতার সেবা যে শ্রীহীন হবে!

হাত দুখানা প্রাণপণে সে মাটির ডেলার উপর ঘষে নিল একবার, তারপর গায়ের আঁচল টেনে সেই হাত মুছলো পরিষ্কার ক'রে—তারপর পুঁটলী নিয়ে আবার ছুটলো।

পোড়ারমুখীর চোখ মন প্রাণ বুদ্ধি—সবই ছিল অতি তীক্ষ্ণ। পথ ভুল সে করেনি। গাছের জটলার ভিতর দিয়ে এতক্ষণে ক্যাম্পের আলো তার চোখে পড়লো, এবং সেখানকার দ্রুত কর্মতৎপরতাও সে লক্ষ্য করতে পারলো দূর থেকে।

কাঁটাতারের বেড়া,—অরুণ ব'লে রেখেছিল। পূবমুখী একটা গেট্ আছে, সেই গেটে সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন থাকে। গেটটা পাওয়া গেল অনেক ঘোরাঘুরির পর, কিন্তু পাহারা দেখা গেল না। বেঁচে গেল মাধু। সবচেয়ে প্রধান পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হোলো। ক্যাম্পের মধ্যে চারদিকে আলো জ্বলছে, একটার পর একটা মিলিটারী ট্রাকের কন্‌ভয় দ্রুত অতিক্রম ক'রে চলেছে। মাধু এদিক ওদিক ব্যাকুলভাবে একবার তাকালো, তারপর সন্দেহক্রমে সেইখানে ব'সে পুঁটলীটি খুলে একখানি ছোট্ট নোটবই বা'র করে তার পাতা ওলটাতে লাগলো। বইখানা অরুণের, ওখানা শেষ দিনে তার বুক-পকেট থেকে এক পাশে খসে' পড়েছিল,—আর ফেরৎ দেওয়া হয়নি! ওরই মধ্যে অরুণের স্বহস্তের লেখা ক্যাম্পের বিশেষ নম্বরটি মাধু দেখে রেখেছিল। নোট বইটিতে অরুণের নামটি ছাড়া সঠিক আর কোনো কিছু পাবার উপায় নেই। কেবল একটির পর একটি নম্বর লেখা পাতায়।

একটি নম্বর মনে রেখে মাধু হনহন ক'রে চললো একদিকে। কাছাকাছি এসে দেখলো সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব। গায়ের আলোয়ানটা ভালো ক'রে জড়িয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে একটি লোককে গিয়ে সে ধরলো। পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি কন্‌ভয়।

লোকটা তার ভাষা বুঝতে পারেনি। বললে, ক্যা মাংতা?

মাধু থতিয়ে থতিয়ে নম্বরটা বললে। লোকটা আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢাকা নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বললে, আগে বঢ়ায়কে দেখো। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ······

গাড়ীর মুখে পড়ে গিয়েছিল মাধু আরেকটু হ'লে। ছুটে সে পেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে নম্বর মিলিয়ে সে দেখলো, সামনেই লেফ্‌টেনাণ্টের ঘর। কিন্তু ঘর শূন্য, কেউ নেই। এপাপ ওপাশ দেখলো জনহীন।

যুদ্ধ থেমে গেলে ক্যাম্পের কী চেহারা দাঁড়ায়, নির্বোধ মেয়েটার জানা ছিল না। সমস্ত সাজানো থাকে, থাকে না কেবল মানুষ। আবার তাদের ডাক পড়েছে কোথায়, কে জানে! অদূরে আরেকটি লরীর দল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেইদিকে সে পা বাড়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় পূর্বোক্ত সেপাইটি দু'পা এগিয়ে এলো, এবং জানতে চাইলো তার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য। মাধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে অরুণের নাম ও পরিচয় তাকে জানালো। সেপাইটি অরুণকে ভালো ক'রেই চেনে,—এই গ্রুপেরই প্রহরায় সে থাকে। কিন্তু সে মাধুকে বুঝিয়ে দিল, লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ সাব বিমার পড়া থা, বড়া সাব উন্‌কা বদলি কর দিয়া······

এখানে নেই? অসুখ নিয়েই বদলি হয়ে গেছে?

হাঁ।

কোথা গেছে অরুণ?

মালুম নেহি।—খবরদার······

লরীর দল আসছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকালো মাধু। কী ছিল সেই চাহনীতে কে জানে! ভয়! বীভৎস পরিণামের আতঙ্ক! মহাপ্রলয়ের আভা! ঈশানের ভ্রূকুটির বাঁকা ভঙ্গী! মাধু তৎক্ষণাৎ ছুটলো ওই দ্রুতগতি লরীদলের পাশে পাশে। কেন ছুটলো বলা কঠিন, কি চায় তা অজ্ঞাত। লরীর সেপাইরা প্রথমে হাসলো, পরে বলাবলি করলো, গাঁওকা পাগলী!

মাধু ছুটছে, একটির পর একটি ট্রাক্‌ তাকে অতিক্রম ক'রে চলেছে। কতদূর ছুটে গেল মাধু,—বাগান পেরিয়ে, ক্যাম্প ছাড়িয়ে, পথের পর পথ অতিক্রম ক'রে! কিন্তু লরীর কন্‌ভয় সেই অন্ধকারে প্রেতচক্ষুর মতো তীব্র হেড্‌লাইট্‌গুলি জ্বালিয়ে তাকে পিছনে ফেলে চ'লে গেল।

কেন মাধু পাগল হোলো না? মহাচণ্ডী ছিন্নমস্তার মতো আপন টুঁটির রক্ত কেন সে পান করলো না? করালী ভয়ঙ্করী ভীষণার প্রলয়নাচনে সৃষ্টিস্থিতি রসাতলে কেন দিল না মাধু? কিন্তু ওইখানে ওই মহাশূন্য মাঠের প্রান্তে মুখ থুবড়ে মাধু নিজের মাথাটাই ঠুকতে লাগলো বার বার,—তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার!

শীতের কঠিন ঠাণ্ডায় সেই অন্ধকার আদি অন্তহীন প্রান্তর সত্য সত্যই শ্মশানকালীর প্রেতিনী-নৃত্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

মধ্যরাত্রির কোনো একসময় ধীরে ধীরে মাধু সেই মাটির উপরে ভর দিয়েই উঠে ব'সে এদিক ওদিক তাকালো। ততক্ষণে কান্নাটা তার শুকিয়ে গেছে।

অতঃপর তুদিন ধ'রে মাধুর কী অসমসাহসিক অভিযান! পরিশ্রম করেছে যত, তার চেয়ে অনেক বেশী ডোবা-পুকুরের জল খেয়েছে। অবশেষে একদিন অপরাহ্ণকালে সে এসে পৌছলো এক সাহেব বাগানে। সেখানে একজন আয়ার কাছে কলকাতার পথঘাট সে জানতে চাইলো। কলকাতার সম্বন্ধে অন্ধ্রদেশীয় আয়ার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে গিয়ে এক প্রৌঢ়া মেম সাহেবকে খবর দিল। মেম বেরিয়ে এলেন স্নেহের আস্বাদ নিয়ে। তারা ছিল মিশনারীর লোক। মাধু ওখানে আশ্রয় পেলো কিছুদিনের জন্য।

বিপন্ন নারী তার আপন নিরাপদ ব্যবস্থাকে যেভাবেই হোক, আবিষ্কার ক'রে নেয়। মাধুও নারী,—অরণ্যচারিণী হরিণীও নারী! উভয়েই খুঁজে পায় আপন কোটর, আপন গুহাগহ্বর! অত্যন্ত অসুস্থ দেহ নিয়ে মাধু সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, এবং উৎকৃষ্ট রেজাণ্টসহ পাস ক'রে গেল। কিন্তু প্রবল বিষক্রিয়া ছিল তার সর্বশরীরে।

মেয়েটা অত্যন্ত নির্বোধ, একান্তই অজ্ঞান। সংসার সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। মাত্র কয়েক দিনের আলাপ একটি যুবকের সঙ্গে, এবং না হয় তাকে স্বামী ব'লেই সে কল্পনা করেছিল! কিন্তু সংসারে এমন ত' নিত্যই ঘটে। অনেক ব্যর্থতা, অনেক আঘাত জীবনে সইতে হয়, এর জন্যে যে মেয়ে ভেঙ্গে পড়ে—তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়!

এ সব হোলো বিজ্ঞের কথা। কিন্তু যে রূপবান তরুণ যুবকটিকে সে স্বামী ব'লে মনে-মনে গ্রহণ করেছিল, তারই সন্তানকে মাধু তখন গর্ভে ধারণ ক'রে রয়েছে—এই কথাটা সে একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হোলো ওই প্রৌঢ়ারই তরুণী কন্যার কাছে। পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হোলো না তার আগে।

এর পরে মাধুর জীবনে এলো নতুন হাওয়া। মিশনারী মেয়েদের কাছে সে

আশ্রয় নিল এবং একদা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলো। অরুণের নোটবইটি সে বা'র ক'রে দেখিয়েছিল কয়েকজনকে, কিন্তু সেই বছরের শেষ দিকে ভারত-রাষ্ট্রে এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে অরাজকতা ও অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়, তাকে অতিক্রম ক'রে অরুণের সংবাদ এনে দেবে, এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি। নোটবইটির মধ্যে যে কতগুলি হিজিবিজি সাঙ্কেতিক নম্বর এবং অক্ষর বসানো ছিল, তারও হদিশ কেউ দিতে পারলো না। মাধুকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে চুপ ক'রে যেতে হোলো। কিন্তু ওই নোটবইটি অরুণের শেষ চিহ্নস্বরূপ তার কাছে রয়ে গেল।

মিশনারীদের হেপাজতেই শিশুটিকে ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হোলো। সেই সদ্যজাত সুন্দর শিশুটিকে তারা কোথায় যেন পাঠিয়ে দিল, মাধু তার খোঁজখবর রাখার চেষ্টাও করলো না। মুক্তি পেয়ে সে বাঁচলো এবং তরুণী মেমটির সঙ্গে মাধুর বন্ধুত্ব জমে উঠলো এক বছরের মধ্যে। পরবর্তী দুবছরের মধ্যে মাধু আই-এ পাস ক'রে একটি মূল্যবান্ স্কলারশিপ্ পেলো। তার অনন্যসাধারণ সাফল্যে সবাই চমৎকৃত। নাচ এবং গানের পরীক্ষায় এমন কৃতিত্ব সে প্রকাশ করলো যে, 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে তার ছবি ছাপা হোলো।

বি-এ পড়তে গেল মধু শান্তিনিকেতনে। সেখানকার প্রশান্ত পরিবেশের মাঝখানে গিয়ে নিজেকে সে জানতে শিখলো, এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের উপরে সে শক্ত হয়ে দাড়ালো। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি রটে গেল সর্বত্র। ওখানে সে নাচের কাজ নিল, নতুন নাচের শিক্ষা চালু ক'রে দিল, গানের উপর চড়ালো নতুন মীড়, অভিনয়াদিতে আনলো নতুন টেক্‌নিক্ এবং অর্থ শাস্ত্রে অভিনব সাফল্য অর্জন ক'রে সে প্রমাণ করলো, মাথাটা তার অতি পরিষ্কার। মেয়েটার হাস্য, লাস্য, কথার চাতুরী, বাচনভঙ্গী, গানের কণ্ঠ এবং সহজাত অভিজ্ঞান লক্ষ্য ক'রে সবাই মনে মনে জেনে নিল, এ মেয়ে নতুন প্রতিভা। মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা এবং স্বভাবের শুচিতা,—মাধুর এই দুটি গুণ লক্ষ্য ক'রে আশেপাশের মেয়েরাও তার অনুগত হোলো। বি-এ পাস করলো মাধু সসম্মানে, এবং এম-এ পাস করলো সে অর্থনীতিশাস্ত্রে। এবার সে উপার্জনে নামবে।

*   *   *   *

রাত্রিশেষের জ্যোৎস্না নিষ্প্রভ হয়ে এলো। সেই ম্লান আলোয় ঈশানীর গল্প শেষ হোলো। শান্তনুর মুগ্ধ চোখ তার মুখের উপর স্থির হয়ে ছিল।

মাথার উপরে মৃদুগতি পাখা ঘুরছে রাত বারোটার পর থেকে। একই বিছানার এপাশে ঈশানী, ওপাশে শান্তনু,—যেন প্রস্তরীভূত! কিন্তু এবারে যেন মধুর অবসাদে শান্তনুর চোখ জড়িয়ে এলো। সে বললে, মিশনারীদের সেই তরুণী মেয়েটি যেন কাব্যের উপেক্ষিতা হয়ে রইলো?

চোখ দুটি একবার বন্ধ ক'রে ঈশানী বললে, আমার অতি দুর্দিনের বন্ধু, ওরই নাম শিলভিয়া!

শান্তনু বললে, তবে কি ভিক্টর তোরই ছেলে?

ধরা গলায় ঈশানী বললে, তুই আর শিলভিয়া ছাড়া পৃথিবীতে এ খবর আর কেউ জানে না।

শান্তনু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরে বললে, মাধু নামটা কবে বদলালি?

আই-এ পাস করার আগে ওই শিলভিয়াদের সাহায্যে ইউনিভারসিটিতে দরখাস্ত করি। অনেক কষ্টে নামটা বদলাতে পেরেছিলুম।

ঈশানী নামটা পছন্দ কেন তোর?

ঈশানী হাসিমুখে বললে, দশ অস্ত্র হাতে নিয়ে এই জীবনের রণক্ষেত্রে নেমেছিলুম, তখন বোধ হয় চোখে ছিল বাঁকা কটাক্ষের করাল বিদ্রূপ,—ঈশানী নামটা মানিয়ে গেল!

শান্তনু বললে, কিন্তু সেই জীবন তুই কাটিয়ে উঠেছিস। এখন তুই আত্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে,—তোর স্থিতি ফিরে এসেছে। তোর এখন ফিরে আসা দরকার জননীর পরিচয়ের মধ্যে!

ঈশানী বললে, কেমন করে ফিরবো?

তোর জীবনে সাফল্য ঘটেছে অনেক, কিন্তু সার্থকতার পথ এখনও যে

অনেকদূর! তুই নিজে বঞ্চিত হয়েছিস ব'লে একটি নিরপরাধ সন্তানকে জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবি? বঞ্চনার প্রতিশোধ বঞ্চনায়?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো।

শান্তনু প্রশ্ন তুললো, তোর এই যৌবন সমারোহ থাকবে চিরদিন? নন্দনবাসিনী উর্বশীর আনন্দ-উদ্বেল দেহবল্লরীর বাসনা-বিলোল নাচ কতদিন চলতে পারে? আরো না হয় দশ-পনেরো বছর? তারপর? তারপর যে রঙ্গমঞ্চের আলো নিভে যাবে! বুকচাপা নৈরাশ্য নিয়ে ফিরে আসতে হবে অন্ধকার ঘরে একা,—সে ঘর যে একেবারেই শূন্য! মেয়ে বলো, আর পুরুষ বলো,—মানুষের শেষ আশ্রয় তার সন্তানসন্ততি। তুই ভুল করেছিস, ঈশানী,—ভালোবাসার সার্থকতা হোলো বাৎসল্যে আর স্নেহে।

ঈশানী এবার মুখ খুললো। বললে, কিন্তু ভিক্টর যখন জানবে, তার মা পথে-ঘাটে নেচে-গেয়ে বেড়ায়, এবং সেই মায়ের অন্য সমস্ত পরিচয় অন্ধকারে ঢাকা। তা ছাড়া আরও কথা আছে, শান্তনু। মেয়েমানুষের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া, আর মা হয়ে ওঠা—দুটো এক জিনিস নয়। ভিক্টরের জন্মমুহূর্তের থেকে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয়নি। সেই জন্যই ভিক্টর আমার কাছে সত্য নয়, কল্পনামাত্র।

শান্তনু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালো। এমন অদ্ভুত মনোজটিলতার সঙ্গে তার পরিচয় নেই।—তা হ'লে অরুণের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা?

ঈশানী হঠাৎ হাসলো। বললে, ওটা দৈব।

মানে?—শান্তনু হতবুদ্ধি হয়ে তাকালো।

আকাশে ততক্ষণে ঊষার আভা ফুটেছিল। আশেপাশের বন-বাগানে প্রভাতের পাখীরা ডানা ঝাড়ছিল,—অনন্ত আকাশ এখনই ওদেরকে ডাক দেবে। কোনো কোনো পাখী ব্রাহ্মমুহূর্তে ধরেছে ললিতের তান। একটু পরেই ব'সে যাবে সূর্যবন্দনা সভা।

শান্তনু বললে, কি বলছিস তুই? ওটা ভালোবাসা নয়?

ঈশানী বললে, এক বিন্দুও নয়!

তোকে ধিক, ঈশানী !. তুই কি মনে করিস একথা শুনলে আমি পুলকিত হবো ?

তোর ঘেন্না চিরকাল বয়ে বেড়াবো সেও ভালো, কিন্তু তোর মুখের ওপর মিথ্যে বলতে পারবো না। অপরিণত মনের ক্ষণিক বর্ণচ্ছটাকে যদি ভালোবাসা ব'লে তুই ভুল করিস, তোকেও অনুতাপ করতে হবে, শান্তনু। সে-লোকটা আসা-যাওয়া করেছিল অবিশ্যি বার পাঁচ ছয়, তার মোট স্থায়িত্ব ঘণ্টা কুড়িও নয়। তাকে দেখলে হয়ত চিনতে পারবো, কিন্তু মুখখানা আজ একেবারেই মনে পড়ে না। সে ব্যক্তি আমার ভালোবাসা পায়ে মাড়িয়ে যায়নি, কেননা ভালোবাসার চেতনা জন্মাবার আগেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।—

মন দিয়ে শান্তনু তার কথা শুনলো। তারপর বললে, তা হলে কি বলতে চাস, ভিক্টরের কোনো দায়িত্ব কোনোদিন তুই গ্রহণ করবিনে? তার জন্মের কাহিনী চিরদিনই রহস্যময় হয়ে থাকবে ?—

ঈশানী একটু হাসলো। বললে, পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ সন্তান আছে, যাদের জন্মকাহিনী রহস্যাবৃত, এ কি তোর জানা নেই ? কী করে তারা ? বড় হয়ে কোথায় দাঁড়ায় ? অথচ কে না জানে, অনাথ আশ্রমের শিশুরা সবাই পিতৃমাতৃহীন নয়। হয়ত অনেকের মা-বাপ কাছেই থাকে, তারা কিন্তু জানে না !

শান্তনু স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ! এ জগতের কতটুকু জানে সে !

ঈশানী বলতে লাগলো, এমন অসংখ্য স্বামী আছে যারা নিঃসন্তান স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা ক'রে নিজের গুপ্ত সন্তানকেই 'পালিত পুত্র' হিসেবে গ্রহণ করেছে ! অনেক অসতী স্ত্রীর সন্তান স্বামীর নামে চ'লে যায় কে না জানে ! সেই জন্য জন্মবৃত্তান্তের শুচিতা নিয়ে কোনো মানুষের কোনো বিচার নির্ভুল নাও হতে পারে, একথা জেনে রাখা ভালো, শান্তনু।

শান্তনু প্রশ্ন করলো, ভিক্টর চিরদিনই অজ্ঞান থেকে যাবে, এই তোর ধারণা ?

ঈশানী বললে, তার মনে যদি কখনও কঠিন প্রশ্ন ওঠে, আমি তার জবাব দিতে নাই বা গেলুম। তার মা-বাপের পরিচয়টা তাকে জানিয়ে তার জীবনটাকে নাই বা অশান্ত ক'রে তুললুম।

কিন্তু যদি কখনও অরুণের সঙ্গে তোর দেখা হয়ে যায় ?

ঈশানী হেসে উঠলো, ভয় নেই, যে-মেয়ে তার পায়ে ধ'রে কাঁদতে পারতো, সে-মেয়ে অনেকদিন আগে ম'রে গেছে। তবে হ্যাঁ, দেখা হ'লে ভিক্টরের কথাটা হয়ত তুলতুম। পুরুষের জীবনে পিতৃপরিচয়টাই দরকার, মায়ের পরিচয় মুছে গেলেও চলে !

তামাসা ক'রে শান্তনু বললে, তোর ভালোবাসার ব্যাপারটা ?

ভালোবাসা !—ঈশানী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো, তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে সে তার প্রাতঃকালীন 'মেহনতে'র ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

৭

কথাটা এখান থেকেই পরিষ্কার হওয়া চাই। মাধু হোলো আগেকার মেয়ে, ঈশানী তার নতুন নাম। মাধু তলিয়ে গেছে তার উৎপীড়িত জীবনের সংগ্রাম নিয়ে, ঈশানী দাঁড়িয়ে উঠেছে তার শ্মশানভস্ম গায়ে মেখে। মাধু হারিয়ে গেছে অতীতে,—ঈশানীর আছে স্মৃতি। মাধু যাকে স্বামী ব'লে ভাবতে চেয়েছিল, স্বামী হয়ে ওঠার আগেই নিরুদ্দেশে তার অবলুপ্তি ঘটেছে। সেদিনের অরুণের সঙ্গে সেদিনকার মাধুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঈশানী সকৌতুকে তাকিয়ে রয়েছে ওদের অবলুপ্তির দিকে। অরুণের পিছনটা চোখে পড়ে, মাধুর সামনেটা। মাধুর চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নামছে, ঈশানী তার দিকে এখন হাসিমুখে তাকায়। ঈশানীর প্রাণের বৃন্তে ওরা ছিল দুটি ফুল—মাধু আর অরুণ—কিন্তু দুটি ফুলই ঝ'রে গেছে।

ঈশানীকে প্রশ্ন করো,—সে বলবে, মাধুর প্রণয়ীকে তার মনে আছে, কিন্তু সে এক প্রিয়দর্শন তরুণের নিরাকার ছায়ামাত্র,—রেখার আকার কিছু নেই। তারই প্রতি আকর্ষণে আত্মবিক্রয় করেছিল সেই মাধু, কিন্তু ঈশানী নয়। ছেলেটার প্রকৃতি কেমন ছিল একথার সাক্ষ্য সেদিনকার মাধু দিতে পারতো, কিন্তু ঈশানীর পক্ষে সম্ভব নয়। ছেলেটা ভালোবেসেছিল কি না বলা কঠিন, কারণ যৌবন-চাঞ্চল্যের গদগদ প্রলাপটাকে প্রেমের নাম দেওয়া চলবে না। যে-স্মৃতি কেবলমাত্র যৌন-চেতনার মধ্যে শিহরণ আনে, তাকে প্রশান্ত প্রেমের ভাবাবেশ বলা চলবে না। কেন না প্রেমের এক হাতে আছে কল্যাণ কামনা, অন্য হাতে ত্যাগ-বুদ্ধির প্রসন্ন উদারতা। সেইজন্য ছাড়াছাড়ির মধ্যে প্রেমের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু টানাটানির মধ্যে তা'র নিশ্চিত অপমৃত্যু। প্রেমের ঐশ্বর্য হোলো অশ্রুতে, কিন্তু কামনার প্রকাশ হোলো বিলাপে।

অমনি শান্তনু চেপে ধরলো ঈশানীকে,—তার মানে? মাধু কি ভালোবাসেনি?

ঈশানী হাসলো। বললে, মাধু সম্ভবত তার ওই লঘু প্রণয়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। বুঝতে পারলিনে?

না।

দুই বিস্ফোরক বারুদ এসেছিল কাছাকাছি। দুইয়ের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে' উঠেছিল। সেই আগুন নিবলো মাধুর চোখের জলে। মেয়েরা যে জন্ম-অর্বাচীন। ওরা যন্ত্র, পুরুষ হোলো যন্ত্রী! ওদের নিজস্ব অনন্যতা নেই, পুরুষ ওদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে, তাই ওরা সচল হয়। যে-পুরুষের আঘাতে ওদের জীবন লণ্ডভণ্ড হয়, সেই পুরুষই ওদেরকে চিরকালীন মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়ে পুজো দেয়! ভালোবাসার আগেই অরুণ মাধুকে চেয়ে বসলো, ভালোবাসার চেতনা জন্মাবার আগেই মাধু আত্মদান করলো। স্বামী পাবার জন্য সে অপেক্ষা করতে পারলো না, পুরুষকেই আগে পেয়ে গেল। অর্বাচীন মেয়েটা একথা বুঝলো না, সব পুরুষের মধ্যে স্বামী নেই। ওদুটো একসঙ্গে যে-মেয়ে পায়, সংসারক্ষেত্রে সেই মেয়েই সার্থক।

কথা উঠতে পারে ঈশানীর জীবনের সার্থকতা কোথায়? তৎক্ষণাৎ উত্তর এসে পৌছবে, ঈশানী নামটার মধ্যেই সার্থকতা। বাঁকা কটাক্ষে যে-মেয়ে তাকায়, সে-মেয়ে লক্ষ্য করে সংসারের উল্টো দিকটা। যেটা চলছে এতকাল, সেটা কোন্ যুক্তিতে চলছে? নাচের জগতে আমার খ্যাতি কম নয়, কিন্তু নাচছি, না নাচাচ্ছি?

শান্তনু বললে, তুই হ'লি যন্ত্র, আমি তোকে নাচাচ্ছি।

ভুল! এতকাল পুরুষ নাচিয়েছে, এবার কিছুকাল আমরা নাচাই। আমরা টাকা এনে ওদেরকে নাচাবো, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ওদেরকে নাচাবো, শাসন-কেন্দ্রে ব'সে ওদেরকে নাচাবো, সন্তান-ধারণ বন্ধ ক'রে ওদেরকে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘোরাবো। ওরা ধেই-ধেই ক'রে নাচুক, কিছু দিন কাঁদতে কাঁদতে নাচুক,—জীবন রঙ্গমঞ্চে ওদের নাচন-কোঁদন দেখে আমরা হাততালি দিই।

কৌতুক ক'রে শান্তনু বললে, কিন্তু ঘরকন্নাটা ? প্রাণের দায়টা ? পাখী ডিম পাড়বে কোথায় ?

ঈশানী জবাব দিল, পাড়বে না। দরকার মতো পাড়বে। তারপরে রইলো অনন্ত মুক্তির আকাশ !

শান্তনু আবার হাসলো। বললে, বিবাহ-বিচ্ছেদ চালু হ'লে একদিকে বাড়বে ভিক্টরদের সংখ্যা, অন্যদিকে গজাবে মেয়ে-সন্ন্যাসীর দল।

খিল খিল ক'রে ঈশানী হেসে উঠলো। বললে, মন্দ কি, সেদিন গিয়ে স্ত্রীহীন 'স্বামী'দের আশ্রমগুলি দখল ক'রে নেবো।

হাসি নিয়ে ওদের কাটে সারাদিন, পরিহাস নিয়ে কাটে সন্ধ্যাকাল, তারপর রাত্রে গভীর সুরে গভীর কথার জাল বোনা। অন্ধকারে বাঁশী বাজাবার আসর বসে নিরিবিলি ছাদের উপর। সেদিন প্রায় মধ্যরাত্রে ছাদে উঠে এসে ঈশানী সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ ক'রে শান্তনুকে দেখালো তার নাচের পটুতা। নাচের জন্য ঈশানীর দেশজোড়া খ্যাতির কথা শুনে শান্তনু কিছুটা ওর নাচের প্রতি বিরূপ ছিল। ঈশানী প্রমাণ ক'রে দিল, তার নৃত্যটা হোলো দেহোৎসর্গের মতো। ঊর্ধ্বায়িত দেহটা হোলো একটি স্তব, একটি সকরুণ প্রার্থনা, আত্মবিসর্জনের একটি ব্যাকুল বাসনা। সেই দেহ লজ্জাজড়িত নয়, কুণ্ঠা-অবগুণ্ঠা নেই সে-দেহে, কারণ দানের মধ্যে সঙ্কোচ থাকলে চলবে না, সে দান গ্রহণ করেন না জীবন-দেবতা ! লজ্জা, মান, ভয়, দ্বিধা, লাজুকতা,—এরা হোলো বাধা, এরা উপচারকে কণ্টকিত করে, এদের জন্য নাচের নৈবেদ্য কলুষিত হয়। ঈশানী নাচলো মৃদু বাঁশীর মিহি মধুর তানের সঙ্গে,—পুরুষোত্তমের নিত্যকালের বংশীধ্বনির সঙ্গে মায়া-মোহিনী পরমাপ্রকৃতি যেমন আপন কক্ষ-পথে নেচে বেড়ায়।

রাত্রি কখন্ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে ওরা লক্ষ্য করেনি। গগনের কোণায় কোণায় ঈশানের কাল-কটাক্ষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ছাদের উপরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে মৃদু বাঁশী মুগ্ধকণ্ঠে বেজে চলেছে। অদূরে সর্বনাশিনী উর্বশীর ছায়াটা আপন নাচের আনন্দে আত্মহারা, তাকে স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না। চোখ বেয়ে ঈশানীর জলের ধারা নেমেছিল।

এমন সময় রুদ্রের প্রচণ্ড অগ্নিক্ষরা ঝলসিত তরবারী আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিল। সেই প্রলয়োচ্ছ্বাসের পলকে শান্তনু দেখে নিল মর্ত্যের মায়াবিনীকে। ঈশানের অনাগত সূর্যের দিকে রাত্রির রক্তকমল আপন নগ্নমরণকে মেলে ধরেছিল।

বাঁশী থামিয়ে ছাদের দরজাটা খুলে শান্তনু অন্ধকারে নীচে নেমে গেল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠে এই সমগ্র নিষ্প্রদীপ অট্টালিকাকে আঘাত হানলো। জানালা ও দরজার কবাট বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে উঠলো।

দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো।

পরদিন প্রভাতের শান্ত আকাশ নবীন সূর্যের আবির্ভাবে জ্যোতিষ্মান হয়ে দেখা দিল। শান্তনু প্রভাতের পদচারণায় বেরিয়ে পড়লো। প্রসন্ন তার চিত্তলোক, আনন্দের প্রসাদগুণে দিকদিগন্ত তার উদ্ভাসিত।

সদ্যস্নাতা ঈশানী তসরের একখানা শাড়ী জড়িয়ে বারান্দায় এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। দূরের থেকে দৃষ্টিবিনিময়ের দ্বারা দুজনে দুজনকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। শুভ প্রভাত!

কিছুক্ষণের মধ্যেই রমেনবাবু একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলেন। গাড়ীখানাকে দাঁড় করিয়ে তিনি সরাসরি উপরে উঠে এলেন। নন্দ তাঁকে নিয়ে বাইরের ঘরে বসালো।

রামতীরথের কাছে রান্নাবান্নার হিসেব দিয়ে ঈশানী এসে ঘরে ঢুকলো। রাঙাপাড় তসরের শাড়ীখানা সকালের রৌদ্রের আভায় তাকে মানিয়ে গেছে। লাবণ্যের সঙ্গে এমন সম্ভ্রম সহসা চোখে পড়ে না। রমেনবাবুর দুই চোখে শ্রদ্ধা ভ'রে এলো।

এত সকালে আপনি?

সকালে!—রমেনবাবু বললেন, পাছে কোথাও তুমি বেরিয়ে পড়ো তাই রাত থাকতে উঠেছি। মুখোমুখি ছাড়া এসব কথাবার্তা পাকাপাকি হয় না।

ঈশানী বললে, কষ্ট ক'রে এলেন এতদূরে, না এসে বরং টেলিফোন করলেই পারতেন !

টেলিফোনের কথা আর ব'লো না। ওটা আজকাল থাকা না থাকা একই কথা। যতক্ষণে তোমার নম্বর পাবো, তার আগেই তোমার এখানে পৌঁছে যাবো। অবিশ্যি কাল রাতে অফিসে ব'সে একবার মনে করলুম, তোমাকে ফোন করি। কিন্তু রাত তখন দশটা। ভাবলুম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঈশানী বললে, ঠিক ঘুমোইনি, তবে হ্যাঁ, ওই এক রকম আর কি। তারপর, খবর কি বলুন।

রমেনবাবু বললেন, তোমার কাছে পাকা কথা পাওয়া গেছে, আর আমার কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু হঠাৎ কাল রাত ন'টার পর দিল্লী থেকে জরুরী ট্রাঙ্ক কল্! ওরা আমাদের যাবার কথাটা পাকাপাকি জানতে চায়, অর্থাৎ তারিখটা জানবার জন্যে ওরা ব্যস্ত। ওদের আবার নানারকমের পাবলিসিটি আছে কি না। তা ছাড়া আরেকটা কথাও ওরা জানতে চেয়েছে।

একটু আনমনাভাবে ঈশানী বললে, কি বলুন ?

যদি আমরা কিছু টাকা চাই তাহ'লে ওরা এখানকার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারে।

ঈশানী বললে, আপনি গীতালী সঙ্ঘের নামে অবশ্য টাকা নিতে পারেন, কিন্তু আমি নিজে কোনো টাকা অগ্রিম নেবো না।

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন রমেনবাবু এবার একটু হাসলেন। বললেন, ঠিক এই কথাটি আমি ভাবতে ভাবতে আসছিলুম। আসছি এত বড় শিল্পীর কাছে, যদি খোস-মেজাজে আর বহাল তবিয়তে না পাই ? ঠাকুরের নাম করতে করতে আসছি। হে ঠাকুর, তুমি যেন স্থানে থেকে কানে শুনো !

ঈশানী হেসে ফেললো,—কেন, কি হয়েছে বলুন না ?

কপাল ! কপাল ছাড়া কিছু নেই ! টাকা কি কেউ রোজকার করে ? ও হোলো কপালের ফল, মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি ! আমারই ভুল। মনেই থাকে না যে, বড় শিল্পী মানেই বড় প্রতিভা ! আর প্রতিভার চেহারাই হোলো আলাদা ! তার

হাতে যে সৃষ্টি, তাই সে নিজের খেয়াল-খুশিতেই চলে! বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, জ্ঞানবুদ্ধি আমার পাকলো না।

ঈশানী বললে, আপনার বোধহয় টাকার দরকার, তাই না?

হয়া, ধরেছ ঠিক! আর না ধ'রেই বা যাবে কোথায়? কত লোক কত বড়-বড় পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়তে নামে, কিন্তু তোমার মতন আর্টিষ্ট ক'জন পায়, বলো ত? তা যখন পেয়েছি তখন মনের কথা বলতে আর বাধা কিসের?

ঈশানী বললে, কত টাকা পর্যন্ত ওরা অগ্রিম দিতে চায়?

রমেনবাবু বললেন, তা হ'লে শোনো। ছেলে আর মেয়ে নিয়ে আমাদের তিরিশ বত্রিশ জন আর্টিষ্ট, তা ছাড়া আমার নিজের ষ্টাফ,—তাও তিন চার জন। ওরা বলছে, দিল্লী পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা হাজার চারেক টাকা আর আমাদের পাওনার খাতে হাজার খানেক—মোট পাঁচ হাজার টাকা এখনই দিতে চায়।

ঈশানী বললে, বেশ ত!

কিন্তু পোষাক আসাক্! খুচরো খরচা! কিছু কিছু বাজাবার যন্ত্র! লোকজনের মাইনে!—এই সব নিয়েই যত গণ্ডগোল বেধে উঠেছে অফিসে।— রমেনবাবু গলা নামিয়ে এবার বললেন, আবার কি জানো ঈশানী, নাচ-গান করলে ওদের যেন ডবল্-তে-ডবল্ ক্ষিধে বেড়ে ওঠে। কথায় কথায় চা, কথায় কথায় জলখাবার। যেমন-তেমন জলখাবারের প্লেট সাজাতে যাও, আটগণ্ডা পয়সা লেগে যাবে। ওর মধ্যে আবার নাক উঁচু ক'রে কোনো কোনো মেয়ে বলে, আমরা 'দাল্দায়' ভাজা কচুরি-শিঙ্গাড়া খাইনে,—নাচতে গেলে আমাদের পেট মোচ্ড়ায়। আমি তখন বলি, গাওয়া ঘি কোথায় পাবো, মা ঠাকরুণ? গরু পুষেছি অনেক, কিন্তু একটাও দুধ দেয় না!

ঈশানী হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে লুটোপুটি খেয়ে গেল।

রমেনবাবু বললেন, হঁ্যা, তা যা বলেছ। গান বাজনা নাচ অভিনয়—যাই বলো না কেন, ওতে লিভারের কাজ ভালো হয়। আর লিভার ভালো হবার মানে বুঝে নাও,—ম্যানেজারের তবিলের সর্বনাশ। ডিম বলো, মাখন-রুটি বলো,

ফলমূল আর লুচি-মাংস-সন্দেশ—যা কিছু বলো, টাউ টাউ ক'রে গিলে খায়। ওদের হোলো পাখীর স্বভাব, উড়তে পারলে ভারি খুশী!

ঈশানী হাসি সম্বরণ করার জন্য আঁচলে মুখ চাপা দিল।

রমেনবাবু বললেন, তোমার কি ধারণা দুর্ভিক্ষ দেশ থেকে গেছে? মোটেই না, দুর্ভিক্ষ ওদের পেটে পেটে! আর আমাদের কপাল ছাখো, ব'সে ব'সে কাজ করি কি না। তাই একটু আধটু সামান্য সব্জি সেদ্ধ খেলেই ব্যস,—ভুঁড়ি বেড়ে উঠলো যেন কুমড়ো পটাশ! ওই জন্যে আই-এ পড়া মেয়েগুলো আমাকে বলে, পুঁজিবাদী! শোনো কথা!

রামতীরথ প্রাতরাশ এনে সামনে রাখলো। মুখ তুলে ঈশানী প্রশ্ন করলো, ছোটবাবু ফিরেছেন, রামতীরথ?

হাঁ মা, কাগজ পড়ছেন।

ঈশানী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি খেতে আরম্ভ করুন, আমি আসছি।—এই ব'লে সে বেরিয়ে গেল।

শান্তনু নিবিষ্টমনে খবরের কাগজখানার ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। পিছনে ঈশানী এসে দাঁড়ালো। কানে কানে বললে, রমেনবাবুকে কি জবাব দেবো?

আমি বলবো কেমন ক'রে?

তাই ব'লে চুপ ক'রে থাকবি?

আঃ—ব'লে কাগজখানা ফেলে শান্তনু উঠে এসে এঘরে ঢুকলো। রমেনবাবু হাত তুলে নমস্কার জানালেন, আসুন আসুন, অনেকদিন দেখা নেই।

শান্তনু একটি আরাম চেয়ারে বসলো। রমেনবাবু বললেন, এই দুঃখু-ধান্দার কথাবার্তা হচ্ছিল আর কি। চিরকাল টেবিলে ব'সে কলম ঠেলে কাটালুম, কিন্তু একটা নামসই করলে যে পাঁচ হাজার টাকা তার দাম হয়, একথা জজে বললেও মানতুম না। ঈশানীকে দেখে সে কথা বিশ্বাস করেছি।

ব্যাপার কি? নতুন বরাত?—শান্তনু সহাস্যে তাকালো।

ঈশানী বললে, উনি তোর কাছেই ব্যাপারটা বলতে এসেছেন।

রমেনবাবু পলকের মধ্যেই চোখটা এদিক থেকে ওদিকে বুলিয়ে নিলেন।

বললেন, হ্যাঁ তা বই কি, কথাটা তাই ত' দাঁড়ায়। আমারই ভুল, শান্তনু-বাবুকেই ত' আগে বলা দরকার। অভিভাবক ত' বটে।

ঈশানী বললে, দিল্লী যাওয়া আমাদের স্থির। তবে কবে যাবো, এই হোলো কথা। সেখান থেকে টেলিফোন এসেছে ওঁর কাছে, তারা গাড়ীভাড়া আর হাজার খানেক টাকা অগ্রিম দিতে চায়। কিন্তু আমি যদি ওদের সঙ্গে 'শো' করি এবং যেতে রাজি হই, তাহ'লে তারা কিছু বেশী টাকা দিতে প্রস্তুত। তবে আমার টাকাটা বোধ হয় উনি এখন নিজের হাতে নিতে চান্,—তাই না, রমেনবাবু?

রমেনবাবু প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি! এইটি হোলো আমার মনের খাঁটি কথা!

শান্তনু বললে, টাকাটা ঈশানীর হাতে আসতে কি দেরী হবে?

লাফিয়ে উঠলেন রমেনবাবু,—ওঁরই প্রতিষ্ঠান, ওঁরই টাকা! যা কিছু দেখছেন মিষ্টার চৌধুরী, সবই ওঁর! আমরা ত' সবাই ওঁর টাকাতেই নবাবী করি! কে না জানে!

ঈশানী চট্ ক'রে বললে, একথা আপনার সত্যি নয়, রমেনবাবু। ওরা সবাই প্রত্যেকে শিল্পী, আপনি বড় একটা প্রতিষ্ঠান নিজের পরিশ্রমে পরিচালনা করছেন,—নিজের শক্তিতেই আপনাদের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেকেই নিজের গুণপণার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শান্তনু হাসলো। বললে, ওঁরা হচ্ছেন দাহ্য, তুই হ'লি দাহিকা। উনি তাই বলতে চান্।

রমেনবাবু বললেন, এই যা বলেছেন! আসল কথা হোলো এই! শুধু বাঁশী নয়, ভাষাও কিছু আছে তার সঙ্গে!—বলতে বলতে নিজের আনন্দেই তিনি হো হো ক'রে হাসলেন।

ওরা সবাই জলযোগে ব'সে গেল।

ঈশানী বললে, আমার নামে কত টাকা আপনি চান্?

বেশী নয়,—রমেনবাবু বললেন, হাজার তিনেক টাকা হ'লেই ঝড়্তি-পড়্তি

দেনাগুলো শোধ ক'রে দিতে পারি। ঠাকুর যদি মানরক্ষে করেন, তাহ'লে এ-টাকা সামনের বছরের গোড়াতেই তোমাকে ফেরৎ দিতে পারবো!

ঈশানী বললে, কিন্তু আগের দেনার দরুণ সেই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা!

অপ্রস্তুত হবার লোক রমেনবাবু নন্। তিনি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, সম্রাট আকবরের সেই গল্পটা মনে পড়ছে। গান শুনে খুশী হ'য়ে তিনি গায়ককে একটি হাতী উপহার দিলেন। গায়কের সাধ্য কি হাতীকে খাওয়ায়। সে হেসে বললে, সম্রাট, আপনার উপহার আপনি ফেরৎ নিন্। এও তাই। তুমি হাতী উপহার দিয়েছ, ঈশানী, কিন্তু তোমার খরচে এ-হাতীকে না খাওয়ালে এর অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! আর দেনার কথা বলছ? সেও গেছে ওই হাতীর ভোগে!

শান্তনু হাস্যমুখে বললে, গল্পটা সত্যই যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে!

ঈশানী বললে, কিন্তু আমার পালাবার পথ ক'রে দিন?

রমেনবাবুর হয়ে শান্তনু জবাব দিল, যেখানে পালাবি, ওই পাগলা হাতী ছুটবে পিছু পিছু। তার চেয়ে আমি বলি এক কাজ কর। ওই হাতীর পিঠের ওপরেই হাওদা নিয়ে ব'সে যা।

ঈশানী বললে, ও-প্রতিষ্ঠান চালাবার সাধ্য আমার নেই। আমি গ'ড়ে দিতে পারি, কিন্তু লেগে থাকতে পারিনে। আমারই গড়া জিনিস, আমারই পায়ে শৃঙ্খল জড়াবে,—সে অধীনতা অসহ্য!

শান্তনু বললে, তাহ'লে এ টাকা ওঁকে তুই দিয়েই দে। বাস্তবিক, তোদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে উনি ত' সত্যিই বিব্রত। পাওনাদাররা ওঁকেই চেনে, তোর কাছ পর্যন্ত তারা পৌছয় না। ওঁরই জ্বালা বেশী। তুই নেচে খালাস, ওঁকে কিন্তু সেই নাচের দাপট সইতে হয়।

ঈশানী প্রশ্ন করলো, আপনি নিজে কত টাকা নেন্, রমেনবাবু?

রমেনবাবু জবাব দিলেন, আমি? তবেই হয়েছে! আমি হলুম রাধুনি-বামুন। সবাই ভুরিভোজন শেষ করলে যা উচ্ছিষ্ট থাকে, তাইতে আমার উপোস রক্ষে হয়। আমার কথা না তোলাই ভালো, কি বলেন মিষ্টার চৌধুরী!

বটেই ত!

যাক্, বাঁচলুম। এবার আমি উঠি। হ্যাঁ, তাহ'লে দিল্লী পৌঁছবার তারিখটা কবে দেবো? পঁচিশে বৈশাখ হ'লে মন্দ কি?

ভালোই হয়। তাই দিন্?

রমেনবাবু বললেন, তুমি কি একসঙ্গেই যাবে?

ঈশানী বললে, না, আমি আলাদা যাবো। হয়তো বা কিছু আগেই যাবো। আমার অন্য কাজ আছে।

বেশ—রমেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহ'লে অন্যান্য কথা টেলিফোনে তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে নেবো?

পুনরায় ঈশানী বললে, ওদের কাছে তাহ'লে পাঁচ হাজার টাকার কথাই বলবেন আমার নাম ক'রে। ওরা যেন ফোন করে, আপিসে গিয়ে আমি টাকা নেবো। টাকা আমার নিজেরও দরকার।

রমেনবাবু বিদায় নিলেন। নীচে তাঁর ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। হাসিখুশী মুখে তিনি নীচে নেমে গেলেন।

সকৌতুক দৃষ্টিতে ঈশানীর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে শান্তনু বললে, তুইও ত' ব্যবসাদার কম নয়?

ঈশানী বললে, টাকার গন্ধ পেলে কে না চতুর হয়, বল্ ত? কিন্তু এরা ভুল করছে। সোনার ডিম একসঙ্গে অনেকগুলো পাবার লোভে ওরা হাঁসটাকে কাটতে চাইছে। ব্যয়টা তুই দেখছিস্, আয়টা এখনও তোর চোখে পড়েনি। দেখলে খুশীই হ'বি।

শান্তনু বললে, কিন্তু তোর কথায় রমেনবাবুর প্রতি সন্দেহের একটা সুদূর ইঙ্গিত ছিল। উনি হয়ত বোঝেন নি,—আমার কানে লেগেছিল।

ঈশানী জবাব দিল, ওঁর ওপর আমার কোন আক্রোশ নেই। বরং আমার ধারণা, উনি না থাকলে এ-প্রতিষ্ঠান চালাবার অন্য লোক আর পাওয়া যেতো না। কিন্তু তোকে খুলেই বলি, উনি ওঁর গরীব শ্বশুরের বেনামীতে সম্প্রতি ছত্রিশ হাজার টাকায় একটি সম্পত্তি কিনেছেন!

ধিক্ তোকে, ঈশানী! শত ধিক্!—ঈশানীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্তনু অন্য ঘরে চ'লে গেল।

ঈশানী একবারটি থমকে দাঁড়ালো, তারপর ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দা পেরিয়ে এসে দেখলো, শান্তনু সেই সংবাদপত্রখানা নিয়ে একান্তে গুম হ'য়ে বসে গেছে। ঈশানী সামনে এসে কাগজখানা টান মেরে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। তারপর বললে, গালাগালি দিলি কম, উত্তেজনা চাপলি অনেকখানি।

শান্তনু বললে, না, আমার কিছু বলবার নেই।

আমার আছে।—ঈশানী বললে, আমার প্রতি লোকের বদান্যতার কথাই শুনবি, বঞ্চনার কথা শুনবিনে কেন?

শান্তনু বললে, টাকার সঙ্গে নোংরামি জড়ানো থাকে, তুই তার মধ্যে পা বাড়াবি কি জন্যে? একদিন আমার সম্বন্ধেও যদি তোর মনে এই কথা ওঠে?

ধিক তোকে, শান্তনু! শত ধিক্।—ঈশানী যেন চাবুক নিয়ে দাঁড়ালো।

ধিক কেন? এ কি সত্যি হ'তে পারে না?

ঈশানী বললে, তুই আমাকে অনেকবার অনেক পরীক্ষায় জব্দ করতে চেয়েছিস্, কিন্তু এ-পরীক্ষায় তুই নিজেই জব্দ হ'বি।

কেন?—শান্তনু তার দিকে তাকালো।

ঈশানী বললে, যেখানে কুণ্ঠা সেখানেই মনের জটিলতা। তোর মনে পুরুষের অহঙ্কার আছে ব'লেই কুণ্ঠা আছে। সেইজন্য তোর মন কাঁটা হয়ে থাকে দিনরাত, নিজেই তার জন্য কষ্ট পাস। এই ত' নিজের চোখেই দেখলুম, তুই হাসিমুখে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে এলি, তোর ন্যায্য পাওনা কেড়ে নিয়ে তোকে পথে বসিয়ে দিল,—কিন্তু বিনা তর্কে বিনাযুদ্ধে তুই সমস্ত ত্যাগ ক'রে এলি।—আমি কি জানিনে যে, লোভ দেখিয়ে তোকে বেঁধে রাখা যায় না? আর মেয়ে মানুষের প্রতি আসক্তি? আমি কি সুষমাকে দেখিনি? অমন ক'রে কেঁদে গেল চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু তুই মুখ ফিরিয়ে নিলি, কই একটা দিনও ওই কাঁচা বয়সের মেয়েটাকে নিয়ে তুই কাটিয়ে এলিনে ত? তোকে কোনো রকম সন্দেহ করার পথ কি রেখেছিস তুই? তোকে ধিক, তুই আমাকে এই

সব নোংরা কথায় টেনে আনিস। আমাকে ধিক্, তোর পায়ে মাথা খুঁড়েও তোর মন পেলুম না।

ঈশানীর চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এলো। ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

কাগজখানা আবার টেনে নিয়ে শান্তনু কিছুক্ষণ তার ওপর চোখ রেখে পড়বার চেষ্টা করলো, কিন্তু হিজিবিজি কিছু বুঝতে না পেরে সে উঠে পড়লো। ঘর থেকে বেরিয়ে সে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে অবশেষে ঈশানীর শোবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। ঈশানী বিছানায় উপুড় হয়ে চুপ ক'রে শুয়ে আছে। একখানা পা ঝুলছে তার মেঝের দিকে।

শান্তনু ওর শয়নকক্ষে কোনোদিন আসেনি, আজও এলো না। ঘরের বাইরে ছোট্ট বারান্দায় চৌকিখানার ওপর সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

নন্দ ওদিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল, শান্তনুকে দেখে বললে, আরেক পেয়ালা চা দেবো, ছোটবাবু?

শান্তনু বললে, চা? তা মন্দ নয়, নন্দ।

গলার আওয়াজে তার একটু যেন কৌতুকের আভাস ছিল, ঈশানী উঠে এলো। বাইরে এসে চৌকিতে ব'সে প'ড়ে বললে, নন্দ, চায়ের সঙ্গে একরাশ পানতুয়া নিয়ে আয়!—

শান্তনু সকৌতুকে বললে, চা না হয় বুঝলুম, পানতুয়া কেন?

ঈশানী বললে, আঁতুড়ে অবস্থায় তোমার মা যখন তোমাকে নুন খাওয়াননি, আমি দেখি মিষ্টি খাইয়ে তোমার গলায় মধু আনতে পারি কি না।

শান্তনু বললে, চোখ লাল কেন? কেঁদেছিলি?

পোড়া কপাল আমার।—ঈশানী বললে, সেকালের সেই অর্বাচীন মাধু হ'লে কেঁদে ভাসাতো, আমি কাপড় দিয়ে চোখ ঘষে তোকে দেখাতে এলুম! আমার নাচই দেখবি, অভিনয় দেখবিনে?

শান্তনু বললে, বটে, সেকালের সেই অর্বাচীন মাধুকে পেলে আমি কি বলতুম জানিস? বলতুম, ওরে মাধু, এত চোখের জল ফেলেও তুই মনের মানুষকে ধ'রে রাখতে পারলিনে? এর পরে যদি আর কোনো ব্যক্তির মন পেতে

চাস, চোখে কাপড় ঘষিস, হয়ত বা তোর কান্না দেখে তার মন ভুলতে পারে!

ঈশানী বললে, আমি কি কেবল তোর মন ভোলাবার চেষ্টায় দিনরাত ঘুরে মরছি?

রাম বলো।—শান্তনু বললে, যার নাচের ইসারায় হাজার হাজার স্তাবক জোটে, রাজার মুকুট পায়ের কাছে লোটে, সে মন ভোলাতে আসবে আমার,—যার সামাজিক লৌকিক আর্থিক কোনো পরিচয়ই নেই? এত সামান্য তোকে কেন ভাববো? তুই ত' একালের হিরোয়িন্। যুব সমাজের আদর্শ। লেখাপড়া জানা মেয়েরা সবাই তোর মতন হ'তে চায়, নতুন মনের ছেলেরা তোকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজো দিতে চায়! আমার মন ভোলাতে চাইবি তুই কোন্ লোভে?

ঈশানী চুপ ক'রে রইলো। একটু পরেই নন্দ এলো চায়ের সঙ্গে একরাশ পানতুয়া নিয়ে। সামনে রেখে সে চ'লে গেল।

শান্তনু একটুও লজ্জা পেলো না। একটার পর একটা ক'রে গোটা চারেক নধর পানতুয়া সে খেলো। ঈশানী উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে সামনে ধ'রে দিল। তারপর তসরের আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নতজানু হয়ে শান্তনুর পায়ের কাছে ব'সে বললে, গুরুদেব, আমিও লোভী, প্রসাদ একটু পাবো কি?

শান্তনু বললে, ওইজন্যেই বলি, মেমসাহেবদের সঙ্গে মিশে তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস, একটুও হিঁদুয়ানী নেই তোর! সুষমা হ'লে আমার এই খাওয়ার পরিশ্রম দেখে পিছন থেকে বাতাস করতো!

বোধ হয় রামতীরথ আসছিল,—চক্ষের পলকে উঠে ঈশানী ঘরে চ'লে গেল। রামতীরথ সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু বললে, আরেক গ্লাস জল পাঠিয়ে দাও ত?

রামতীরথ নিজেই জল এনে দিয়ে গেল। গ্লাস ও পানতুয়ার প্লেট হাতে নিয়ে শান্তনু এবার ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর বললে, এই নে,—তোর গলাতেও মধু ফিরে আসুক।

ঈশানী হাসিমুখে প্লেটটা হাতে নিল।

ওরই পাশে ব'সে শান্তনু পুনরায় বললে, আমার নিজের বর্তমান জীবনও যুবক সমাজের আদর্শ তা জানিস?

পানতুয়া মুখে দিয়ে ঈশানী বললে, কেন?

শান্তনু হাসলো। বললে, সতীসাধ্বী নর্তকীর আশ্রিত-বাৎসল্যে পরিপুষ্ট,—নির্ভাবনায় অন্নবস্ত্র, দিনরাত্রি মন-দেয়া-নেয়ার রস-বিলাস, সুখের স্বপ্নে রঙীন ভবিষ্যৎ, দায়-দায়িত্ব কোথাও কিছু নেই,—এর চেয়ে কাম্য আছে কিছু? এর ওপর যদি আবার বাঁশী বেজে ওঠে, তবে কালিন্দীর কূলে কূলে জোয়ার এসে মাথা টুকে যায়। আমিই ত' বেকার ছেলেদের আদর্শ!

হয়েছে।—গেলাস নামিয়ে ঈশানী বললে, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। এবার যাবার দিন ঠিক কর, নৈলে লোকসমাজে আমি যদি অপদস্থ হই, তুইও মুখ দেখাতে পারবিনে!

তোর জন্যে আমি মুখ দেখাতে পারবো না, মানে? তুই আমার কে রে?

ঈশানী চট্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন মুষ্টিতে শান্তনুর একরাশ চুল ধ'রে নাড়তে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, তুই আমার সকলের বড় শত্তুর!

হাসিমুখে ঈশানী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমেনবাবুর আগ্রহাতিশয্যটা প্রায় দিনরাতই ওদের পিছনে পিছনে লেগে রয়েছে। টেলিফোন করছেন তিনি দিনে অন্তত ছয় সাত বার। সেদিন তিনি অফিসে গিয়েই দিল্লীর ট্রাঙ্ক কল্ বুক করেছিলেন। অতঃপর দিল্লীর সঙ্গে আলাপ ক'রে ঈশানী এবং তার দলবলের নামে হাজার কয়েক টাকার ড্রাফ্ট্ আনিয়েছেন। সুতরাং দিল্লী রওনা হবার তোড়জোড় লেগে গেল।

সেদিন কন্‌ভেণ্ট থেকে ফিরে শান্তনু একটু বেঁকে বসলো। বললে, আমি যাবো না।

তাড়াতাড়ি ছুটোছুটির মাঝখানে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলো, ও আবার কি কথা? আমাকে দয় মজাবি তুই? যাবো কার সঙ্গে?

শান্তনু অন্যদিকে মনোযোগ দিয়ে বললে, তুই ত' একাই একশো! আমি বরং এখানে থাকি, তোর ঘরদোর পাহারা দেবো।

ঈশানী হাসিমুখে বললে, এখানে তুই আমার সম্পত্তির পাহারায় থাকবি, সেখানে নর্তকীর দেহের পাহারায় কে থাকবে, শুনি?

আমি কেন দেবো তার পাহারা? আমি ত' অগ্নি আর নারায়ণকে সাক্ষী রাখিনি!

বিদেশে যদি মাথার ওপর তুই না থাকিস, তাহ'লে চারদিকের ঝুনো ব্যবসাদারদের পাল্লায় প'ড়ে আমার কী দুর্গতি হবে তা তুই জানিস্? তার চেয়ে রমেনবাবুকে তুই ব'লে দে,—আমি চিরজীবনের মতন বরং নাচ-গান ছেড়ে দেবো, কিন্তু তুই না গেলে আমি যাবো না। সকাল বেলা তোর এই দুর্মতি কেন বল্ ত?—ঈশানী সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, একটি সর্তে আমি যেতে পারি।

সর্ত? কিসের?

ভিক্টরকে আমি সঙ্গে নেবো।

ভিক্টরকে?—ঈশানী সবিস্ময়ে বললে, শিলভিয়া ওকে ছাড়বে কেন? কন্‌ভেণ্টের নিয়মকানুন কি তোর জানা নেই?

শান্তনু বললে, নিজের ছেলের ওপর তোর অধিকার নেই কেন?

কে বলেছে নিজের ছেলে? কোনো স্বীকৃতি আমার আছে কি? এমন ভূত তোর ঘাড়ে চাপলো কি জন্যে?

শান্তনু বললে, ভূত নয়! তুই দিল্লী গিয়ে হাজার রকমের হট্টগোলে পড়ে যাবি, দিনরাত থাকবি তোর নিজের দলবল নিয়ে। নাচতে নাচতে তোর দিন যাবে। আর আমি গিয়ে বুঝি সেখানে চানাচুর চিবিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো?

ঈশানী বললে, তোর এই সমস্যা কি আমার মাথায় নেই বলতে চাস?

কি করবি তার জন্যে?

রমেনবাবুকে ব'লে রেখেছি শহরের একটু বাইরে আমার জন্যে একটি বাড়ীর উনি ব্যবস্থা করবেন।

শান্তনু বললে, সেখানে পরগাছার মতো আমি থাকবো কোন্ অধিকারে?

কিন্তু রমেনবাবুর কাছে তোর ত' অন্য পরিচয়!

আমার নিজের কাছে?

ঈশানী বললে, আমি যদি তোকে সমস্ত ঝড়ঝাপটা থেকে নিজের ডানা দিয়ে ঢেকে রাখি?

শান্তনু বললে, কোন্ সুবাদে?

চুপ ক'রে রইলো ঈশানী। পরে বললে, ভিক্টর সঙ্গে থাকলে তোর সে-অবস্থার উন্নতি কেমন ক'রে হবে?

তবু ওরই মধ্যে একটু আনন্দ! সঙ্গী থাকলেই অবাধ স্বাধীনতা, যথেচ্ছ পরিভ্রমণ!

ঈশানী বললে, ভিক্টরকে নিয়ে তুই এখানে-ওখানে ঘুরছিস, এত বেড়াচ্ছিস—আজ চিড়িয়াখানা, কাল ডায়মণ্ডহারবার, পরশু বটানিক গার্ডেনস্,—তবু তোর শখ মিটলো না? শিলভিয়া ওকে ছাড়বে কেন?

শান্তনু হাসিমুখে বললে, শিলভিয়াকে আমি ব'লে রেখেছি। সে রাজি আছে।

অ্যাঁ!—ঈশানী আবার বিস্মিত হোলো,—রাজি হয়েছে? ও, এবার বুঝতে পেরেছি। নাঃ গতিক ভালো নয়!

শান্তনু ওর মুখের দিকে তাকালো। ঈশানী ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, তুই নিশ্চয় তোর ওই সর্বনেশে চেহারা নিয়ে শিলভিয়ার মুখের ওপর হাসিমুখে অনুরোধ জানিয়েছিস, মেয়েটা অমনি গলে গেছে! তাই না?

সম্ভব!—শান্তনু কৌতুকের হাসি হাসলো।

বুঝলুম! কপাল পুড়লো মেয়েটার!

তাহ'লে তোর কপাল পুড়েছে বল্?

ঈশানী বললে, আমার পোড়া কপাল আর পুড়বে কেন?—যাক্, তোর

মতলবটা ভালো। আমি নির্বোধের মতন দিল্লী শহরে নেচে বেড়াবো ওদিকে, আর এদিকে আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যাবে আমারই আঙিনা দিয়া? মাধু অনেক বোকা ছিল, কিন্তু অত বোকা আমাকে ঠাওরাসনে!

ঈশানী বারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে মধুর আওয়াজ দিল, তেওয়ারী?

হুজুর!—নীচের থেকে তেওয়ারী সাড়া দিল।

গাড়ী বাহার করো।

যো হুকুম।

ঈশানী স'রে এসে শান্তনুর ঘরে ঢুকলো। বললে, তোর সেই ক্যামেরা বিক্রির টাকা থেকে শ' পাঁচেক টাকা এখন ধার দে ত?

শান্তনু উঠে গিয়ে টাকা এনে তার হাতে দিল! সমস্ত ব্যাপারটাই তামাসা। তবু সকৌতুকে শান্তনু বললে, এই নিয়ে অনেক টাকাই ত' ধার করলি। এবার নিজেকে বাঁধা রাখতে হবে!

তাই ত' আছি।—ব'লে ঈশানী দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কৈফিয়ৎ নেওয়া চলবে না, পাছে ঈশানীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। পুরুষ নিজেরা চিরদিন অবিশ্বাসী, সেইজন্য মেয়েদের ওপর তাদের বিশ্বাস কম। হারেম বানায় পুরুষ, বোর্খা পরায় পুরুষ, এবং রাজপ্রাসাদে বন্দী ক'রে রেখে কাব্য ক'রে মেয়েদেরকে বলে, অসূর্যম্পশ্যা! সূর্যও দেখে না তাকে। ধনী লোকেরা মেয়েদের সঙ্গে দারোয়ান পাঠায়, ফাঁকির কথা শুনিয়ে বলে, ওটা নাকি মেয়েদের সম্মান। রাজারাজড়ারা ঘেরাটোপের মধ্যে ময়ূরপঙ্ক্ষী পাল্কীতে পাঠায় রাজমহিলাগণকে, নির্বোধ নারীরা পুরুষের কাপট্য বোঝে না। পাল-পার্বণে যোগেযাগে গঙ্গার ঘাটে পুরুষ ভলাণ্টিয়ার মেয়েদেরকে পাহারা দেয় বড় আনন্দে এবং মধুর উল্লাসে। ওদের ভয়, মেয়েরা পাছে হারায়। অনেক মেয়ে যে স্বাধীনতা পেয়ে আত্মহারা হ'তে চায়, ঈর্ষান্বিত পাহারাদাররা একটুও সেকথা ভাবে না। সিনেমার গল্পেও তাই মেয়েদেরকে পুরুষের সঙ্গে মেলাতে পারলে তবেই পুরুষরা খুশী হয়ে পয়সা দেয়। কিন্তু একা মেয়েকে ছাড়লে তাদের প্রাণে বড় দুঃখ লাগে।

মনস্তত্ব জগতে এসব সমস্যার কথা শান্তনু বোঝে, তাই কোনো প্রশ্ন সে তোলে না, পাছে ঈশানী আঘাত পায়। টানাটানি সে করতে চায় না, কেবল নিজেকে সে নিরন্তর প্রকাশ করে—ওতে যদি কোনো মেয়ে অনুপ্রাণিত হয়, তার আপত্তি নেই। ওরা হোলো কামিনী, তাই সংযম ওদের প্রিয়,—বিপরীত রস না পেলে মেয়েরা দুঃখবোধ করতে থাকে। পুরুষের মধ্যে জানোয়ারী চেতনা স্বভাবতই উগ্র, সেইজন্য অনেক সময় বিবেকবিহীন অসংযমের দ্বারা মেয়েদেরকে সে মারে, এবং নিজেও মরে। নদীর উদ্বেলতা যদি তটের বাঁধন অতিক্রম করে, তবে তার চেহারা হোলো সর্বনাশা। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় না আছে শ্রী, না আছে সৌন্দর্য।

ঈশানী এমনি ক'রেই এক একবার বেরিয়ে চ'লে যায়। ঘরদোরের চেহারা তার আলুথালু হয়ে পিছনে প'ড়ে থাকে। টেবলের উপর অলঙ্কার ছড়ানো; দেরাজের মধ্যে টাকাকড়ির টানাটা খোলা, রেশমের শাড়ী আর জামা মেঝের উপর লুটোপুটি,—তার কোল-আঁচলের কোণে কসি পাকানো। উপকরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, আড়ম্বরগুলির প্রতি যত্ন নেই। ঈশানীর দেহটা হোলো তার প্রতিভা সত্তার একটা আবরণ মাত্র। দেহের অন্তরালে তার উর্ধ্বস্ফুটিত প্রাণপদ্ম,—ওই পদ্মের চারিপাশে শান্তনুর মনের ভ্রমর অহোরাত্র গুন্ গুন্ করে। সেই পদ্মগন্ধার ঘরখানার মাঝখানে এসে শান্তনু চুপ ক'রে ব'সে রইলো, এবং ওই মায়াবী ভ্রমর শান্তনুর হৃৎপিণ্ডের গুহালোক থেকে বেরিয়ে সমস্ত ঘরময় গুন্‌গুন্ ক'রে ফিরতে লাগলো।

ওদিকে কন্‌ভেণ্টের ময়দানের মধ্যে ঢুকে ঈশানীর মোটর সোজা এসে থামলো শিলভিয়ার ঘরের সামনে। চেনা মোটরের হর্ণ, সুতরাং শিলভিয়া হাসিমুখে ছুটে বেরিয়ে এলো। গুড মর্নিং, মাধু!

ঈশানী তার করমর্দন ক'রে বললে, দিল্লী যাওয়া স্থির।

শিলভিয়া বললে, সে ত' জানি, তোমার প্রেমিক এসে ব'লে গেছে।

আমার প্রেমিক! কেমন ক'রে জানলে, শিলভিয়া?

শিলভিয়ার মুখে মিষ্টহাসি ভেসে উঠলো। বললে, মেয়েমানুষের জীবনের প্রথম প্রেমিককে লুকিয়ে রাখা বড় কঠিন, মাধু!

ঈশানী বললে, শান্তনু বুঝি বলেছে কিছু তোমাকে ?

ননসেন্স—শিলভিয়া জবাব দিল, তোমার প্রেমিকটি ভীষণ লাজুক, অত্যন্ত কম কথা বলে। এমন ভদ্র ছেলে আমি দেখিনি।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত দুষ্টু, তা জানো, শিলভিয়া ? আমাকে একটুও পরোয়া করে না। তোমার হাতে পড়লে শান্তনু খুব জব্দ হোতো !

শিলভিয়া বললে, বটে,—আর আমি যে চিরকাল কেঁদে কেঁদে মরতুম ?

ঈশানী অবাক হয়ে বললে, কেন ?

শিলভিয়া জবাব দিল, তোমার জন্যেই শান্তনু জন্মেছিল। তোমাকে ছাড়া কোনো মেয়েকে সে ভালোবাসতে পারবে না।

কেমন করে জানলে ?

সেদিন তোমার প্রেমিকটি ভিক্টরের সঙ্গে লাইব্রেরীতে ব'সে গল্প করছিল। আমি গিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালুম ভিক্টরের পাশে। প্রশ্ন করলুম, Mr. Chowdhury, what is that thing, which you are really fond of ? কথাটা শুনে শান্তনু আমার দিকে তাকালো। বললে, Yes, you see, the great mind always inspires me. বললুম, But you cannot always find it around ! Do you ? ভিক্টরের সামনে বসেই শান্তনু বললে, Certainly yes, it is there where I stay on for the present. শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম, মাধু।

বাষ্পাচ্ছন্ন দুটো চোখ ঈশানী সামলিয়ে নিল। মুখে বললে, কিন্তু আমার দিকের কত বাধা আর অসুবিধা তা তুমি জানো, শিলভিয়া !

শিলভিয়া বললে, ক্ষমা করো, মাধু—ওটা তোমার হিন্দুমনের সংস্কার। তাই ব'লে ওটাকে যে অশ্রদ্ধা করি তা নয়, ওটা বুঝতে পারিনে বলেই দুঃখ লাগে। আমার বিশ্বাস কি জানো, শান্তনুও তোমার এই সংস্কারকে শ্রদ্ধা করে। অত্যন্ত ভদ্র মন তার।

কিন্তু আমি যদি এই সংস্কারকে ভাঙতে চাই শান্তনুর সাহায্য পাবো না ?

শিলভিয়া বললে, সেকথা আমি কেমন ক'রে বলবো, মাধু ? তবে

রক্ষণশীল এই সংস্কার তোমার প্রেমিকেরও থাকতে পারে। সে নিজে বিদ্বান এবং পণ্ডিত।

ঈশানী বললে, তুমি হ'লে কি করতে, শিলভিয়া ?

মধুর স্নিগ্ধ হাসি শিলভিয়া হাসলো। বললে, আমি এ ধরণের কোনো মনোভাব নিয়ে গ'ড়ে উঠিনি, মাধু! আমি মিশনারী!

শিলভিয়ার সম্পূর্ণ একখানা হাত নিজের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে ঈশানী বললে, দশ বছর ধ'রে আমার জীবন-সমস্যায় তুমি আর তোমার মা যে সাহায্য করলে, কোনো প্রেমিকের সাধ্য ছিল না আমাকে সেই সমস্যার থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়।—শোনো, ভিক্টরকে যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই, তুমি অনুমতি দেবে ?

শিলভিয়া বললে, তোমাকে মা ব'লে যে ছেলে চেনে না, তাকে সঙ্গে নেবে কেমন ক'রে ?

ঈশানী বললে, শান্তনু ওকে ছেড়ে যেতে চায় না। কি করি বলো ত ?

শিলভিয়া বললে, শান্তনুর সঙ্গে ওর খুব ভাব, তার সঙ্গে ভিক্টর যেতে পারে। কিন্তু ভিক্টরকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাকবো, বললে না ত ?

ঈশানী হাসিমুখে বললে, It's a strange attachment for a missionary, indeed!

শিলভিয়া হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

শান্তনুর সহযাত্রী হবে শুনে ভিক্টর সোৎসাহে তৈরী হয়ে নিল। মানচিত্র দেখে বিদেশের গল্প শুনেছে সে শান্তনুর মুখে। শান্তনু ওকে শুনিয়েছে ভারতের ইতিহাস আগাগোড়া। সভ্যতার পর সভ্যতার কাহিনী দিল্লীর ওপর দিয়ে ভেসে চ'লে গেছে, নয় বছরের বালকটি সে সব গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছে। অনাবিষ্কৃত ভারত তাকে যেন ডাক দিচ্ছে!

শিলভিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়ে আনলো। তারপর ভিক্টরের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ তাকে প্রস্তুত ক'রে দিল। সামনে গরমের ছুটি আসছে, কিন্তু দিল্লীতে নাকি এখানকার চেয়ে গরম বেশী। একথাও শিলভিয়া ব'লে দিল, সেখানে যদি ভিক্টরের বেশী দিন ভালো না লাগে তাহ'লে আমাকে ট্রাঙ্ক

কল্ ক'রে ওকে প্লেনে পাঠিয়ে দিয়ো, আমি ওকে দমদমা থেকে নিয়ে আসবো।

আচ্ছা গো আচ্ছা, মিশনারী মেয়ে, ও যদি বা থাকতে পারে, তুমি ওকে ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারবে না জানি।

শিলভিয়া তার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ লুকিয়ে বললে, তোমার মতন পাষাণী কোনো মেয়ে নয়। সব মেয়ের মনে মা জেগে ব'সে থাকে সন্তান কতক্ষণে কোলে ফিরবে!

ঈশানী তার দিকে একবার তাকালো। বললে, তোমার কোল চিরদিন ভ'রে থাক শিলভিয়া, এই আমি চাই। এসো, ভিক্টর।

ভিক্টর সানন্দে গাড়ীতে উঠ্‌লো। বললে, মাম্মি, মিষ্টার চৌধুরীর কাছে যাচ্ছি ত? আমি কিন্তু ট্রেনে উঠে তাঁর কাছে বসবো, কেমন?

অন্যমনস্ক ঈশানী বললে, নিশ্চয়ই, তিনিই তোমাকে আনতে পাঠালেন।

স্নেহার্দ্রচক্ষু শিলভিয়া দূর থেকে সহাস্যে ওদের দিকে হাত তুললো।

৮

ঈশানীকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি বললে যুক্তিশাস্ত্রে বাধবে। নিজের অপরাধ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত, যদি সেটা যুক্তি দিয়ে কেউ ওকে বোঝায়।

ঈশানীকে প্রশ্ন করলে তখনই সে জবাব দেবে, ভিক্টর তাদের সঙ্গে চলেছে শান্তনুকে সাহচর্য দেবার জন্য, তা'র নিজের কোনো আত্মিক প্রয়োজনে নয়। বাৎসল্যটা স্নেহের মতোই আপেক্ষিক, কারণ সেটা সান্নিধ্য ও সংযোগের অপেক্ষা রাখে। জননী ও সন্তান আজন্ম একত্র থাকে, তা'র থেকে জন্মায় বাৎসল্য। কিন্তু যেখানে এর বিপরীত? সত্যপ্রসূত শিশুকে চোখের আড়ালে নিয়ে যাও, সামনে এনো না কোনোদিন,—দেখা যাবে জননী কিছুকাল বিমনা থাকবে বটে, তার পরে আর কোনো বাৎসল্যের চেতনা নেই। নিত্য সান্নিধ্যই হোলো স্নেহাসক্তির মূল কথা। অনেক জননী তাদের সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে ভয় পেয়ে সন্তানকে ত্যাগ ক'রে পালায়। তা'রা পিশাচী নয়, কিন্তু সমাজের হাত থেকে আঘাত পাবার আতঙ্কে তা'রা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়। তারপরে ক্রমশ বিস্মৃতির প্রলেপ পড়তে থাকে মনে। ভিক্টরের জননী ছিল মাধু, সেই মাধু ম'রে গেছে। প্রসূতি-আগারে মাধু ছিল সপ্তাহখানেক, কিন্তু প্রসবের পর থেকে সে ভিক্টরের আর কোনো খোঁজ খবর পায় নি। সাত বছর পরে কন্‌ভেণ্টে গিয়ে প্রথমে সে ভিক্টরকে দেখে। কিন্তু বাৎসল্যের কোনো চেতনা তা'র মনকে স্পর্শ করে নি। সে ঈশানীর ছেলে নয়, শিলভিয়ার পালিত সন্তান। মাধু ম'রে গেছে, ঈশানী সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

ট্রেন চলেছে অন্ধকার রাত্রে অতি দ্রুত। গাড়ীখানা দুলছে। ভিক্টর যথাসময়ে তার অভ্যাসমতো বর্ধমান স্টেশন আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। গল্প করেছে সে শান্তনুর সঙ্গে অনেক, এবং সে সব গল্পের চৌহদ্দির থেকে

ঈশানীকে সে বাদ দিয়ে রেখেছিল। শান্তনু তা'র আপন, কেন না উভয়ের মধ্যে মনোজগতের জানাজানি, উভয় উভয়কে রসবোধের মধ্যে পেয়ে এসেছে,—কিন্তু ঈশানী তা'র আপন নয়। মাম্মি ব'লে ডাকাটা হোলো রেওয়াজ, ওটা শেখানো বুলি, সামাজিক ভব্যতা,—কিন্তু ওটার মধ্যে জননী কোথাও নেই! শিশু ও বালকের সব চেয়ে যে ব্যক্তি কাছে থাকে, সেই হলো একান্ত আপন—অন্য কেউ নয়। আনন্দ ও আহার লাভের ভিন্ন ক্ষেত্র যদি অধিকতরো আকর্ষণীয় হয় তবে যে-কোনো শিশু অতি অনায়াসে পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে যায়, ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না। নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রয়োজন মতো আহার্য পায় ব'লেই শিশুর কাছে পিতামাতার মূল্য, নৈলে সবটাই অলীক। ঈশানীর সম্বন্ধে ভিক্টরের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য নেই।

অন্যদিকের কথাটাও প্রায় তাই। ভিক্টর সম্বন্ধে ঈশানীর ঔৎসুক্য মাতৃস্নেহোচিত নয়। উভয়ের রুচি, ভব্যতাবোধ, শিক্ষা, সংস্কার,—সমস্তই পৃথক। দু'জন দু'জগতের,—কোথাও পরস্পরের আত্মিক সম্পর্ক নেই। এই ছেলেটিকে একদা সে গর্ভে ধারণ করেছিল, এটা তা'কে চমক লাগায়, কিন্তু একথা ভাবতেই তা'র গা ছমছমিয়ে আসে। সেদিনকার সেই নবজাত শিশু তা'র সংসারানভিজ্ঞা জননীর সঙ্গে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে,—ঈশানী এই দোলায়মান গাড়ীর মধ্যে ব'সে তন্দ্রাজড়ানো চোখে সেই তাদের দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে। মাধুর সঙ্গে সবাই হারিয়ে গেছে।

শান্তনু ওই ছেলেটার বিছানা ক'রে দিয়েছে, খাবার সাজিয়ে সহাস্যে ওর সামনে ধরেছে, সিলিং ফ্যানটা ওর মাথার দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। শান্তনু চেনে ভিক্টরকে, ঈশানী চেনে শান্তনুকে।

আসানসোল ছাড়িয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছে গমগমিয়ে। এ গাড়ীতে ও'রাই তিনজন,—অন্য কেউ নেই। আপার বার্থে আমোদ ক'রে শুয়েছে ভিক্টর, তারই নীচের বার্থে ওরা দু'জন কাছাকাছি বসেছে। নন্দ এসেছে সঙ্গে, কিন্তু সে আছে অন্য গাড়ীতে। বাড়ীতে রয়ে গেল রামভীরথ আর তেওয়ারী, মোটর গাড়ীখানা রইলো চাবিতালা বন্ধ।

ঈশানীর চোখে তা'র নিজের ঘরকন্নাটা একটা খেয়ালের খেলা। ওটার বাঁধন কিছু নেই ব'লেই ওটার মূল্য স্বীকৃত। ঈশানীর প্রাণের মূলকেন্দ্রে ব'সে রয়েছে বৈষয়িক নিরাসক্তি, অনেক সামগ্রী নিয়ে অনেকবার সে নাড়াচাড়া করে, তারপর সেগুলো অনায়াসে সরিয়ে দেয়।

শান্তনুর চোখে ছিল বিস্ময়, মনে ছিল কতকটা অনুশোচনা। জননী ও সন্তানের ভিতরকার এই বিচিত্র সম্পর্কটা তা'র পক্ষে নতুন আবিষ্কার। এতদিন পর্যন্ত তা'র আঙ্কিক মন একটা অনুমান খাড়া করে রেখেছিল, কিন্তু সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হোলো। বারাম্বার সে উভয়ের চেহারা লক্ষ্য করেছে, এবং বারম্বারই নৈরাশ্য তা'কে ঘিরে ধরেছে। উভয়ের মধ্যে সাত সমুদ্রের ব্যবধান। ঈশানীর মধ্যে মাতৃত্বের কোনো উদ্বোধন ঘটেনি।

এক সময়ে ঈশানী মৃদু গলায় বললে, ঘুম পায়নি?

শান্তনু বললে, ঘুম! কই না। কত রাত?

ঈশানী সহাস্য মুখে নিজের কব্জি থেকে হাতঘড়িটা খুললো, তারপর শান্তনুর বাঁ হাতখানা টেনে সেই ঘড়িটি পরিয়ে দিল। শান্তনু বললে, এর মানে?

ঈশানী বললে, আমি বাস করি অনন্তকালের মধ্যে,—সময় নিয়ে তুই মাথা ঘামা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখা গেল রাত একটা বেজে গেছে। এই মাত্র কি যেন একটা স্টেশন পেরিয়ে গেল। পার্বত্য উপত্যকার আশে পাশে ট্রেন চলেছে। বেশ লাগছিল।

শান্তনু বললে, তোর সঙ্গে আমার কোনও প্রকার সামাজিক সম্পর্ক থাকলে এই ভ্রমণ এমন সুন্দর মনে হোতো না। কিন্তু এ তুই কি করলি, বল্ ত?

ঈশানী নিদ্রারসে ভরা দুই চোখে তা'র দিকে তাকালো। শান্তনু বললে, এ রকমটা দাঁড়াবে, এ আমি কোনোমতেই ভাবতে পারিনি।

ব্যাপারটা খুব অস্পষ্ট নয়, তবু ঈশানী মৃদুকণ্ঠে বললে, কেন? কি বলছিস?

শান্তনু চাপা কণ্ঠে বললে, ভিক্টরকে সঙ্গে এনে কি আমি সত্যিই ভুল করেছি?

শিলভিয়া ছলছল চোখে ঈশানীর প্রতি চেয়ে রইলো। এক সময় বললে, তোমার কি সন্দেহ হয় যে, দত্ত চৌধুরী তোমাকে গ্রহণ করলে শান্তনু খুশী হয় ?

ঈশানী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, এ আলোচনাও আমার কাছে ঘৃণ্য শিলভিয়া, অথচ এই কথা নিয়েই শান্তনুর সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। ছেলেমানুষ হোলো শান্তনু, একথা সে বোঝে না যে, মেয়েমানুষের কাছে সমাজনীতির চেয়ে প্রাণের নীতি অনেক বড়। ভালোবাসার জন্যে মেয়েমানুষ যে সংসারের সব ভালো জিনিস অত্যন্ত অবহেলায় ত্যাগ ক'রে যায়, একথা শান্তনুকে বোঝানো যায় না।

শিলভিয়া বললে, এ রকম কোনো সমস্যাই আমাদের দেশে নেই, সে জন্য এ নিয়ে আমাদের মনে কথাও ওঠে না। কিন্তু তুমি এখন কি করবে ভাবছো ?

ঈশানী বললে, আমার চারদিকে সমস্যার ভীড়, জানিনে এর থেকে মুক্তি কোন্ দিকে। এর ওপর তুমি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছো তোমার ছেলেটিকে নিয়ে। তবু যে দুদিন তুমি আছো, তোমাকে আমার সমস্যায় আর ভারাক্রান্ত করতে চাইনে, শিলভিয়া। শুধু একটা কথা আমাকে বলো, ভারতবর্ষ ছেড়ে না গেলেই কি তোমার চলবে না ?

শিলভিয়া বললে, আঠারো বছরের বেশি আছি এই কলকাতায়। মা মারা গেলেন, কত ঝড়ঝাপটা ব'য়ে গেল এদেশের ওপর দিয়ে, বাবা চ'লে গেলেন বিলেতে, আমি তবু নড়িনি। এ দেশকে ভালোবাসি ব'লেই আছি। কিন্তু ওরা আমাকে আর থাকতে দেবে না। প্রথমত 'আত্মোৎসর্গ' করিনি, দ্বিতীয়ত— তোমাকে বলতে বাধা নেই, ভিক্টরের সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্ব ওরা পছন্দ করলো না। ওরা দয়া বোঝে, স্নেহ-ভালোবাসা বোঝে না। তাই আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে।

শেষের কথাটা ঈশানী চমৎকৃত হয়ে শুনলো। কফির পেয়ালাটা শেষ ক'রে সে বললে, তুমি যদি ভিক্টরের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে এদেশেই 'সিটিজেনশিপ' নিয়ে থেকে যাও, তোমার আপত্তি আছে কিছু ?

শিলভিয়া বললে, কোন্ অবলম্বন নিয়ে থাকবো ? আমি তোমার কাঁধে চড়বো না, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

জানি বৈ কি শিলভিয়া, তোমার নিজের গৌরব নিয়েই তুমি থাকবে। এ কথা তুমিও জানো, যে-ঋণ তোমার কাছে আমার আছে, সমস্ত জীবন দিয়েও সে-ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। সাহেববাগানের সেই বাড়ীতে সেই দুর্দিনে তোমার দেখা না পেলে আমার জীবন কি ধ্বংস হয়ে যেতো না ? শোনো, আমার একটি অনুরোধ রাখো, কোথাও তুমি যেয়ো না। কন্‌ভেন্ট্ থেকে বেরিয়ে তুমি দিল্লী চ'লে যাও, সেখানে ভিক্টরকে নিয়ে একটা থাকার বন্দোবস্ত করো। আমার বিশ্বাস, তুমি গিয়ে দাঁড়ালে শান্তনু তোমাদের সব গুছিয়ে দেবে। ওখানে বেশ ভালো ইস্কুলে পড়বে ভিক্টর, তুমি তার সব দায়িত্ব নেবে! আর খরচপত্রের কথা ? কন্‌ভেণ্টে টাকা না দিয়ে তোমার হাতেই দেবো ?

শিলভিয়া বললে, তুমি কি করবে ?

আমি !—ঈশানী বললে, আমার ভাসমান জীবন ভেসেই বেড়াবে! তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের নাচগানের স্কুল যেভাবে চলছে, এভাবে বেশিদিন আর নয়। বোধ হয় ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনেও একটা বড় রকমের অদল-বদল আসতে পারে।

শিলভিয়া বললে, সেটা কি ধরণের ?

ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু রমেনবাবু শেষ পর্যন্ত কি প্রকার ব্যবস্থা করেন, এটা না জানলে বলতে পারবো না।

শিলভিয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর একটু হাসলো। বললে, দত্ত চৌধুরীর কথাটা ভেবে ভারি মজা লাগছে। লোকটা তোমাকে একেবারেই চিনতে পারেনি, কি বলো ?

ঈশানী বললে, চিনতেও পারেনি, সন্দেহও করেনি। আমার মুখখানা ছিল রং করা, তার ওপর মাথায় মুকুট, পরনে ঘাগরা! কিন্তু ওর মধ্যে শান্তনুর দুষ্টুমি ছিল। ফন্দি ক'রে ও এনেছে লোকটাকে আমার সামনে, আমার ভাবান্তর দেখার জন্যে। কিন্তু অত পরিশ্রমের পর হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি জ্ঞান

হারাই। শান্তনু বাঁশী বাজিয়ে জানিয়ে দিল, ওটাই নাকি আমার প্রেমের লক্ষণ। এমনি দুষ্টু শান্তনু।

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, কমলা কিংবা ভিক্টর কিছু জানে?

বিন্দুমাত্রও না।

দত্ত চৌধুরী?

ঈশানী খুব হাসলো। বললে, স্বপ্নেও সন্দেহ করে না। তুমি, আমি আর শান্তনু—এ ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না।

তুমি কি ভাবছো, সব কথা প্রকাশ করবে একদিন?

আমার কোনো স্বার্থ থাকলে করতুম বৈ কি!—ঈশানী বললে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ আমার নেই। লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, যেন নতুন আবিষ্কার। দশ বছর আগে লোকটা আমাকে সেই পড়োবাড়ীর ভগ্নস্তূপের পাশে গিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল, সে যেন স্বপ্নের কাহিনী,—বিন্দুমাত্র সত্য যেন তার মধ্যে নেই!

শিলভিয়া বললে, এ রকম মনোভাব তোমার হোলো কেন? শান্তনুকে পেয়েছ ব'লে?

ঈশানী বললে, না শিলভিয়া, এর মধ্যে ভালোবাসাটাই যে ছিল না, তাই দেহের আঁচড় মনে হ'লেই গা ঘিন ঘিন করে! তা ছাড়া তুমি ভেবে দেখো, ঝড় এসে সেদিন আমার সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিল! বাবাকে খুন করলো, পিসিমা জলে ডুবলো, বাড়ীতে আগুন ধরালো। চারদিকে দুর্ভিক্ষ আর অরাজকতা। সেই বিপ্লবের মধ্যে প'ড়ে একটা ক্লাস টেন্‌-এর মেয়ের সমস্তটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল!

শিলভিয়া বললে, কিন্তু লোকে যে বলে, জীবনের প্রথম রোমান্স কেউ ভোলে না?

ওটা ত' রোমান্স নয়, শিলভিয়া? ওটা অপঘাত, যাকে বলে দুর্ঘটনা! অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে খানায় প'ড়ে যাওয়া। মনের মধ্যে কোনো চেতনা জন্মাবার আগে কোনো শিশুর যদি মা ম'রে যায়, তবে সেই শিশুর শোক হয় না।

অভাবের জন্য সে কাঁদে, অভাব মিটলে সব ভুলে যায়। সেদিন দত্ত চৌধুরী কোনো রোমান্স রেখে গেল না,—শুধু ঘৃণা রেখে গেল আমার আপাদমস্তক। অজ্ঞানকৃত বীভৎস নোংরামির মধ্যে যেন আমার নতুন জন্ম হোলো। তোমাদের ওখানে যখন এসে পৌঁছলুম, তখন কেবল কোনোমতে বাঁচবার কথাটাই মনে ছিল। তারপর পড়াশুনো করেছি অনেক, নাচ-গান শিখে পাঁচটা লোকের সাহায্যে একটা প্রতিষ্ঠানও গড়েছি, অবস্থাও ফিরেছে অনেকটা, অভাবও তেমন কিছু নেই। কিন্তু আজ শান্তনু যখন সামনে এসে দাঁড়ালো,—তখন মনে হচ্ছে, এ জীবনে আরেকটা অর্থ আছে, আরেকটা আনন্দ আছে, আমি সেটায় বঞ্চিত। আমার বিশ্বাস, জীবনে এই প্রথম পুরুষ দেখলুম! একথা তুমি জানো, অসংযমের মধ্যে যার জীবন আরম্ভ, পরবর্তী কালে সংযমের শ্রী দেখলে সে সহজে মুগ্ধ হয়। শান্তনুর নির্লোভ সংযমের মধ্যে আমি দেখলুম তার প্রাণরশ্মির উত্তাপ, যে তুষার আমার মধ্যে জমে-জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, সেই বরফ গ'লে স্রোতস্বিনী হয়ে নামছে। মিলনের কথা এখানে বড় নয়, শিলভিয়া—কিন্তু শান্তনুকে পাবার জন্যে যদি বাকি জীবন আমাকে কাঁদতেও হয়, তাতেও আমার আনন্দ!

ঈশানীর চোখ দুটো আবার ঝাপসা হয়ে এলো। বেলা গড়িয়ে এসেছিল, শিলভিয়া এবার ছুটি নিতে চাইলো। ঈশানী কলিং বেল বাজিয়ে নন্দকে ডাকলো, এবং ব'লে দিল তেওয়ারীকে গাড়ী বা'র করতে।

শিলভিয়া বললে, আজকের রাতটা তোমার প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে দাও। কাল সকালে গির্জা ফেরৎ তোমার কথার জবাব দেবো। তবে ভিক্টরকে আজই আমি চিঠি পাঠাচ্ছি।

দু'জনে উঠে এলো বাইরে। বিদায় নিয়ে শিলভিয়া নীচে নেমে গেল।

শিলভিয়ার গাড়ী বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো। ঈশানী এসে রিসিভার কানে তুলতেই রমেনবাবুর সাড়া পাওয়া গেল। ঈশানী বললে, হ্যাঁ আমি।—

রমেনবাবু বললেন, তোমার দাবী যদি মেটাতে হয়, তবে আমাকে সর্বস্বান্ত হ'তে হবে, ঈশানী।

ঈশানী বললে, এ সব আমার বিবেচনা করার কথা নয়, রমেনবাবু।

তুমি কি পুলিশে ডায়েরী লিখিয়েছ আমার সম্বন্ধে ?

এ আলোচনাও এখন থাক।

কতদিন তুমি আমাকে সময় দিতে পারো ?

আমার বিশ্বাস, পুলিশকে আমি মাসখানেক থামিয়ে রাখতে পারবো!

রমেনবাবু বললেন, আমার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান, ঈশানী।

ঈশানী বললে, বেশ ত', আনন্দের কথা। তবে আপনি সম্পূর্ণ টাকা শোধ ক'রে দিলে তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করার সুবিধে হবে, তার আগে নয়।

রমেনবাবু বললেন, তুমি যদি অনুমতি করো তাহ'লে আমি একবার দিল্লী গিয়ে শান্তনুবাবুকে তোমার ওখানে ডেকে আনতে পারি।

কেন ? শান্তনুবাবু এর মধ্যে আসবেন কি জন্যে ?

রমেনবাবু সঠিক জবাব দিতে পারলেন না। ঈশানী বললে, আমার অনুরোধ, আপনি কোনো নোংরা কৌশলে যাবেন না। বরং সময় নষ্ট না ক'রে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা পান। এবার ছেড়ে দিচ্ছি,—নমস্কার।

রিসিভার রেখে ঈশানী কতক্ষণ সেখানে ব'সে রইলো, তারপর আবার ফোন তুলে নম্বর দিয়ে ডাকলো পুলিশের থানায়,—মিত্র সাহেব আছেন ? ঈশানী রায় বলছি।

মিত্র সাহেব ফোন ধরলেন। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে বললে, ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সীজ্ করেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোককে এখন হায়রাণ করবেন না। উনি এক মাসের সময় নিয়েছেন। এক বুড়ির কাছে সস্তায় সম্পত্তি কিনেছেন খবর পেলুম। ওটা বেচলে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা হুমকি দিলে সব টাকাই উনি ফেরৎ দেবেন।

মিত্র বললেন, কিন্তু এত বড় একজন জালিয়াৎকে আপনি ছেড়ে দিতে চান ?

ঈশানী বললে, পুলিশও ত' ঘুষ খায়, মিষ্টার মিত্র? লোভ থেকেই ত' অসাধুতা আসে।

টেলিফোনের দুই পার থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল।

পরদিন যথাসময়ে শিলভিয়া ফোন করলো। বললে, ঈশানী, তোমার প্রস্তাব আমি পুরোপুরি এখন মেনে নিতে অসুবিধা বোধ করছি! কোনো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিনে, কারণ দিলেই সেটা পালন করতে হবে। তবে তোমার প্রস্তাবমতো দিল্লী যেতে আমি প্রস্তুত হচ্ছি। কিছুদিন ভিক্টরকে নিয়ে দেখা-শোনা করবো।

ঈশানী বললে, তোমার কোনো সিদ্ধান্তের ওপর আমি কখনও কথা বলিনি, শিলভিয়া। ভিক্টর তোমার ছেলে, আমার নয়! তুমি তার অভিভাবক, তার সব ভালো-মন্দ তোমার হাতে। সুতরাং তুমি দিল্লী যেতে চাচ্ছ, এ আনন্দের কথা। আমি জানি, তোমার মানসিক সংগ্রাম! তুমি যাকে ছেড়ে পালাতে চাচ্ছ, সে তোমার সব পথ অবরোধ করছে। তোমার সব পথ খোলা, কিন্তু মনের মধ্যে মুক্তি নেই।—যাই হোক, যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আগের দিন তুমি আমার এখানে আসবে, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। টাকাকড়িও সব প্রস্তুত থাকবে!

আচ্ছা।—ব'লে শিলভিয়া ফোন ছেড়ে দিল।

প্লেন-এ যেতে শিলভিয়া রাজি হোলো না। তাড়া ত' কিছু নেই, ধীরে-সুস্থে যাবে। তা ছাড়া ভিক্টরের অনেক জিনিসপত্র, তার খেলনার আসবাব, তার লাইব্রেরী, তার পোষাক-পরিচ্ছদ,—তা'র যত রকমের সংগ্রহ। শিলভিয়া বোধ হয় সাত জন্মে কারো মা হয়নি, এ জন্মে পেয়ে গেছে ভিক্টরকে। যতদূর মনে হচ্ছে, পরের বোঝা বইবার জন্যই ওর জন্ম। শিলভিয়া ইংরেজ জাতির মান রেখেছে। ঈশানী তার জন্য সব গুছিয়ে দিয়ে ট্রেনের বার্থ রিজার্ভ ক'রে দিল। কন্‌ভেণ্টের চলতি পোষাক শিলভিয়াকে ছাড়তে হোলো। ঈশানী তাকে উপহার দিল এক জোড়া ভালো গাউন, এক জোড়া জুতো, একটি নরম চামড়ার সুটকেশ এবং টয়লেটের বাক্স। নিজের আঙুলের হীরের আংটি খুলে

শিলভিয়ার আঙ্গুলে পরিয়ে দিল। শিলভিয়া হাসিমুখে বললে, বুঝেছি তোমার মতলব, এ সব আমাকে দেওয়া হচ্ছে ঘটকালির বকশিস!

ঈশানী তার গাল টিপে আদর ক'রে বললে, পোড়ারমুখী, তুই যদি আমার সতীন হতিস তাহ'লে দুঃখ ছিল না!

ভিক্টরের কাছে চিঠি ও টেলিগ্রাম আগেই চ'লে গেছে। সুতরাং ওদিকটা নিশ্চিন্ত। শান্তনুর সুটকেশটা ঈশানী দিল শিলভিয়ার সঙ্গে, চিঠি একখানা দিল সুটকেশের মধ্যে। অতঃপর শিলভিয়াকে গাড়ীতে নিয়ে ঈশানী হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো।

কিন্তু তার নিজের মুক্তির পথটা কই? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে প্রকাণ্ড জাল বিস্তার করেছে, তার থেকে বা'র হবার পথ নেই। ফ্ল্যাট ভরা তার আসবাব, নিজের মোটর, অত বড় এক প্রতিষ্ঠান,—বৈষয়িক জীবনের অসংখ্য বন্ধন, এতগুলি লোকজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। এর উপরে শান্তনু, ভিক্টর, শিলভিয়া! এদের উপরেও তার নিজের প্রাণসমস্যা।

ঈশানীর বন্ধনজর্জর মন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অস্থির হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শ্রাবণের বর্ষা পেরিয়ে গেল তার চোখের উপর দিয়ে। ধীরে ধীরে আকাশে ফুটলো ঘন নীলাভা, ছিন্ন মেঘের দল শ্বেত উত্তরীয় উড়িয়ে ভেসে চললো মানস সরোবরের দিকে। শরৎ এসে পৌছলো।

শিলভিয়ার চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে যথাসময়ে। হোটেল থেকে সে একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে। ভিক্টর ভালো স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দত্ত চৌধুরী আর কমলা এর মধ্যে এসেছেন দু'একবার। অনেক অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও শান্তনু এখানে থাকেনি, তবে সে প্রায়ই আসে ভিক্টরকে দেখতে। শিলভিয়া লিখেছে, কলকাতায় ফিরে যেতে শান্তনুর বিশেষ উৎসাহ দেখিনে। মুস্কিল এই, আমার কোনো কথার জবাব দিতে সে অত্যন্ত লজ্জা পায়। সেদিন সে আমাদের এখানে ব'সে গুটিপোকা আর মৌমাছির চাষ সম্বন্ধে মস্ত বক্তৃতা দিয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, তার মনটা এখন বন-জঙ্গলের দিকে, কোনো মানুষের

দিকে নয়। শাস্তনু তার অমায়িক এবং মধুর আচরণে আমাকে মুগ্ধ ক'রে গেছে। তোমার কথা তুলে তাকে প্রশ্ন করলেই সে খুব হাসে। বলে, উনি ত' নাচ-গান নিয়েই জীবন কাটাবেন, উনি হলেন জনসাধারণের হিরোইন। গুটিপোকা আর মৌমাছি নিয়ে উনি মাথা ঘামাবেন কেন? তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের আরও উন্নতি হোক, এইটি শান্তনুর একমাত্র কাম্য। তোমার স্যুটকেশ ও চিঠি সে নিয়ে গেছে, কিন্তু তার ঠিকানা সে আমার কাছে বলতে ইচ্ছুক নয়। ভিক্টর পর্যন্ত জানে না।

গুটিপোকা কেমন!—ঈশানী মাঠের ধারে তার গাড়ীখানা রেখে অনেক দূর যেতে যেতে ভাবে। গুটিপোকার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে ফেনার মতো। ওরই সাহায্যে নিজের চারদিকে সে নিজেরই অবরোধ রচনা করে। সেই অবরোধের মধ্যেই তার সমস্ত জীবনযাত্রার সীমা, তারই মধ্যে তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। আপন মৃত্যুর দ্বারা অবশেষে আপনারই ঐশ্বর্য রচনা ক'রে যায়।

ঈশানী হাঁটতে হাঁটতে ঘোরে দূর থেকে দূরে। এক সময়ে ক্লান্ত পা টেনে টেনে আবার ফিরে এসে গাড়ীতে উঠে নিজেই চালায়। সন্দেহ নেই, নিজের চতুর্দিকে নিজেই সে মৃত্যু রচনা করেছে। এর চেয়ে মৌমাছি ভালো বৈ কি। মধু সংগ্রহ করে সে নিজের জন্য। মক্ষীরাণী থাকে ঠিক মাঝখানে, তাকে ঘিরে যত মধুসঞ্চয়। তারপর কবে যেন দেখা দেবে ভরা শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না, তখন মৌমাছির দল সমস্ত মধু পান ক'রে উড়ে যাবে দূর থেকে দূরে আপন মদমত্ততায়!

কোন্‌টা ভালো ঈশানী বোঝে না। গাড়ীখানা নিয়ে সে ঘোরে এপথ থেকে ওপথে, এক অঞ্চল থেকে ভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু নিজের কাছে এ দাসত্ব চলবে তার কতদিন? পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর সম্ভারে তার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত। নিজের হাতে এতদিন ধ'রে সে যা রচনা করেছে, এ সব কি তার একান্তই কাম্য ছিল? তার মধ্যে যে-অধীর প্রাণ, যে-অস্থির প্রতিভা সৃজনচাঞ্চল্যের নেশায় একটির পর একটি বস্তু রচনা ক'রে এসেছে এতদিন, তার এই গুরুভার বোঝা কেমন ক'রে সে বহন করবে? প্রস্ফীত তরঙ্গ আপনার ভারে কি আপনি চুরমার হয়ে যায় না? রূপ, স্বাস্থ্য, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি—যা কিছু তার কাম্য

ছিল, সমস্ত পাবার পরেও কেন তার এমন ভয়াবহ শূন্য মনে হচ্ছে? সমস্ত কাম্যবস্তু লাভের পরেও কেন তার এই প্রশ্ন ওঠে, কাম্যবস্তুর বাইরেও প'ড়ে আছে একটা বড় জীবন,—একটা মহৎ কিছু,—যেটার পরম আস্বাদ আজও তার জানা নেই।

গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে সে বাড়ী ফিরে এলো। চোখ দুটো জ্বালা করছিল, আঁচল দিয়ে মুছে সে উপরে উঠে গেল। বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে আসবার পথে সে দেখলো একজন চাপরাশি তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে সেলাম জানিয়ে চাপরাশি একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা এসেছে এটর্নীর বাড়ী থেকে। ঈশানী খুশী হয়ে বললে, আচ্ছা, তুমি যাও।

লোকটা চ'লে যাবার পর ঈশানী ঘরে এসে শান্তনুর পাঠানো সেই বাণ্ডিলটা খুলে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপরে খুললো আলমারি, এবং দু'তিনটে ড্রয়ার। তার ভিতর থেকে বার করলো অনেক-গুলো দলিলপত্রের বাণ্ডিল এবং বহুপ্রকার চুক্তিপত্র। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে যখন সমস্তগুলো গুছিয়ে তুলছে, সেই সময়ে বাইরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো! রামতীরথ এসে জানালো, রমেনবাবু।

ঈশানী উঠে গিয়ে রিসিভার ধরলো। রমেনবাবু ফোনে বললেন, প্রায় এক মাসের চেষ্টায় টাকা আমি যোগার করেছি, কিন্তু সে টাকা আমি নিজে গিয়ে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই।

ঈশানী একটুখানি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, আমার হাতে দেবার এই আগ্রহ কেন আপনার? আপনি সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিন্।

রমেনবাবু মিনতি ক'রে বললেন, পুলিশ আমাকে আজ তিন সপ্তাহ ধ'রে হায়রাণ করছে। তোমার টাকা তোমার হাতে দিতে পারলেই ওদের কাছে আমার মান রক্ষে হয়।

বেশ আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এখনই যাচ্ছি। তবে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, আমি উপস্থিত থাকবো।

রিসিভার রেখে দিয়ে ঈশানী এ ঘরে এলো, এবং মিনিট দশেকের মধ্যে

সমস্ত কাগজপত্র এবং বাণ্ডিলগুলি একটির পর একটি গুছিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। ফটকের সামনে তেওয়ারী গাড়ী নিয়ে প্রস্তুত ছিল।

বেলা দুটো বাজে। এ রকম সময়ে ওদের প্রতিষ্ঠানের চাকর-বাকর ছাড়া আর বিশেষ কেউ থাকে না। শুধু আপিস ঘরে থাকেন নানুবাবু আর রমেনবাবু। ঈশানী সোজা উপরে উঠে এসে আপিস ঘরে ঢুকতেই রমেনবাবু শান্তভাবে বললেন, তোমার কাছে অকপটে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করছি, ঈশানী। কিন্তু—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও আমি তোমার টাকার একটা মোটা অংশ যোগাড় করতে পারিনি।

ঈশানী মুখ ফিরিয়ে তাকালো। রমেনবাবুর চোখ দুটো রাঙ্গা,—বুঝতে পারা যায় বহু বিনিদ্র রাত্রি তাঁকে অত্যন্ত উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে।

তিনি বললেন, লোভে প'ড়ে ছেলে তিনটের নামে বর্ধমানের ওদিকে একটা সম্পত্তি কিনেছিলুম হাজার পঁচিশেক টাকায়,—বাগান, বাড়ী, পুকুর আর খানিকটা ধানজমি নিয়ে সম্পত্তি। কিন্তু তার পেছনে যে দু' তিনটে মামলা ঝুলছিল, তাড়াতাড়িতে সেটা বুঝতে পারিনি। ঈশানী, সেই সম্পত্তির সমস্ত কাগজপত্র তুমি নিয়ে আমাকে রেহাই দাও, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। আমি জানি এ প্রার্থনা জানালে পুলিশ আমাকে ক্ষমা করবে না, কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ আবেদন।

রমেনবাবুর চোখে জল এল। পুনরায় তিনি বললেন, গেল কাল মোট পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আমি আমার একাউণ্টে জমা দিয়েছি, সেই টাকার ওপরেই তোমাকে মোট পঁয়ষট্টি হাজার টাকার চেক্ দিচ্ছি, তুমি আমাকে মুক্তি দাও, ঈশানী।

ঈশানী চুপ ক'রে সমস্তটা অনুধাবন করলো। তারপর শুধু বললে, ব্যাপারটা পুলিশ আর এটর্ণীর বাড়ী পর্যন্ত যখন গেছে, তখন নিজের হাতে আর চেক্ আমি নেবো না। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

পোষমানা জন্তুর মতো ঈশানীর পিছনে পিছনে রমেনবাবু সেই চেকটি নিয়ে অগ্রসর হলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পুনরায় বললেন, ঈশানী, তুমি

জানো আমি ছা-পোষা লোক, পুলিশ যদি কোনো ছুতোয় আমাকে গারদে টেনে নিয়ে যায়, তাহ'লে গেরস্থটা একেবারে শুকিয়ে মরবে।

ঈশানী কেবল বললে, আসুন, আমি ত' সঙ্গেই রইলুম।

তুমি ভরসা দিচ্ছ ?

হ্যাঁ, আসুন।

ওরা দুজন এসে গাড়ীতে উঠলো। তেওয়ারীর পাশে ব'সে রয়েছে আর একটি লোক। ঈশানী কেবল বললে, উনি থানা থেকে এসেছেন, পুলিশের লোক। আপনার সঙ্গে মিটমাটটা উনি দেখে-শুনে রিপোর্ট নিতে চান্। কেসটা খারাপ কিনা!

রমেনবাবু কেবল কাঠ হয়ে ব'সে রইলেন।

এরপর আনুপূর্বিক খুঁটিনাটিগুলো অত্যন্ত জটিল। ঘণ্টা তিনেক লাগলো সমস্ত ব্যাপার মিটতে। ঈশানী এই সঙ্গে তার নিজের কাজগুলোও মিটিয়ে নিল। কাগজপত্রাদি এটর্নী আপিসেই প্রস্তুত ছিল। ওদের প্রতিষ্ঠান ট্রাষ্টিতে পরিণত হয়ে গেল। লভ্যাংশের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছরে শান্তনু চৌধুরী পাবে—যেখানেই সে থাক্। ঈশানী তার সমস্ত টাকা এবং প্রতিষ্ঠানের সমস্ত স্বার্থ শান্তনুর নামে স্বেচ্ছায় দান ক'রে দিল। শান্তনুর একাউণ্টে জমা পড়লো অনেক টাকা।

রমেনবাবু শিউরে উঠলেন বৈ কি। এটর্নী তাকালেন ঈশানীর দিকে। মেয়েটা জাত আর্টিষ্ট কিনা, তাই এমন ভয়ানক খেয়ালী! প্রতিভা কখনও চল্‌তি ধারণার পথ ধ'রে চলে না। রমেনবাবুর প্রতি বক্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে এটর্নী মিষ্টার বাসু বললেন, আপনিও হাজার পঁচিশেক টাকার সম্পত্তি পেলেন বটে, তবে সেটি উদ্ধার করতে হয়ত লাগবে হাজার পঞ্চাশেক টাকা।

রমেনবাবুর গলা শুকিয়ে উঠেছিল।

প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টির মধ্যে রইলেন এই এটর্নী, এবং রমেনবাবুও তাঁর অভিশপ্ত চাকরিতে বহাল রইলেন। তাঁর সামনেই আজ অশরীরী শান্তনু লক্ষপতি হয়ে গেল। স্বয়ং এটর্নী ঈশানীকে দিয়ে সর্বপ্রকার সই-সাবুদ করিয়ে নিলেন।

কাল সকালে সমস্তটা রেজেষ্টারী হবে, এবং শান্তনু যেখানেই থাক—কাল সকালে সে অতুল সম্পদের অধিকারী হবে। শান্তনুর আশ্রিত রইল তিনটি প্রাণী,—ঈশানী, ভিক্টর এবং শিলভিয়া। ওই আপিসে ব'সেই ঈশানী আরেকবার শান্তনুর সেই কাগজপত্রগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি ক'রে ফেলে দিল। আজ সে বাঁচলো। সম্পূর্ণ রিক্ত হবার উল্লাসে ঈশানীর মন যেন নেচে উঠছিল।

আপিসের ভিতরে এক কোণে ব'সে একটি লোক এতক্ষণ যেন উসখুস করছিল। এবার সে উঠে এসে হাসিমুখে ঈশানীকে নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালো,—আমাকে চিনতে পারেন? সেই মিহিজামে—।

ঈশানী সহাস্যে বললে, পারি বৈ কি, আপনি ত' শান্তনুর দাদা! যাক্, আপনাকে দেখে ভারি আনন্দ হোলো। বৌদিদিকে বলবেন, শান্তনুবাবু এখন মস্ত বড়লোক। তিনি দিল্লীতে থাকেন এখন।

এই এত টাকা আপনি তাকে দিলেন?

ঈশানী হাসলো। বললে, মোটেই না। এ সমস্ত তারই টাকা, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল! যাক্‌গে, আপনি যে এখানে?

গলা পরিষ্কার ক'রে ভদ্রলোক বললে, আমি এই এটর্নীর আপিসে চাকরি করি!

তাহ'লে ভালোই হলো। ছোট ভাইয়ের ফাইলটা বেশ যত্ন ক'রে রাখবেন, এই অনুরোধ রইলো। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য পালন করবেন।

দাদা একেবারে স্তব্ধ। ঈশানীরা বিদায় নিয়ে উঠলো। পুলিশের ভদ্রলোকটি এখান থেকেই বিদায় নিলেন। গাড়ীতে ওঠবার আগে রমেনবাবু বললেন, শান্তনুকে সর্বস্ব দিয়ে গেলে, আজ থেকে তোমার কেমন ক'রে চলবে, ঈশানী?

ঈশানী সহাস্যে বললে, একমুঠো অন্ন কি শান্তনু আমাকে দেবে না?

১৪

কান্না পাচ্ছিল ঈশানীর। কিন্তু তার ধারণা, এই যে অবাধ্য চোখের জল—এ কান্না সুখের। নিবিড় সুখ বোধ হয় বেদনারই মতো। পার্থক্যটা সূক্ষ্ম। সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরকে পাবার জন্য বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ে চোখের জল নিয়ে। অনুরাগের আনন্দ আর বিচ্ছেদের বেদনা—দুই মিলে অশ্রু। সব পেয়েছিল ঈশানী আপন প্রতিভার শক্তিতে, কিন্তু তবু ব'সে ব'সে তাকে হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে হোলো। যা পেয়েছে তা অল্প, অল্পে তার সুখ নেই। শিশুকে ভোলানো হয়েছিল খেল্না দিয়ে,—শিশু আবদার ধরলে সেই আনন্দের খেলনাগুলোকেই লাথি মেরে সরিয়ে দেয়!

ঈশানী তার বড় সাধের ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রগুলো নিলাম ব্যবসায়ীকে ডেকে বিক্রি ক'রে দিল। দুঃখ কিছু নেই, কেন না প্রতি সামগ্রীর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি প্রশ্ন,—কেন! কেন এই আড়ম্বর? কেন এই সম্ভোগ? কেন চারদিকে এই জঞ্জাল জড়ো ক'রে মাথা ছাপিয়ে তোলা? এরা বাহ্যিক অলঙ্কার, এরা প্রসাধন, এরা অঙ্গাবরণ,—কিন্তু দেহটার মধ্যে প্রাণ কই? মন্দির নির্মাণ করেছ অভ্রভেদী বিরাট, চূড়ায় তার শত সহস্র মণিমাণিক্যের সমাবেশ,—ভিতরে নারায়ণ কই? ঈশানীর সমস্তটা ছিল দৈহিক, সমস্তটাই তার যৌবন-বিলাস,—কিন্তু অন্তর্যামী রয়ে গেল নিত্য উপবাসী। অহঙ্কার ছিল ব'লেই অলঙ্কার ছিল, আত্মাভিমান ছিল ব'লেই আসবাবপত্র ছিল ঘরভরা, বস্তুর অভাব ছিল ব'লেই বাস্তবের এত বাহুল্য,—আজ তার আপন স্বরূপ সম্পূর্ণ নিরাবরণ হোক। আজ নিঃস্ব না হ'লে নিজেকে আর চেনা যাবে না। নিজেকে চেনা, কিন্তু নিজকে চেনানোও বটে। আমি প্রকাশ করি, কিংবা প্রকাশিত হই,—কোন্‌টা? একটির পর একটি আবরণ চড়িয়েছে ঈশানী, কিন্তু সে নিজে কোথায়?

কোথায় সে হারালো ? আজ সব পেয়েও সে কাঁদছে কেন ? এমন অবারিত স্বাধীনতার মধ্যেও বাঁধনে কেন তার জরোজরো মন ? বনস্পতির মতো চারদিকে সে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে, কিন্তু তার মর্মমূলে প্রাণরস কই ? সুখের অজস্র উপকরণের ভারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আনন্দ ম'রে গেছে,—এর খোঁজ কি সে নিয়েছিল ?

একটি বিস্ময় থেকে গেছে বরাবর। ঈশানীর পারিবারিক জীবনে কেউ কোথাও নেই। আত্মীয় বলতে কেউ কোনোদিন ছিল না, স্বজনকুটুম্বের সাক্ষাৎ মেলেনি এ জীবনে। ফুলকাঠির পুরনো জমিদারগোষ্ঠীর একটি তৃণফলকও কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সুতরাং এক শিলভিয়া ছাড়া বন্ধু বলতে কোথাও কারোকে সে পায়নি। নিজেকে নিয়েই সে থেকেছে, নিজের জন্যেই ভেবেছে, এবং নিজের ওপরেই সে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য ঈশানী যখন আজকে তার ঘরকন্নার পাট তুলে দিতে চাইছে, তখন কোথাও তার টান পড়ছে না, কোনোদিক থেকে তার প্রতিবাদ উঠছে না, বাধা দিচ্ছে না কেউ। তার সমস্ত খেয়াল-খুশি নিয়ে একা সে দাঁড়িয়ে।

বাহুল্য সামগ্রীগুলি সে যখন নন্দ, রামতীরথ, বুড়ি-ঝি এবং তেওয়ারীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে বসেছে, সেই সময়ে কোনো একদিন অপরাহ্ণের দিকে নন্দ এসে জানালো, একটি ভদ্রলোক জনৈক মহিলাকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যেমন-তেমন একখানা শাড়ী জড়িয়ে ঈশানী বসেছিল তার রান্নাবান্নার মহলে। কোনও প্রকার সজ্জা পারিপাট্যের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে একটু কৌতূহল নিয়েই বারান্দার দিকে বেরিয়ে এলো।

একটি তরুণী মেয়ে তাকে দেখেই নমস্কার ক'রে বললে, আমাকে চিনতে পারেন ?

ঈশানী সহাস্যে বললে, কেন চিনবো না ? তুমি সুষমা ! এসো ভাই।

সুষমা বললে, ইনি আমার স্বামী ধীরেন সেন।

স্বামী শুনেই ঈশানী একবার তাকালো। নমস্কার বিনিময় হয়ে গেল।

একটি কাঠের বেঞ্চে তিনজনেই গিয়ে বসলো। সুষমা এদিক-ওদিক

তাকিয়ে বললে, আপনি কি এ বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন? জিনিসপত্র কোথাও দেখছিনে?

ঈশানী হাসলো। বললে, হ্যাঁ ভাই, এ খেলার পাট তুলে দিলুম। বেশ, ভারি খুশী হলুম সুষমা, তুমি বিয়ে করেছ। চাকরি আছে ত?

সুষমা হাসিমুখে বললে, হ্যাঁ, আছে। এ চাকরি ত আপনারই অনুগ্রহে। অনেক দিন ধ'রেই আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে। আপনার কাছেই আমার সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা!

ধীরেন বললে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। তবে এঁর কাছে প্রায়ই আপনার সুখ্যাতি শুনি। আমরা দু'জন একই আপিসে চাকরি করি।

সুষমা বললে, আপনি এ বাড়ী ছেড়ে কোন্ ঠিকানায় যাচ্ছেন, ঈশানীদি?

ঈশানী বললে, জিনিসপত্র সরিয়ে দিলুম, কিন্তু বাড়ী কবে ছাড়বো তার এখনও ঠিক নেই। এই চ'লে যাচ্ছে আর কি! যাই হোক্, তোমার কথা বলো, এবার তুমি বেশ আনন্দে আছ ত'?

সুষমা বললে, আনন্দে আছি, সেও আপনারই কল্যাণে। সেই দুঃসময়ে আপনি সাহায্য না করলে আমার দাঁড়াবার কোনো উপায় ছিল না।

ঈশানী বললে, সাহায্য হয়ত কেউ না কেউ করেই, তবে তুমি দাঁড়িয়েছ তোমার যোগ্যতার ওপরে। তোমার কৃতিত্ব সেইখানে।

ধীরেন বললে, ওঁর মাইনেও কিছু বেড়েছে।

খুব আনন্দের কথা। আমার কি মনে হয় জানো, সুষমা?—ঈশানী বললে, সব চেয়ে কম পেয়ে যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আনন্দে থাকে, সেই সুখী।

চুপ ক'রে গেল স্বামী-স্ত্রী। একসময়ে সুষমা বললে, কই, শান্তনুদাকে এখানে দেখছিনে ত?

শান্তনুর আলোচনাটা সুষমা তুলবে না, ঈশানীর এই ধারণা হচ্ছিল। কিন্তু তার উল্লেখ শুনে এবার ঈশানী বললে, তিনি ত' এখানকার মানুষ নন, কেমন ক'রে দেখবে?

কোথায় আছেন তিনি? কি করছেন আজকাল?

কি করছেন তিনি ঠিক জানিনে, তবে দিল্লীতে আছেন।

সুষমা বললে, যদি কখনও আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, আমাদের নমস্কার জানাবেন। আচ্ছা, এবার আমরা উঠি।

ঈশানী বললে, এর মধ্যেই উঠবে ?

ধীরেন বললে, আজ ছুটির বার, সেই জন্যে কয়েকটি জায়গায় যাবো ব'লে স্থির ক'রে বেরিয়েছি।

সুষমা বললে, সব প্রথমে এসেছি আপনার এখানে।

মিষ্ট হাস্যে ঈশানী বললে, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা—

ধীরেনের সঙ্গে সুষমা উঠলো। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এলো ঈশানী। ওরা পুনরায় সহাস্য নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। রাস্তায় নেমে স্বামী-স্ত্রীতে বলাবলি করলো, চমৎকার দেখতে, না ? সুষমা সোৎসাহে বললে, শান্তনু চৌধুরীকে দেখাতে পারলুম না। সেও খুব চমৎকার দেখতে ! কিন্তু এমন নির্বিকার লোক দেখা যায় না।

মনের কথাগুলো মনেই চাপা র'য়ে গেল বৈ কি।

ওদের বিদায় দিয়ে এসে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। আর কিছু নয়, বেঁচে গেছে মেয়েটা যে, শান্তনুর হাতে পড়েনি। সুষমা বিয়ে করার জন্য জন্মেছিল, কিন্তু শান্তনু ঘরকন্না করার জন্য জন্মায়নি। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি শান্তনুর কাছে অপরিচিত। তার সমগ্র এলোমেলো ইতিহাসের মাঝখানে যদি সহসা এক সিন্দুরশোভিত মেয়ে এসে বসতো, শান্তনু সইতে পারতো না সেই বন্দীদশা। বাঁধনের গন্ধ পেলেই শান্তনুর মধ্যে বিপ্লব বাধে। সে বশ্যতা বোঝে, দাসত্ব বোঝে না। যাওয়া-আসার পথ খোলা যদি না থাকে, তবে সে ভালোবাসারও ধার ধারে না। তাকে ডাকলে পাবে, কিন্তু টেনে ধ'রে রাখতে গেলেই সে পালাবে। স্বচ্ছন্দ অবারিত মুক্তি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তার মন আকৃষ্ট নয়।

সেই জন্য ঈশানী এতদিন অবধি তার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। নিজের কাছে সত্য হবার জন্য ঈশানীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নিঃশব্দে। ঈশানীর অনেক

আছে,—তবু আসল বস্তুর থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু ঋতুরাজ এসে দাঁড়ায়, তুমি যখন সম্পূর্ণ রিক্ত। তোমার নিঃশেষ নগ্নতার উপরে সে তার বাসন্তী উত্তরীয়ের আবরণ টেনে দেয়। সর্বস্ব হারাবার ভয় যেন মনে না থাকে, কেন না সে আসছে পরিপূর্ণতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ঈশানীর মনে আজ কোনো খেদ নেই, কোনো বিষাদে সে আচ্ছন্ন নয়। একটির পর একটি শূন্যঘরে পরিপূর্ণ আনন্দে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কেউ বুঝবে না, কেন সে রিক্ত হচ্ছে। তাকে দাঁড়াতে হবে সহজ সত্য স্বরূপকে নিয়ে। সামনে পিছনে কোনো পরিচয় তার থাকবে না, সে দাঁড়াবে একটি পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির মতো। জীবনের বৃন্তে ফুটে উঠেছে একটি ঊর্ধ্বমুখী শতদল, প্রার্থনাটা তার সূর্যের দিকে। ওই তার একমাত্র আগ্নেয় বাসনা, হে সূর্য, তুমি আমার মধ্যে প্রতিভাত হও। আমার মধ্যে তেজ আনো, তাপ আনো, প্রাণ আনো,—আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও, তোমার মধ্যে আমি বিলীন হই!

রাত্রির পর রাত্রি ঈশানী আপন বিহ্বল বাসনা নিয়ে ঝরঝরিয়ে কাঁদলো। এ কান্নার সাক্ষী কেউ নেই। ওই জনসাধারণ, যাদের সুলভ প্রশস্তির রসতরঙ্গে ভেসেছিল সে, ওরা কেউ দেখলো না এ কান্না। সাজঘরে ব'সে যারা ওর চন্দ্রবদনে রং মাখিয়ে চতুর সজ্জা পারিপাট্যের সঙ্গে লোভনীয় ইঙ্গিত চড়িয়ে ওকে নাচের আসরে পাঠিয়েছিল,—আজ এই নিভৃত রাত্রির একাকিনী কান্নার পাশে তারা কেউ নেই। ওর ওই অশ্রুর বিহ্বলতার সঙ্গে মিলে গেছে পরম বেদনার মাধুর্য, নিবিড় দুঃখের অসহনীয় রোমাঞ্চ। ও চাইছে একটা প্রবলতর যন্ত্রণা,—যেটা ওকে বিদীর্ণ করবে, যার মহৎ বিস্ফোরণে ওর সমগ্র সত্তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে চারদিকে। সেই পরম সর্বনাশের মধ্যে ও চাইছে একান্ত আত্মবিলোপ।

শূন্যঘরের দরিদ্র শয্যায় প'ড়ে ঈশানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কিছুদিন পরে শিলভিয়ার সর্বশেষ চিঠি এলো। টাকা পেয়ে সে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে, তুমি যে আমার দিকটা স্নেহের সঙ্গে বিবেচনা করেছ এজন্য

ধন্যবাদ। কিছুদিনের জন্য বিলেত না গেলে আমার চলছে না। যদি ভারতবর্ষে আমাকে স্থায়ীভাবে থাকতে হয় তাহ'লে সেখান থেকে 'ড্যাডির' সম্মতি নিয়ে আসবো। ভিক্টর আমার সঙ্গে যাচ্ছে, সেজন্য তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হোয়ো না,— আমি তাকে একটি দিনের জন্যও কাছছাড়া করবো না। আমার সঙ্গে যাবে ব'লে ভিক্টর আনন্দে নাচছে। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বে সতেরোই তারিখে। তবে আমরা আগামী দশ তারিখে এখান থেকে বোম্বাই রওনা হবো। ভিক্টর বিলেতে যাচ্ছে শুনে শান্তনু খুবই বিমর্ষ। সেদিন সে একরাশি পোষাক-পরিচ্ছদ এনে ভিক্টরকে উপহার দিয়ে আদর ক'রে গেল। পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন বালকের প্রতি শান্তনুর এই পিতৃপ্রতিম ব্যবহার দেখলে যে-কোনো লোক অভিভূত হয়। তুমি নিজের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত মনে হচ্ছে। বিলেত যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে বেশ আনন্দ হোতো। বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে আমরা দিন চারেকের জন্য উঠবো। শান্তনু মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নৈনিতালের দিকে গিয়েছিল তার নতুন চাকরি উপলক্ষে। সেখানেই সে থাকবে। আমরা বোম্বাই রওনা হয়ে গেলে শান্তনু আবার চ'লে যাবে।

সেদিন রামতীরথ, বুড়ি-ঝি এবং তেওয়ারী বিদায় নিল। ওরা পেয়ে গেল অনেক কাপড়-চোপড় এবং তৈজসপত্রাদি। এর ওপর প্রত্যেকে ছয় মাসের বেতন বকশিস। আশার অতিরিক্ত ওরা পেলো ব'লেই কৃতজ্ঞতায় ওদের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। ওরা বিদায় নিয়ে গেল ভারাক্রান্ত মনে। বাকি রইলো নন্দ, সে যাবে সব শেষে। এ বাড়ীর সুখ বুঝি নন্দরও সইলো না।

দিদিমণির আহারাদি দেখলে নন্দর চোখে জল আসে। বাজার থেকে তাকে কলাপাতা কিনে আনতে হয়েছে। মেঝের উপর ব'সে দিদিমণি কলাপাতায় ভাত খায় সামান্য এটা ওটা দিয়ে। টেলিফোনটা কোম্পানীর লোক এসে নিয়ে গেছে, দিদিমণিকে আর কেউ ডাকে না। উপরের মহলে প্রত্যেকটি ঘর শূন্য, কেবল কাপড়জামা-কাগজপত্র সমেত আছে একটি পোর্টম্যাণ্টো। এ বাড়ী শীঘ্রই দিদিমণি ছেড়ে যাবে, কিন্তু কোথায় যাবে তার কোনো হদিস নন্দ জানে না।

রান্নাবান্না নন্দ শেখেনি কোনোদিন, কিন্তু সে যা কিছু সিদ্ধপক্ক ক'রে দেয়, অম্লানবদনে দিদিমণি তাই মুখে তোলে। রুচি অরুচি ব'লে কিছু নেই।

ঈশানী সেদিন গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল সকাল বেলায়, কিন্তু সে যখন ফিরে এলো তখন অপরাহ্ণ। নিজের গাড়ীর বদলে ঈশানী এলো ট্যাক্সিতে। ভাড়া চুকিয়ে সে যখন ভিতরে আসছিল, দেখলো সেই বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিকে ঘিরে দু'তিনজন মহিলা উড়ানীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। সিঁড়িতে ওঠবার আগে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে হাত তুলে বললে, নমস্তে রাজরতনজী, ফিন ক্যা কুচ খবর মিলা ?

জি।—ব'লে মেয়েটি এগিয়ে এলো। অশ্রুগলিত চক্ষে বললে, তুমি ত' জানো আমার স্বামী গত কয়েকমাস যাবৎ কঠিন রোগে ভুগছিলেন, তাঁকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। আমার মা-বাবা তাঁকে দেখা-শোনা করছিলেন। একটু আগে টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁর বাঁচার আশা কম।

ঈশানী বললে, তুমি আজই চ'লে যাও।

হ্যাঁ, আজকের রাত্রের মেলেই যাবো, কিন্তু পরশু সকালের আগে পৌঁছতে পারবো না। তাঁকে দেখার আশা দুরাশা, বহিনজী।

ঈশানী বললে, তুমি ত' প্লেনে যেতে পারো, রাজরতন !

রাজরতন বললে, চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু টিকিট পাওয়া যায়নি। ওঁকে দেখা আর আমার কপালে নেই।

মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

চুপ ক'রে দাঁড়ালো ঈশানী একবার। তারপর বললে, আচ্ছা, একটু সবুর করো, আমি আসছি।

উপরের বারান্দায় নন্দ সামনেই দাঁড়িয়েছিল, ঈশানী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, নন্দ, এ সব গুছিয়ে নে, একটু বাদেই আমি চলে যাবো। গাড়ীখানা আমি বিক্রি ক'রে এলুম রে। বাড়ীওয়ালাকে খবর দিয়েছি, আজই এ ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছি। তুই অনেক করেছিস নন্দ, আমার জন্যে। তোর কথা ভুলবো না কোনোদিন।

হঠাৎ নন্দ কেঁদে ফেললো। তারপর ঈশানীর পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বললে, আপনি সব ছেড়ে কোথায় চললেন জানিনে। কিন্তু আমাকে আপনি সঙ্গে নিন্, আপনার পায়ে পড়ি। আমার আর কেউ নেই।

ঈশানী বললে, চুপ, চুপ, তুই না পুরুষ মানুষ? অমনি ক'রে কাঁদে? আমি যাচ্ছি দিল্লীতে,—কিন্তু তোকে ত' আমার দরকার নেই, নন্দ?

নন্দর কান্না থামলো না। বললে, আপনি আমার মা-বাপ। আমি মাইনে চাইনে, কিচ্ছু চাইনে। শুধু আপনার পায়ের কাছে থাকতে চাই। আমি ছ' বছর আপনার কাছে আছি, আমাকে পায়ে ঠেলবেন না।

ঈশানী চিন্তিত হয়ে বললে, আমি যে ভেবেছিলুম, রাত্রে প্লেনে উঠে তোকে দমদমা থেকে ছুটি দেবো। তুই যে কান্নাকাটি করবি, এ ত' ভাবিনি, নন্দ!

ঈশানী চুপ ক'রে একবার দাঁড়ালো। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। তারপর বললে, তাহ'লে গোছগাছ ক'রে নে। এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে। আমি আসছি—

দিল্লী যাবার কথা শুনে নন্দ চোখের জল মুছে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ছোটবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হবে, এ আনন্দ তার কম নয়।

ঈশানী নীচে এসে রাজরতনদের ঘরে ঢুকলো। সেই বৃদ্ধ এবং মেয়েরা অভ্যর্থনা ক'রে তাকে বারান্দায় বসালো। ঈশানী বললে, আপনারা ত' জানেন আজ থেকে আমার ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে যাচ্ছি। আজই রাত্রে প্লেনে আমার দিল্লী যাবার কথা, সেখানে তিন চারদিনের কাজ সেরে আবার যাবো অন্যদিকে। দুপুরবেলা আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি দিল্লীতে, তাঁরা হয়ত বিমান-ঘাটিতে আমাকে নিতেও আসবেন। তবে আপনাদের যদি সুবিধা হয়, আমার টিকিটখানা নিয়ে রাজরতন আজ প্লেনে দিল্লী যেতে পারে, আমি না হয় ট্রেনেই যাবো।

বৃদ্ধ সহসা আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, মা, তোমার এই উপকারের জন্য আমাদের গুরু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

ঈশানী বললে, সর্দারজি, রাজরতনকে কিন্তু বেনামী হয়ে বেআইনীভাবে যেতে হবে। আমার নামে সীট্ বুক্ করা আছে। অবিশ্যি আজকাল কেউ কেউ এ রকম করে শুনতে পাই—

বৃদ্ধ বললেন, বিপদে পড়লে এ রকম না ক'রে উপায় নেই, মা। আমরা কারোকে ঠকাচ্ছিনে, শুধু একটু অদল-বদল হয়ে যাচ্ছে মাত্র। তোমার এই উপকার আমাদের পরিবার চিরকাল মনে রাখবে। রাজরতন আমার পুত্রবধূ, আর এঁরা হলেন আমাদের দেশের লোক। আমরা কারবারের সূত্রে এখানে থাকি, রাজরতন আমার সেবা করে। আমার ছেলে যদি বাঁচে, রাজরতন চিরদিন তোমার গোলাম হয়ে থাকবে, মা।

বৃদ্ধ চোখের জল মুছলেন। রাজরতন ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। ঈশানী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে প্লেনের টিকিটখানা খামশুদ্ধ বা'র ক'রে দিল এবং ওরাও বা'র ক'রে দিল দিল্লী-কাল্‌কা মেল-এর বার্থ রিসার্ভ করা টিকিটখানা। রাজরতন আনন্দে অধীর হ'য়ে ঈশানীকে সাশ্রুনেত্রে জড়িয়ে ধ'রে তার অসীম কৃতজ্ঞতা জানালো। ঈশানী ব'লে দিল, দমদমা থেকে প্লেন্ ছাড়বে রাত দশটার পর। তুমি বাঙ্গালীর পোষাক প'রে যেয়ো, রাজরতন। আমিও তোমার মতো শালোয়ার আর উড়ানী নিয়ে যাবো।

ঈশানী উপরে এসে তার একখানা ভালো শাড়ী আর জামা নন্দকে দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিল, এবং তার অল্পক্ষণ পরেই রাজরতন নিজে এসে শিখনারীর একটি সজ্জা দিয়ে গেল ঈশানীর হাতে। পোষাকের বৈচিত্র্যে জাতি পরিবর্তন চেনা যায়। শালোয়ার, পাঞ্জাবী আর ঘোমটা ঢাকা উড়ানী চড়িয়ে অভিনব চেহারায় ঈশানী সন্ধ্যার সময় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোলো, এবং পাজামা ও টুপিপরা নন্দ সঙের নাচ নাচতে-নাচতে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনলো।

নীচে নামতেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে আরেকবার বিদায় আশীর্বাদ জানালেন। ঈশানী নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল। ট্যাক্সি চললো হাবড়া ষ্টেশনে।

* * * *

আগের দিন সন্ধ্যায় জরুরী টেলিগ্রামখানা শিলভিয়া পেয়েছিল। টেলিগ্রামের

উদ্বিগ্ন ভাষা প'ড়ে তার মুখে হাসি আর ধরে না! 'শান্তনুকে দেখবার জন্য সে ছটফট করতে লাগলো, কিন্তু পোড়াকপালী ঈশানীর ভাগ্যে এমনই প্রণয়ী জুটেছে যে, তার ভাবভঙ্গীর মধ্যে যেন ষ্টিল-ফ্রেমে আঁটা সংযমটাই চোখে পড়ে। নিরুদ্বেগে শান্তনুর দেখাও পাওয়া যায়নি আজ দিনতিনেক। কে জানে, ছোকরা হয়ত এ যাত্রায় ভিক্টরের সঙ্গে শেষবার দেখা না ক'রেই নৈনীতালের পথে পাড়ি দেবে।

আনন্দে শিলভিয়া ছুটে এলো ভিক্টরের ঘরে। ভিক্টর তখন সবেমাত্র বেড়িয়ে এসে তার বইখাতা নিয়ে পড়তে বসেছে। শিলভিয়া সেই তারবার্তাটি ভিক্টরকে দেখিয়ে সোৎসাহে বললে, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

হচ্ছে ত।—ভিক্টর তার উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে যেন একটু কুণ্ঠিত হোলো। বললে, কিন্তু মাম্মি এসে আমাদের বিলেতে যেতে দেবে ত?

নিশ্চয়ই দেবে, ভিক্টর। তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, মাম্মি তোমাকে কত ভালোবাসে।

ভিক্টরের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। শুধু বললে, বাসলেই বা!

শিলভিয়া উত্তেজিত হয়ে বললে, Why can't you imagine she is your real mother?

ভিক্টর হেসে ফেললো। বললে, It matters very little, mummy।

ভিক্টরের নিশ্চিত ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে শিলভিয়াও হেসে ফেললো। শুধু বললে, impossible boy you are. তুমি জানো মাম্মি আমাদের সমস্ত খরচ দিচ্ছে?

বা, দেবে না কেন? অনেক টাকা আছে ত।

শিলভিয়া থমকে দাঁড়িয়ে ভিক্টরের স্বভাব-সারল্যের দিকে একবার তাকালো তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠে শিলভিয়া একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বিমান-ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হোলো। দিল্লীতে শরৎকাল আকাশে বাতাসে তার মাধুর্য বিস্তার করেছে। স্নিগ্ধ বাতাস প্রভাতের দিকে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ট্যাক্সি মোতায়েন রেখে এন্‌ক্লোজারের ভিতরে ঢুকে শিলভিয়া লক্ষ্য করলো, এখানে ওখানে কেমন যেন ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন ভাব, কোনো কোনো স্ত্রীলোক কান্না জুড়েছে। কোথাও কোথাও লোকজনের জটলা। শিলভিয়া ভীতমুখে গিয়ে জনৈক অফিসারকে ধরলো,—ব্যাপার কি বলুন ত ?

তিনি বললেন, নাগপুর থেকে উঠতে গিয়ে নাইট্‌ প্লেন প'ড়ে গেছে ! দিল্লীর দিকে ষ্টার্ট নিয়েছিল।

ব্যাকুলকণ্ঠে শিলভিয়া ব'লে উঠলো, তারপর ?

অফিসার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, কেউ বাঁচেনি ! পেট্রল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে গিয়েছিল। Bodies charred beyond recognition !

শিলভিয়া ছুটে গিয়ে প্রভাতের প্রথম সংবাদপত্রখানায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। খবরটা এর মধ্যে ছাপা হয়ে গেছে। দুর্ঘটনা ঘটে রাত তখন প্রায় তিনটে। মৃত ব্যক্তিগণের নামের তালিকায় যথারীতি ঈশানী রায়ের নাম ছাপা হয়েছে !

অনেকক্ষণ অচেতনভাবে কাগজখানার ওপর চোখ রেখে এক সময় শিলভিয়া বাইরের দিকে তাকালো ! নিজের মনেই সে ঘাড় নাড়লো। না, বিলেত থেকে তারা আর ফিরবে না। ভারতবর্ষের আকাশ বড় বিশ্বাসঘাতক !

কান্নার রোল উঠেছে সর্বত্র। সাহেব মেমরা কাঁদছে, মাড়োয়ারী ভাটিয়া দক্ষিণী পাঞ্জাবী—সবাই কাঁদছে। কিন্তু একটি প্রাণীর জন্য এখানে কাঁদবার কেউ নেই। একটি বাঙ্গালী নেই যে, বাঙ্গালীর জন্য কাঁদবে।

ঈশানীর ভাগ্যবিপর্যস্ত জীবনের যবনিকাপাত ঘটলো কোনো এক অন্ধকার বনচ্ছায়াতলে। মেয়েটা জ্বলে-পু'ড়ে ম'রে গেল।

এলোমেলোভাবে খানিকটা এখানে ওখানে হাঁটাহাঁটি ক'রে অবশেষে এক কোণে গিয়ে ব'সে শিলভিয়া কতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগলো। কিন্তু কান্নার কৈফিয়ৎ কেউ চাইলে তার পক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন হোতো। অনেকগুলি ইউরোপীয় মেয়েপুরুষ এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে। পাছে তাদের মধ্য থেকে কেউ এগিয়ে এসে হঠাৎ তাকে কোনো প্রশ্ন করে, এজন্য শিলভিয়া এক সময় আবার উঠে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চললো।

বাড়ী ফিরতে শিলভিয়ার কিছু দেরি হোলো। একখণ্ড পাথর যেন গড়াতে গড়াতে এসে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। কি করবে, কি ভাববে, কাকে বলবে—কিচ্ছু বুঝতে না পেরে সে স্তব্ধভাবে এক জায়গায় ব'সে রইলো। ঈশানীর সঙ্গে তা'র প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে সমস্ত ছবিগুলো একে একে তার চোখের সামনে দিয়ে স'রে যেতে লাগলো।

ভিক্টর সামনে এসে দাঁড়ালো। শিলভিয়ার হাতের কাছে খবরের কাগজখানা খোলা,—শিলভিয়ার চোখ বেয়ে অশ্রু নামছে।

মাম্মি!

শিলভিয়া মুখ তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঈশানীর খবরটি ভিক্টরকে বুঝিয়ে দিল। ভিক্টর চুপ ক'রে রইলো,—কিন্তু শিলভিয়ার চোখে এই প্রথম দরদর ধারায় অশ্রু দেখে ভিক্টরের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো। দু'পা এগিয়ে সে শিলভিয়ার পিছন দিকে দাঁড়ালো, এবং পিছন দিক থেকে রুমাল বাড়িয়ে শিলভিয়ার চোখ মোছাতে গিয়ে নিজেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো শিলভিয়ার পিঠের পাশে।

আন্দাজ বেলা এগারোটার সময় শান্তনু এসে শিলভিয়ার সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু মুখ তুলে শান্তনুর রাঙা চোখের দিকে তাকাবামাত্রই শিলভিয়া আর স্থির থাকতে পারলো না, ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় মুখ থুবড়ে ডুকরে ডুকরে সে কাঁদতে লাগলো। একটু আগে ভিক্টর স্কুলে চ'লে গেছে।

দেওয়াল ধরে শান্তনু কতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে চুপ ক'রে গিয়ে বসলো একস্থানে। খবরটি সে ভোর বেলাতেই পেয়েছে। গাড়ী নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল বিমান-ঘাঁটিতে। সেখানে শেষ সংবাদ পাওয়া গেল এই যে, প্রত্যেকটি যাত্রীর দেহ একেবারে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যও বোঝা যায়নি। দিল্লীতে ঈশানী খ্যাতিলাভ করেছিল, সুতরাং কোনো কোনো কাগজে নৃত্যরতা ঈশানীর ফটোও ছাপা হয়ে গেছে। অতঃপর অনেক চেষ্টা ক'রে শান্তনু রমেনবাবুকে ট্রাঙ্ক কল্-এ ধরতে পারে। অসীম বিরক্তি সহকারে রমেনবাবু বলেন, হাঁ, মৃত্যুসংবাদ সত্য। তবে কিছুদিন আগে এ ঘটনা ঘটলে

তিনি আর সপরিবারে পথে বসতেন না! যাই হোক, ঈশানী সব জিনিসপত্র বেচে, এমন কি গাড়ীখানাও বিক্রি ক'রে তার এ জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, সমস্তই শান্তনুর নামে ব্যাঙ্কে রেখে গেছে। রাজকন্যাটাকে শান্তনু পেলো না বটে, তবে রাজত্বটা যখন আল্‌টপকা পেয়ে গেল,—আরেকটি উৎকৃষ্টতর রাজকন্যা অবশ্যই জুটবে। তবে আর যাই করো ভাই, অসতী মেয়েকে নিয়ে যেন কারবার করো না! ভূতের নাচ নেচে গেল আমাদের কাঁধের ওপর।

ছয় মিনিটের মধ্যে গলগল ক'রে রমেনবাবু রিসিভারের গর্তটার মধ্যে মারাত্মক গরল উদ্‌গার ক'রে দিলেন। তবু ওরই মধ্যে শান্তকণ্ঠে শান্তনু একবার সমস্ত অবস্থাটা জানবার জন্য বললে, আমাকে সে ভারাক্রান্ত ক'রে গেল বটে, কিন্তু আপনাকে কি কিছুই দিয়ে যেতে পারলো না?

টেলিফোনের কড়কড়ে আওয়াজের ভিতর দিয়ে কেবল শোনা গেল, হ্যাঁ, আমাকেও হাজার পঁচিশেক টাকার সম্পত্তি দান ক'রে গেছে বটে, তবে সেই সম্পত্তি ভোগ করতে গেলে যে হাজার পঞ্চাশেক টাকা মামলায় খরচ করতে হবে, সেটা অবিশ্যি দিয়ে যাবার সময় সে পেলো না! তুমি যখন ট্রাষ্টির একজন মেম্বার হিসেবে কলকাতায় এসে দাঁড়াবে, ওই সম্পত্তিটি তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি গঙ্গাস্নান করবো।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে শান্তনু সোজা এসেছে শিলভিয়ার এখানে। ঈশানী নিজের ইতিহাস নিজেই মুছে দিয়ে চ'লে গেছে।

অন্তিম মুহূর্তগুলির ছবির দিকে শান্তনুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। হয়ত অন্ধকার কোনো বনময় প্রান্তর। লেলিহান শিখায় সেখানে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। একটা ধাতব সিন্দুকের মধ্যে প'ড়ে জীবন্ত ঈশানী অগ্নিদাহনের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। অগ্নিশ্বাসে রুদ্ধ হচ্ছে সেই কণ্ঠ, অঙ্গারে পরিণত হচ্ছে সেই তনুলতা, তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত যন্ত্রণা আগুনের আবরণে শান্ত হয়ে এলো! মৃত্যু সমস্তটা লেহন ক'রে নিল।

মুখ তুলে তাকালো শান্তনু কতক্ষণ পরে। শিলভিয়া যেন কখন এসে ব'সে রয়েছে চেয়ারখানায়, অন্যমনস্ক সে লক্ষ্য করেনি। ভাবনাটা হোলো

পুরুষের, কান্নাটা মেয়ের। পুরুষ কাঁদে আপন অন্তরে, সাক্ষী তার কেউ থাকে না।

প্রথমে শিলভিয়াই কথা বললে।—কিছু ভেবে উঠতে পাচ্ছিনে, চৌধুরী,—কিন্তু জাহাজের সীট্ কি বাতিল করা সম্ভব হবে?

গলাটা পরিষ্কার ক'রে শান্তনু বললে, তোমরা কি যাবে না ভাবছো?

শিলভিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এর পর কি ভিক্টরকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে?

কিন্তু ভিক্টরের শেষ অবলম্বন তুমি! তোমাকে ছেড়ে সে থাকবে কেন?

আমি আর ভারতবর্ষে ফিরতে চাইনে, চৌধুরী।—শিলভিয়ার অবাধ্য চোখে আবার জল এলো।

নতমুখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো শান্তনু। একসময়ে সে নতমুখেই বললে, ভিক্টরের সমস্ত ভার তুমিই নাও, শিলভিয়া,—ও ছেলে তোমারই, তুমি ওর প্রকৃত মা। তবে আমার একটা অনুরোধ আমি জানিয়ে রাখি—

শান্তনুকে বার বার গলা পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। সে আবার বললে, ছেলেমানুষের মতন ঈশানী আমার ঘাড়ে যে টাকার বোঝা চাপিয়ে গেছে, সে বোঝা আমার নয়,—ভিক্টরের। তোমরা যাবার আগে সেই বোঝার থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে যাও, শিলভিয়া।

শিলভিয়া বললে, তার অন্তিম ইচ্ছা তুমি পালন করবে না, এ কেমন ক'রে সম্ভব, চৌধুরী? আমি তাকে জানতুম। সে তার নাম, পরিচয়, আত্মাভিমান,—সমস্ত মুছে দিয়ে তোমারই কাছে ছুটে আসছিল, তোমার কাছে সত্য হয়ে ওঠার জন্যই সে প্রাণপণে সংগ্রাম করছিল,—তোমার কাছে তার শেষ মিনতি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, চৌধুরী! সে তার জীবনকালে তোমার অনেক অবহেলা স'য়ে গেছে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর এ অবিচার কেন তুমি করবে?

শান্তনু তার আপন হৃৎপিণ্ডের আর্তস্বর সংযত করলো। কিন্তু উত্তপ্ত কম্পিত কণ্ঠ তার ওষ্ঠাধর বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এলো,—তাই ব'লে সেই প্রেতিনীর অভিসম্পাত চিরদিন আমি ব'য়ে বেড়াবো, শিলভিয়া? সে আমার

প্রশ্নের শেষ জবাব দেবে ব'লেই আমি প্রতীক্ষা করছিলুম, কিন্তু সে যে এসে পৌঁছতে পারলো না সে কি আমার অপরাধ ?

গলাটা তার ধ'রে এলো ব'লেই শিলভিয়ার জবাবটা তার শোনা হোলো না। শান্তনু উঠে দাঁড়ালো। তারপর সংযত কণ্ঠে বললে, আমার উত্তেজনা ক্ষমা করো, শিলভিয়া। অন্য কোনো সময়ে এসে আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে জানিয়ে যাবো। এখন আমি যাই—

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, তোমার নতুন চাকরিস্থলে কবে নাগাৎ যাবে ?

শান্তনু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, শীঘ্রই যাবার কথা, কেন না সেখানে কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গেছে। তবে এরপর আমার গতিবিধি সঠিক বলা কঠিন। অবশ্য তোমাদের ট্রেনে তুলে দেবার দিন পর্যন্ত আমি থাকবো। আর এর মধ্যে যদি কোনো দরকার পড়ে, আমাকে খবর দিয়ো,—এই আমার ঠিকানা।

পাহাড়গঞ্জের একটা জনবহুল অঞ্চলের একটি বাড়ীর ঠিকানা লিখে রেখে শান্তনু তখনকার মতো নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

আকস্মিক অপমৃত্যু তার পদচিহ্ন কোথাও রেখে যায়নি ব'লেই আগাগোড়া ইন্দ্রজাল মনে হচ্ছে। যে-মৃত্যু অতি প্রত্যক্ষ, তার শোক-সন্তাপও স্পষ্ট। মহানগরীর পথের এই রূঢ় বাস্তব কোলাহলের মাঝখানে ওই মৃত্যুটাকে মনে হচ্ছে অবাস্তব ; কিংবা মৃত্যু ছাড়া জীবনের ব্যাখ্যায় আর কোনো সত্য নেই, সেই কারণে এমন হ'তে পারে এই বাস্তবটাই হোলো একটা অর্থহীন অপ্রাকৃত স্বপ্ন। অপরাহ্ণকাল পেরিয়ে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত শান্তনু ঘুরে বেড়ালো দিল্লীর পথে-পথে, চা খেয়ে বেড়ালো এখানে ওখানে, বিশ্রাম নিয়ে গড়ালো রামলীলার মাঠে মাঠে,—কিন্তু ওই জটিলতাটা তার মন থেকে ঘুচলো না। কানে কানে ডাক দিচ্ছে সেই ডাকিনী নিরন্তর—শান্তনুর অণুপরমাণুতে জড়িয়ে গেছে ঈশানী। ওদিকে সন্ধ্যার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়। শান্তনু স্থির হয়ে ব'সে রইলো অনেকটা যেন বুদ্ধমূর্তির মতো।

১৫

ট্রেন এক ঘণ্টা লেট্। দিল্লী ষ্টেশনে যখন গাড়ী এসে পৌছলো, তখন প্রায় সওয়া দশটা। ক্লান্তদেহে নামলো ঈশানী শিখনারীর সেই পোষাকে। বোধ করি রাজরতনের জন্য সে কেঁদেছে অনেকবার, চোখের কোলে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। এলাহাবাদের কাছাকাছি এসে খবরটা সে পায়, রাজরতন তার স্বামীর কাছে কোনমতেই পৌছতে পারলো না। মৃত্যুমুখী স্বামী যেখানে যাচ্ছে, রাজরতন আগে-ভাগে সেখানে পৌছে স্বামীর অপেক্ষায় রইলো।

নন্দ তাড়াতাড়ি এসে পোর্টমাণ্টোটা তুলে নিল, কুলীর দরকার আর হোলো না। ওয়েটিং রুমে গিয়ে পরিচ্ছদটা হয়ত বদলে নেওয়া যেতো, কিন্তু থাক্, যদি কোনো সন্দিগ্ধ চক্ষু অনুসরণ করে, সুতরাং দরকার নেই। নন্দর আগে থেকেই অনেকটা চেনাশোনা আছে, অতএব দুজনে বেরিয়ে এসে ষ্টেশনের সামনে একখানা ট্যাক্সি ধরলো। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে শিলভিয়ার ঠিকানা বা'র ক'রে ঈশানী ড্রাইভারকে একবার দেখালো। গাড়ী ছেড়ে দিল।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় অবসাদটা যেন আরও বেড়ে উঠলো। ক্লান্তিতে ঘুম আসছে ঈশানীর চোখে। নূতন দিল্লীর দোকানপাট প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে, কনট্ প্লেসে নিশুতি। কোনো কোনো অঞ্চল পরিচিত মনে হচ্ছে, ঈশানী এদিকে অনেকবার ঘুরে গেছে। সমস্ত দিন আজ বড় কষ্টে কেটেছে ট্রেনে। পাছে কারো চোখে কৌতূহল দেখা যায়, পাছে কেউ সন্দেহক্রমে প্রশ্ন ক'রে বসে, পাছে বা তার ছদ্মবেশ আচমকা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।

ঘুম জড়িয়ে আসছে ঈশানীর চোখে। অনেক দিন পরে সে যেন ঘুমিয়ে পড়ছে আজ। দুর্গম পথের তীর্থযাত্রী এতদিন অসীম অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর

হচ্ছিল দুরন্ত উদ্দীপনায়, আজ যেন দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরের চূড়া, অসীম আশ্বাসের সঙ্গে অপরিসীম অবসাদ দুই চক্ষুকে যেন জড়িয়ে ধরেছে।

অবশেষে ঠিক জায়গাটিতে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। এ-পাড়াটা একটু যেন লোকবহুল। কাছেই একটা ট্যাক্সির ষ্ট্যাণ্ড, তার পিছনে কয়েকখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। বোধ করি কিছু একটা 'পরব' চলছে, আশে পাশে কতকগুলো দোকান খোলা। অনেক লোকজনের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে।

পোর্টমাণ্টোটা নামিয়ে নন্দ নিজের পকেট থেকে ভাড়াটা দিয়ে দিল। ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দিল ট্যাক্সিওলা নিজে। তারপর সে গাড়ী চালিয়ে দিল।

ওরা থাকে দোতলায় পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে করিডর। সেখানে একটা আলো জ্বলছে। ঈশানী একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কলম আর কাগজ বা'র করে কি যেন লিখে নন্দর হাতে দিয়ে বললে, ওরা আমাকে দেখলে হয়ত বড্ড চমকে উঠবে রে। তুই বরং আগে যা, শিলভিয়াকে ডেকে এই চিঠিখানা দে। তারপর আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা, দিদিমণি—পোর্টমাণ্টোটো এবং নিজের পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে চিঠিখানা নিয়ে নন্দ অগ্রসর হোলো। পাঁচ নম্বরের এইটিই একমাত্র করিডর, এদিকে কেউ নেই। বারান্দার পাঁচিলে হেলান দিয়ে ঈশানী দাঁড়ালো।

নন্দ এগিয়ে ডান দিকে কয়েক পা ঘুরে একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'তিনবার বোতাম টিপতেই একজন চাকর বেরিয়ে এলো। নন্দ বুঝিয়ে দিল, কলকাতা থেকে মাইজি এসেছে, তুমি মেম সাহেবকে খবর দাও।

তিনি 'নিদ' যাচ্ছেন।

তা হোক, ডাকো। এ চিঠি দেখালে ছুটে আসবেন।

লোকটা ভিতরে চ'লে গেল, এবং মিনিট তিনেক পরে শিলভিয়া ছুটে বেরিয়ে এলো ঘুমচোখে উন্মত্তের মতো। নন্দ ইংরেজি জানে না, কিন্তু দিদিমণির এখানে আসার কথাটা শিলভিয়াকে বুঝিয়ে দিতেই শিলভিয়া দৌড়ে আসছিল, এবং আলোর নীচে ঈশানীকে সহসা দেখে সেই কাঁচা ঘুমের আবিলতার মধ্যে শিউরে উঠে টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল। নন্দ এবং সেই চাকরটা

হাঁ হাঁ ক'রে তার দিকে অগ্রসর হোলো বটে, কিন্তু ঈশানী ততক্ষণে ছুটে এসে কোলের মধ্যে শিলভিয়াকে তুলে নিয়েছে।

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে ঈশানী বেরিয়ে এলো শিলভিয়ার চাকর দেওয়ানচন্দকে সঙ্গে নিয়ে। শান্তনুর ঠিকানা আছে চাকরটার কাছে। পোষাকটা বদলে শাড়ী প'রে এলো ঈশানী। স্নান ক'রে আসতে বললে শিলভিয়া, কিন্তু মন্দিরের সাম্‌নে এসে ধূলো-পায়ে দর্শন না করলে পথশ্রম সার্থক হয় না। সমস্ত মন তার অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঈশানী ছুটে চললো নীচের তলায় নেমে।

রাত বারোটা বাজে। ট্যাক্সি কোনমতেই আর পাওয়া গেল না। দেওয়ান-চন্দ বললে, একখানা টাঙ্গা নেবো, মাইজি ?

এখান থেকে কতদূর, দেওয়ানচন্দ ?

বেশী দূর নয়, এই কাছেই—

তাহ'লে হেঁটেই চলো। টাঙ্গা বড্ড আস্তে চলে—।

ঈশানী ছুটতে ছুটতে চললো। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা যাবৎ সে হাঁটেনি, মধ্যরাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায় অতি দ্রুত পা চালানো তার ভালো লাগছে। পেরিয়ে গেল সে অনেক দূর, ক্রমশঃ বাজারের পথটা একেবারে নিশুতি হয়ে এলো। কিন্তু ঈশানীর পায়ে পায়ে এসেছে চাঞ্চল্য, দুরন্ত জোয়ার লেগেছে তার গতিতে। তার বুকের মধ্যে একটা আর্তস্বর যেন ডানা ঝটাপটি করছে।

অনেক দূর গিয়ে সহসা সভয় সঙ্কোচে ঈশানী একবার থমকে দাঁড়ালো। এই উদ্দাম উত্তেজনা নিয়ে শান্তনুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে যদি নিজেকে সে আয়ত্তের মধ্যে ধ'রে রাখতে না পারে? যদি তার এই অবসন্ন বিহ্বলতা এই মধ্যরাত্রে শান্তনুর ঘরে পৌছে এতদিনের কঠিন বাঁধনকে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ে অন্ধকারে ?

আইয়ে, মাইজি—

মুখ তুলে ঈশানী ডাকলো, শোনো, দেওয়ানচন্দ ?

দেওয়ানচন্দ কাছে এসে দাঁড়ালো। ঈশানী শান্তকণ্ঠে বললে, আমার

শরীরটা ভালো লাগছে না, আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি বাবুকে গিয়ে বলো, যদি তিনি আসতে চান। না, দরকার নেই, তুমি কেবল খবরটা পৌছে দাও।

আপনি একা ফিরে যেতে পারবেন, মাইজি?

হ্যাঁ, পারবো—। ঈশানী ফিরে গেল।

পথ আর বেশি বাকি ছিল না। ঠিকানাটা একবার দেখে নিয়ে দেওয়ানচন্দ একটা পানের দোকানের পাশ কাটিয়ে একটি বাড়ীর সিঁড়ি ধ'রে সোজা উপরে উঠে গেল। বাঁ দিকে বেঁকেই বেশ নিরিবিলি একটি ঘর এবং তার কোলে ছোট্ট একটি বারান্দা। এদিক-ওদিকে কেউ কোথাও নেই। দেওয়ানচন্দ এগিয়ে এসে ঘরের দরজার কড়া নাড়লো। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ভিতরে আলো জ্বলছে।

কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে শান্তনু বসেছিল একমনে। অত রাত্রে কড়া নাড়া শুনে সে একবার সচকিত হয়ে তাকালো, তারপর উঠে এসে দরজা খুলে সহসা দেওয়ানচন্দকে দেখে বললে, কি ব্যাপার?

দেওয়ানচন্দ সেলাম ঠুকে বললে, বহুৎ জরুরী সাব, একজন নতুন মেম সাহেব এসেছেন কলকাতা থেকে একটি 'নোকর' সঙ্গে নিয়ে, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!

মেম সাহেব?—শান্তনু একটু বিস্মিত হোলো, কিন্তু হঠাৎ বহুদিন আগেকার সুষমার কথা স্মরণ ক'রে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, কে তিনি? কি নাম? আমার সঙ্গে কি দরকার? এত রাত্রে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, দেওয়ানচন্দ!

দেওয়ানচন্দ একটু বিব্রতভাবে বললে, তিনি এসেছিলেন আমার সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত, কিন্তু নিজেই আবার ফিরে গেলেন।

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে শান্তনু বললে, নতুন মেমসাব ফর্সা, না শ্যামবর্ণ? দাঁত কি একটু উঁচু?

নহি সাব, বহুৎ 'ধওলা' লড়কী আছে। আমাদের মেমসাহেবের বন্ধু। মেম সাহেব ওঁকে দেখে কাঁদতে গিয়ে ঝটসে 'বেহুঁস' হয়ে পড়েছিলেন।

শিলভিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? আশ্চর্য বটে। কিন্তু শিলভিয়ার সঙ্গে সুষমার ত' কখনো আলাপ হয়নি! তবে?

আচ্ছা, তুমি যাও দেওয়ানচন্দ। আমি দেখছি ততক্ষণ···

দেওয়ানচন্দ চ'লে যাবার পর শান্তনু আবার এসে কাগজপত্র নিয়ে বসলো। সমস্ত সন্ধ্যা রাতটা রামলীলার মাঠে বৃষ্টিতে ভিজে তার বোধ হয় একটু জ্বরভাব হয়েছে। মাথাটা ভার। কিন্তু সে মন দিতে পারলো না কাগজপত্রে। এক সময় উঠে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল, তারপর বালিশের তলা থেকে সকালের পাটকরা খবরের কাগজখানা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলাতে লাগলো। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী না হ'লে শিলভিয়া কখনও লোক পাঠাতো না এই রাত্রে। সুতরাং এক সময় শান্তনুকে উঠতেই হোলো। জামাটা গায়ে চড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দরজায় শিকল টেনে সে পথে নেমে এলো।

শিলভিয়া দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। ঈশানী স্নানে গিয়েছে। ভিক্টর তার নিজের ঘরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দেওয়ানচন্দ ফিরে এসে নন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেছে নিজেদের মহলে। বোধ হয় পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো তিথি হবে, বারান্দার বাইরে সমগ্র নিদ্রিত দিল্লীর উপরে শরৎ-শেষের জ্যোৎস্না রাত্রি আপন নির্মল সৌন্দর্যে একটি মোহমদির স্বপ্নলোকের দ্বার খুলেছে।

পায়ের মৃদু শব্দ হোলো সিঁড়ির দিকে। ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তির মতো শান্তনু উঠে এসে শিলভিয়ার পাশে দাঁড়ালো। শিলভিয়া মুখ ফিরালো, দুই চোখ তার জলে ভরা। কিন্তু এই ইংরাজ যুবতী কোনোদিন যা করেনি আজ তাই ক'রে বসলো। হঠাৎ শান্তনুর হাতখানা ধ'রে ডুকরে উঠলো, চৌধুরী!

কি শিলভিয়া?

তুমি কি বিশ্বাস করো, মহৎ ভালোবাসার কখনও মৃত্যু নেই?

শান্তনু অনুভব করছিল, শিলভিয়ার ঠাণ্ডা কঠিনমুষ্টি হাতখানা থরথর ক'রে কাঁপছে। সংযত কণ্ঠে শান্তনু শুধু বললে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, শিলভিয়া!

তবে যাও এই ঘরে!—এই ব'লে শিলভিয়া এ-পাশ দিয়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

শান্তনু ঘরের দিকে তাকালো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কোনো এক ব্যক্তি নড়াচড়া করছে ঘরের মধ্যে। কিছু বুঝতে পারলো না শান্তনু। এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে সে ভিতরে এলো। ঈশানী তাকালো শান্তনুর প্রতি।

ও-পাশের ঘরে নিদ্রিত ভিক্টরের শিয়রের কাছে অশ্রুবিগলিত চক্ষে শিলভিয়া উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল। তার কানে এলো শান্তনুর একটা আর্তস্বর,—অসহনীয় হৃদয়াবেগ দমন করতে না পেরে কঠিন সংযত প্রকৃতির পুরুষ যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আজ ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার পর এই পরদেশিনীর কানে ঈশানীর চাপা-চাপা কণ্ঠের যে অশ্রু উদ্বেলিত ভাষাটা এসে পৌঁছচ্ছিল, সেই দুর্বোধ্য ভারতীয় ভাষার মাধুর্যটার থেকে সে বঞ্চিত রইলো। বেদনার প্রলাপের মধ্যে আজ ঈশানীর কোনো আগল ছিল না। আজ তার ভয় কিছু নেই। হারাবার ভয় নেই, না পাবার ভয় নেই, দুঃখ ও দুর্যোগেরও কোনো ভয় নেই। কিন্তু তার আড়ষ্ট লজ্জার মধ্যে এতদিন ধ'রে যে অনির্বচনীয় অমৃত যক্ষের ধনের মতো গুপ্ত হয়ে ছিল, শান্তনু যেন আজ তার পরম আস্বাদ লাভ করে!

মিনিট পনেরো পরে শিলভিয়া একখানা ট্রে-তে তিন পেয়ালা গরম গরম কফি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো, তারপর বললে, আজ কিন্তু তোমাকে আর ফিরে যেতে দেবো না, শান্তনু। সমস্ত রাত ব'সে আমরা ঈশানীর গল্প শুনবো!

চোখের জল মুছে ধরা গলায় ঈশানী বললে, ঈশানী ম'রে গেছে শিলভিয়া, বিমান দুর্ঘটনায়। আমি মাধবী। ঈশানীর সব ইতিহাস মুছে যাক্।

ঈশানী এসে দাঁড়ালো ভিক্টরের ঘরে। একটি ফুলের তোড়া যেন বালিশের ধারে শোয়ানো। ঈশানী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নিদ্রিত ভিক্টরের গলা জড়িয়ে পরম স্নেহে তার ললাটে একটি চুম্বন করলো।

দক্ষিণের বারান্দায় ওরা গিয়ে ব'সে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিল। ভোর ছটায় দেওয়ানচন্দ চা নিয়ে এলো এবং বেলা সাতটার সময় সবাই মিলে যখন ভিক্টরকে নিয়ে সমাদর করতে ব্যস্ত, সেই সময় নন্দ এসে জানালো, একটি

ভদ্রলোক শিলভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই সুযোগে ঈশানী গেল স্নান করতে। ভিক্টরকে স্কুলে পাঠিয়ে শান্তনুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি তাকে বেরোতে হবে।

শিলভিয়া গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়ালো। মিঃ দত্ত চৌধুরী অত্যন্ত বিমর্ষ ও শোকমলিন মুখে দেখা করতে এসেছেন। শিলভিয়া তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন ক'রে বললেন, ঈশানী রায়ের মৃত্যুসংবাদে দিল্লীতে সকলেই শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। বহু কাগজে তাঁর ছবি বেরিয়েছে। কিন্তু তাঁকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতুম ব'লেই আমাদের শোকসন্তাপ বেশী।

শিলভিয়া প্রশ্ন করলো, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

তাঁকে নিয়েই কাল সারাদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, সেইজন্যই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। রাত প্রায় একটার সময় তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কিন্তু আপনাদের শোকতাপের কাছে আমাদের এই সুসংবাদ চাপা প'ড়ে গেছে।

শিলভিয়া নতমুখে চুপ ক'রে রইলো। এক সময়ে বললে, আপনি কবে· দেখেছেন ঈশানী রায়কে ?

দত্ত চৌধুরী বললেন, তাঁকে দেখেছিলাম রীগ্যল্ সিনেমার ষ্টেজে। তখন তিনি 'চিত্রাঙ্গদার' সাজে ছিলেন।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয় নি ?

খুব সামান্যই আলাপ হয়েছিল, তবে আমার স্ত্রী গিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তাঁর মতো প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো না, জীবনে এই দুঃখ রয়ে গেল।

দেওয়ানচন্দ এক পেয়ালা চা এনে দিল। দত্ত চৌধুরী পুনরায় বললেন, বোম্বাই যাবার তারিখ কি আপনাদের স্থিরই আছে ?

শিলভিয়া বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই তারিখেই আমরা রওনা হবো।

সমবেদনাজ্ঞাপক কণ্ঠে দত্ত চৌধুরী বলতে লাগলেন, ভিক্টরকে-আমাদের

বড় ভালো লেগেছিল। মা-বাপ মরা অমন সুন্দর ছেলেটিকে আমরা কেউ ভুলতে পারবো না। বিলেত থেকে মধ্যে-মাঝে খবর পেলে আমরা খুবই খুশী হবো। আজ ঈশানী রায় বেঁচে নেই, কিন্তু আমার স্ত্রীর কেমন একটা গোপন ধারণা যে, ভিক্টর ঈশানী রায়েরই ছেলে! হয়ত তাঁর জীবনকালে একথা প্রকাশ করার কোনো পথ ছিল না। সংসারে এ রকম অদ্ভুত ঘটনা আছে বৈ কি।

•

স্নান ক'রে ঈশানী বেরিয়ে আসতেই হাসিমুখে শান্তনু বললে, ও ঘরে দত্ত-চৌধুরী এসেছেন, তুই দেখা করবি ?

ঈশানী শান্তনুর প্রশান্ত স্মিত মুখখানার দিকে একবার তাকালো। বললে, দেখা করলে ক্ষতি কি ? তোরা গিয়ে ব'স, আমি যাচ্ছি।

শান্তনু বাইরে গেল। ভিক্টর পাশের ঘরে পড়া করছিল, মুখ ফিরিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে সদ্যস্নাত ঈশানীর দিকে একবার তাকালো। তারপর ছুটে এসে তার অজ্ঞাত জননীকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, মাম্মি আমাকে একটা কথা দেবে ?

ভিক্টরের গালে চুম্বন ক'রে ঈশানী সহাস্যে বললে, কি বলো ?

তুমি কিন্তু আর মরতে পাবে না।—এই ব'লে দৌড়ে গিয়ে ভিক্টর আবার নিজের পড়া নিয়ে ব'সে গেল। তার এই লুকোচুরিটা কেউ না দেখে এই তার মতলব ছিল।

এতটুকু প্রসাধন কোথাও নেই ঈশানীর সর্বাঙ্গে। ভিজা চুল সে ফিরিয়ে রাখলো। অতি সাধারণ শাড়ী আর ভদ্র জামা। দু'গাছা কাচের চুড়ি দু'হাতে। গলায় অথবা কানে, কোথাও কিছু নেই। পায়ে চটি জোড়াটা দিয়ে সে এ-ঘরে এলো দত্ত-চৌধুরীর পিছন দিক দিয়ে। শিলভিয়া আর শান্তনু সামনে ব'সে রয়েছে।

শিলভিয়া বললে, আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, উনি কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছেন কলকাতা থেকে।

দত্ত চৌধুরী হঠাৎ চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, এবং নমস্কার বিনিময় করতে তাঁর ভুল হয়ে গেল। কিন্তু সেই ভয়ানক নিস্তব্ধতায় শুধু তাঁরই অস্বস্তি

প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি শান্তনুর দিকে চেয়ে বললেন, ওঁকে আমি চিনি মনে হচ্ছে।

শান্তনু বললে, ও, চেনেন নাকি ?

ঈশানী প্রশ্ন করলো, কোথায় দেখেছেন বলুন ত ?

কপালের ঘাম মুছে দত্ত চৌধুরী বললেন, আপনার নাম কি মাধবী ? ডাক নাম মাধু ?

শান্ত ভদ্র হাস্যে ঈশানী বললে, হ্যাঁ, আপনার নামটাও আমি ভুলিনি।— এই ব'লে সে আঁচলের তলা থেকে একখানা ছোট নোটবই বা'র ক'রে পুনরায় বললে, এ বইখানা আপনি আমাদের সেই ফুলকাঠির বাড়ীতে ফেলে এসে-ছিলেন। আপনার বুক-পকেটে ছিল। আপনার স্ত্রী কি আমার কথা জানেন ?

দত্ত চৌধুরী বললেন, না।

শিলভিয়া এবং শান্তনু দু'জনেই নীরব। ঈশানী পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, কিন্তু তাঁকে জানানো দরকার, আমি আপনার প্রথম সন্তানের জননী !

দত্ত চৌধুরী মুখ তুললেন ! বললেন, আপনার এ রকম ধারণার মানে আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

শিলভিয়া এবার মিষ্টকণ্ঠে বললে, আপনার স্ত্রীর ধারণাই যথার্থ সত্য, মিষ্টার দত্ত চৌধুরী। ইনিই ভিক্টরের মা !

ভিক্টরের মা ! মানে,—এই ভিক্টর আমাদের কাছে ছিল ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ !

দত্ত চৌধুরী মাথা নীচু ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর মাথা তুলে বললেন, সকালবেলায় এসেছিলুম ঈশানী রায়ের অকালমৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে। হ্যাঁ, একথা সত্যি, ওঁকে আমি চিনি, এক সময়ে আলাপও হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের সকলের মনে এ রকম একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে, এটা আমার জানা ছিল না। আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করাই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ঈশানী বললে, আপনি কি সমস্ত ঘটনাই অস্বীকার করতে চান ?

ভিক্টর আমার সন্তান, এ আমি কোনো মতেই স্বীকার করবো না।

স্বীকার না করুন, বিশ্বাস করেন ত ?

দত্ত চৌধুরী বললেন, স্বীকার যখন করিনে, বিশ্বাসের কথাও তখন ওঠে না।

ঈশানী বললে, বিশ্বাস করেন না কেন ?

যেটা জানার বাইরে জ্ঞানের অতীত, যেটা ধারণাতেও নেই, সেটা আমার কাঁধে চাপলে অস্বীকারও করবো, অবিশ্বাসও করবো।

কিন্তু আপনার এবং আমার দশ বছর আগেকার সমস্ত রেকর্ড হাসপাতালে আছে, এ বইয়ের নকল এবং ফটোগ্রাফ সবই সেখানে পাওয়া যাবে। আপনি কি আদালতের হাকিমের সামনে দাঁড়িয়েও এ সমস্ত অস্বীকার করবেন ? এই নোট বইতে আপনার যে ছবিখানা লটকানো রয়েছে, হাকিম কি এটা নিয়েও বিচার করবেন না ?

রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে দত্ত চৌধুরী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, আপনারা কি চান্ আমার পারিবারিক জীবনের সমস্ত সুখশান্তি জ্ব'লে পু'ড়ে ছারখার হোক ? আমার স্ত্রীর ঘৃণা আর সন্দেহ ব'য়ে বেড়াবো চিরদিন, এই কি আপনাদের কাম্য ?

শান্তমুখে ঈশানী তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। এবার শিলভিয়া বললে, আপনি আশ্বস্ত হোন্, মিষ্টার দত্ত চৌধুরী,—মাধবীর কোনও দুষ্ট মতলব নেই আপনার সম্বন্ধে! আপনি ওঁর স্বামীও নন, এমন কি ভালোবাসার পাত্রও নন। আমি বুঝতে পারি, পুরুষের সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ আপনি পাননি। বিবাদ-বিতর্কে কিংবা আদালতে গিয়ে এ সমস্যার প্রতিকার হবে না। আপনি যদি আমাদের পরামর্শ মেনে নেন, তাহ'লে আপনার স্ত্রীর কানেও একথা কোনোদিন উঠবে না।

নিরুপায় বিবর্ণ মুখে দত্ত চৌধুরী বললেন, বলুন, কি আমাকে করতে হবে ?

ভিক্টরকে নিয়ে আমার বিলেত যাবার আগে আপনি একটি দলিল রেজিষ্টারী ক'রে দেবেন এই মর্মে যে, ভিক্টর আপনার প্রথম সন্তান, কিন্তু তার জননী মাধবী রায়ের সঙ্গে আপনার কোনো বৈবাহিক যোগসূত্র নেই। মাধবী সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই দলিলের সাক্ষী থাকবো আমি আর শান্তনু, এবং সই করবেন মাধবী রায়।

এ ধরণের দলিল প্রস্তুত করে দিলে কি সুবিধে হবে?

এবার শান্তনু গলা পরিষ্কার ক'রে তার অভিমত ব্যক্ত করলো। ব— আপনি সম্ভবতঃ জানেন না, মাধবীকে আমি আমার স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেছি, কি— বাধা হয়ে আছেন আপনি। ওই দলিল সেই বাধা ঘোচাবে!

বটে! তাহ'লে সবটাই ব্ল্যাক-মেইল?—দত্ত চৌধুরী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এবার বুঝেছি সব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন্। ভিক্টর যে শান্তনু চৌধুরীর ছেলে নয়, তার প্রমাণ কি?

চোপ রও, শূয়োর! ঈশানী লাফিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে, মরিয়া হয়ে চেঁচালো,—নন্দ! দেওয়ানচন্দ!

চক্ষের পলকে উঠে গিয়ে শিলভিয়া ঈশানীকে জাপটে ধরলো,—ছি মাধবী, উনি না আমাদের অতিথি। সংযম হারিয়ো না!

শান্তনু একটু হাসলো। বললে, মিষ্টার দত্ত চৌধুরী, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। ভিক্টর আমারই সন্তান, ভালোবাসি ব'লেই আমার। সত্যি বলতে কি ভালোবাসাই ত' পিতৃত্ব। কিন্তু আমি ভাবছি আমার স্নেহের ভগ্নী কমলার কথা। অমন সাধ্বী স্ত্রী যার, সে কেন কাপুরুষ হয়, অরুণবাবু?

দত্ত চৌধুরী শান্ত হলেন। বললেন, আমার অবস্থায় পড়লে পুরুষমাত্রই কাপুরুষ হয়, শান্তনুবাবু।

হয় স্বীকার করলুম। কিন্তু যে নিরপরাধ মেয়ে তা'র জীবন ধ'রে আপনার জন্য সমস্ত কলঙ্ক আর উৎপীড়ন মেনে নিয়েছে, তার প্রতি পুরুষের বিচার করুন! উনি আপনার স্ত্রী হ'লে হয়ত আপনার বিপদ ঘটতো, কিন্তু তা উনি নন। আপনি কেবল আপনার সন্তানকে স্বীকার করে নিলেই উনি সুখী হবেন। মেয়ে আর পুরুষের জীবনে অনেক স্খলন-পতন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু মনুষ্যত্ববোধ এদের সব কিছুকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্মল ক'রে তোলে, মিষ্টার দত্ত চৌধুরী!

শিলভিয়া বললে, আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার স্ত্রীর কাছে এ সব ঘটনা কোনোদিন প্রকাশ পাবে না।

দত্ত চৌধুরী বললেন, তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখাশুনো যদি হয় কখনও ?

শান্তনু বললে, না, আমরা সবাই শীঘ্র দিল্লী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

কিন্তু ভবিষ্যতে যদি ভিক্টর ফিরে এসে আমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর অধিকার দাবী করে ?

খুব স্বাভাবিক—শান্তনু বললে, সে আপনার সন্তান, দাবী তার আছে বৈ কি। তবে আপনাকে এটুকু জানিয়ে রাখি, ওদের বিলেত যাবার আগে আমি লেখাপড়া ক'রে আপনার কাছ থেকে ভিক্টরকে 'দত্তক' ব'লে গ্রহণ করবো। আশা করি এতে আপনার অমত নেই !

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এসে শান্তনুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করলেন। বললেন, আপনার কাছে চিরকাল আমি কৃতজ্ঞ রইলুম। আপনাকে তখন আঘাত করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

শান্তনু বললে, আঘাত আমার লাগেনি, অরুণবাবু। মাধবীর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় এখনও এক বছর হয়নি। কিন্তু আমি স্ত্রী ব'লে যাঁকে গ্রহণ করেছি, তাঁর পায়ের তলাকার সমস্ত কাঁটা একটি একটি ক'রে আমি নিজের ৭। হাতে সরিয়ে দিতে চাই। আমার জীবনের সেইটিই সার্থকতা !

শি৽।ঈশানী স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। দত্ত চৌধুরী এবার উঠে দাঁড়ালেন। ঈশানী রম দুর্দিনে গানো রহস্য তাঁকে জানানো হোলো না, এবং তাঁর স্ত্রী কমলা নল। :থেকে বেরিয়ে আসার আগেই সকলে দিল্লীত্যাগের মনস্থ ক'রে

ভিক্টরকে কে

আগেই নন্দ গাড়ি বললেন, বেশ, আমিও কথা দিয়ে যাচ্ছি, এই সপ্তাহের মধ্যেই শান্তনুর পা কার মতো সমস্ত দলিলপত্র নিঃসঙ্কোচে রেজেষ্টারী ক'রে দেবো। পাহাড়ের বাঁকে !

অ পটা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে নতমস্তকে তিনি বিদায় নিলেন। শিলভিয়া সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

ঈশানী হেঁট হয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়লো শান্তনুর পায়ের কাছে। অধীর কান্নায় সে শান্তনুর পা জড়িয়ে ধরলো। ভিজা চুলের রাশি ভেঙ্গে পড়লো

শান্তনুর দুই পায়ের ওপর। মহত্ত্বের শেষ মূল্য দেবার জন্য চোখের জল ছাড়া ঈশানীর আর কোনো সম্বল ছিল না।

চুপ ক'রে রইলো শান্তনু, বাধা দিল না। অশ্রুজড়িত মৃদুস্বরে ঈশানী বললে, আমাকে তুই শুধু কাঁদতে দে, শান্তনু,—আমার সব পরিচয় ঘুচিয়ে এসেছি—তোর পায়ের তলায় যেন আমি জীবন-মরণের জায়গা খুঁজে পাই।

শান্তনুও চোখ মুছলো। বললে, দুঃখের ভেতর দিয়ে তোকে পাইনি, তোর জন্যে চোখের জলও ফেলতে হয়নি। তুই সহজে এসেছিলি ব'লেই আমি অহঙ্কারে জরোজরো ছিলুম। সেই অহঙ্কারে তুই আঘাত করলিনে, তাই শোচনীয় চিত্তবিকারে আমার দিন গেছে। যাক, সে-ঈশানী ম'রে গেছে, সে-আমিও বেঁচে নেই। চল এবার নতুন জীবনে, সহজ সাধারণ স্বাভাবিক জীবনে। অখ্যাত অজ্ঞাত অজানা জনেদের মাঝখানে গিয়ে নিজেদের নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলি—চল···

ঈশানী বললে, তাই চল শান্তনু,—যেখানে কেউ চিনবে না, কেউ খুঁজবে না···

*　　*　　*　　*

কৌশল্যা নদীর গতিপথ ধ'রে মাইল তিরিশ উত্তরে গেলে পাহা[ড়ের] পাশ দিয়ে খরতর স্রোতস্বিনী একটু বাঁক নেয়। এই পাহাড় ঢালু [হয়ে] এসেছে একটি অধিত্যকায়। প্রথম হেমন্তের রঙীন পাখীরা এসেছে অরণ্যলোকে। এখনও অজস্র হয়ে রয়েছে বনমল্লিকার ঝোপঝাড়। [ডালিম] বনে পাক ধরেছে। কাঁচা ডালিম আর কমলার বনে পতঙ্গের দল আনাগোনা করছে। নীল নির্মল আকাশে রাজহংসদলের পাখার [সারি] ভেসে চলেছে। সভ্যতার থেকে অনেক দূরে।

কাঠের ছোট্ট বাড়ীটি টিলা পাহাড়ের ঠিক কোলে। লতানে [গেটে আর] অপরাজিতার ঝাড় অনেকদিন আগে থেকে মালী লাগিয়ে রেখেছে। বারান্দাটা যেন ভ'রে আছে। পতঙ্গ-গুঞ্জনের সঙ্গে কৌশল্যার প্রবাহ-কল্লোল মধুর সুরের মতো মিলে গেছে।

শিলভিয়ার অনুরোধে শান্তনু জ্যোৎস্নারাত্রে দিন দুই সবাইকে বাঁশী শুনিয়েছিল।

আজ ওরা এখান থেকে বোম্বাই রওনা হচ্ছে,—শিলভিয়া আর ভিক্টর। নন্দ বাজার থেকে এনেছে শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, ঈশানী নিজের হাতে রান্না প্রস্তুত করেছে। ওরা রামনগর-লক্ষ্ণৌ হয়ে বোম্বাই যাবে। দু'জনকে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাচ্ছে শিলভিয়া। সে ইংরেজ, তা'কে চ'লে যেতেই হবে।

হাটের নীচে দিয়ে দুপুরবেলায় যাবে রামনগরের মোটর বাস। সন্ধ্যার দিকে রামনগর থেকে গাড়ী ছাড়বে লক্ষ্ণৌর দিকে। কাল প্রভাতে লক্ষ্ণৌ।

নন্দর সঙ্গে ভিক্টর কোথায় যেন গিয়েছে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল। যাবার জন্য সব প্রস্তুত। ওরা যখন সবাই এসে বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়ালো, ভিক্টর ছুটতে ছুটতে নিয়ে এলো এক গোছা তোড়াবাঁধা নানা রঙের ফুল। অদূরে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল শান্তনু। অজ্ঞান বালক ছুটে গিয়ে বললে, বাবা, তুমি বলেছিলে মার জন্যে ফুল আনতে, আমি কিন্তু ভুলিনি।

ঈশানী ছুটে গিয়ে ভিক্টরকে জড়িয়ে ধরলো। শান্তনু বললে, না, এরকম কথা ছিল না। 'রেডি-মেড ফাদারের' দাবী সকলের আগে।

শিলভিয়া খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বাস এসে পড়েছে ততক্ষণে। চরম দুদিনের বন্ধু শিলভিয়া শান্তস্নিগ্ধ প্রসন্ন হাস্যে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিল।

ভিক্টরকে কোলে তুলে নিয়ে শান্তনু বাসে তুলে দিল। জিনিসপত্রাদি আগেই নন্দ গাড়ীতে তুলে দিয়েছে।

শান্তনুর পাশে সজলচক্ষে ঈশানী দাঁড়িয়ে ছিল দূরের দিকে তাকিয়ে। পাহাড়ের বাঁকে মোটর বাস অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেক ক্ষণ পরে শান্তনু স্ত্রীর হাত ধ'রে বললে, চল, মাধু।

যাই।—চোখ মুছে ঈশানী ঘরের দিকে চললো।—